বংশ-পরিচয়

সপ্তম খণ্ড

প্রজাপতি-সম্পাদক
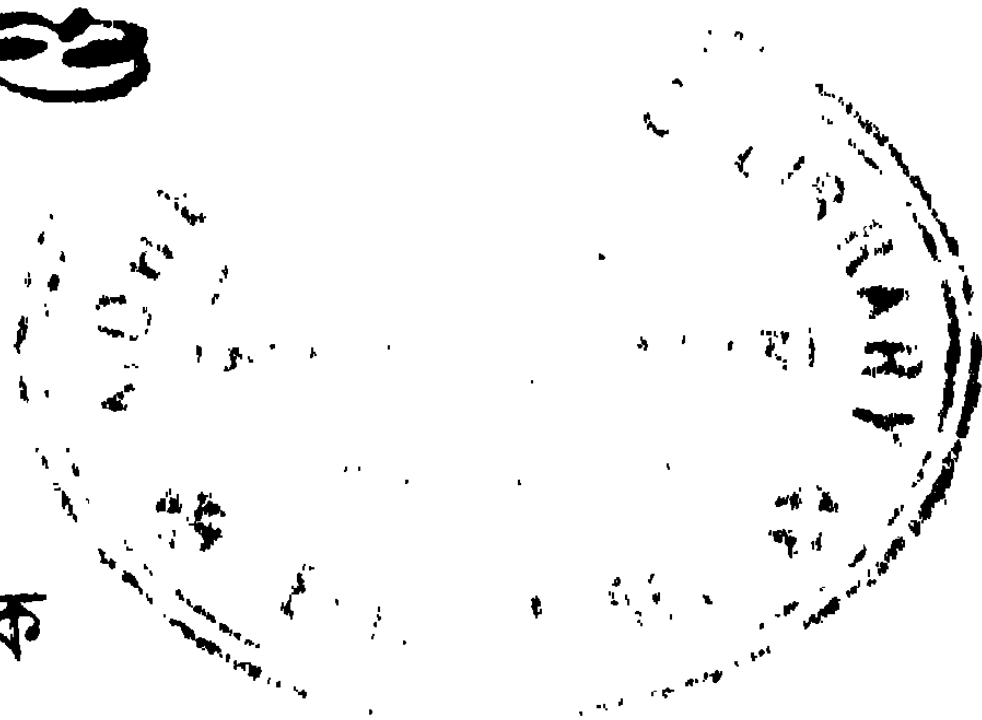
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার-সঙ্কলিত।

বৈশাখ, ১৩৩৫

সুলভ সংস্করণ মূল্য ২৲

কলিকাতা, ২০৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
২১।এ মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন, কলিকাতা ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীভূতনাথ সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

ধান্যকুড়িয়ার দানশৌণ্ড জনহিতরত

ভূম্যধিকারী

বঙ্গের প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যবসায়ী

কলিকাতা কর্পোরেশনের কৌন্সিলর

পরম বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রাণ শাস্ত্রানুরাগী

বিদ্যোৎসাহী

রায় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ বাহাদুরের

শ্রীকরকমলে

মৎ-সঙ্কলিত সপ্তম খণ্ড 'বংশ-পরিচয়'

উৎসর্গীকৃত হইল।

—:(০):—

রায় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ বাহাদুর।

সূচীপত্র।

রাজ সংস্করণ মূল্য ৫৲

বংশ-পরিচয়

সপ্তম

শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্য

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাকাহিনী উপলব্ধি করিতে হইলে তৎপূর্ব্বে শ্রীমৎ অদ্বৈত মহাপ্রভুর জীবনকাহিনী জ্ঞাত হইতে হয়। কারণ শ্রীমৎ অদ্বৈত মহাপ্রভুই প্রথমে নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়া কলির কল্মষ দূর করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে আবার দেহ পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হইতে অহর্নিশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

সে আজ চারিশত বৎসরের কথা। কুবের তর্কপঞ্চানন নামক এক ব্যক্তি শ্রীহট্ট জেলার লভিড় পরগণার অন্তর্গত নবগ্রাম পল্লীতে বাস করিতেন। কুবের ধনবান, ধর্ম্মপরায়ণ এবং সমগ্র শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি-শালী ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম ছিল লাভা। লাভা যেমন রূপবতী তেমনি গুণবতীও ছিলেন; সংসারে কুবের তর্কপঞ্চাননের ধনরত্ন ঐশ্বর্য্যাদির কোনই অভাব ছিল না; কিন্তু একটি দুঃখে তিনি বড়ই মনস্তাপে কাল কাটাইতেছিলেন। তাঁহাদের পর পর কয়েকটী সন্তান হয় বটে, কিন্তু কয়েকটিই অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। ইহাতে

কুবের তর্কপঞ্চানন ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে আসিয়া বসবাস করিতে সঙ্কল্প করেন এবং সঙ্কল্পানুযায়ী কার্য্যও করেন। শান্তিপুরে পূতসলিলা সুরধুনীর তটে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সেই ধার্ম্মিক দম্পতী তথায় বাস করিতে থাকেন। এখানে আসিয়া লাভা দেবী আবার অন্তঃসত্ত্বা হন। লাভা দেবী গর্ভাবস্থায় একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যেন এক অপূর্ব্ব লাবণ্যময় হরিহরমূর্ত্তি তাঁহার ক্রোড় আলোকিত করিয়া রহিয়াছে, তাহার লাবণ্যচ্ছটায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়াছে। তৎপরে শুভদিনে শুভক্ষণে লাভা এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন।

লাভা দেবী যখন অন্তঃসত্ত্বা তখন লাউড়ের রাজা দিব্য সিংহ কুবেরকে ডাকিয়া পাঠান; কেন না, কুবের লাউড় অবস্থানকালে তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। কুবের রাজার ইচ্ছানুসারে গর্ভবতী পত্নীসহ লাউর গ্রামে গিয়াছিলেন এবং সেইখানেই লাভা দেবী এই পুত্ররত্ন প্রসব করেন। যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র অথবা আকাশের পূর্ণিমার চাঁদ হঠাৎ ভূতলে পতিত হইল। ভূমিষ্ঠ শিশুকে যে দেখিতে লাগিল, সেই ভাবিতে লাগিল এ শিশু নিতান্ত সামান্য শিশু নহে—এ শিশু নিশ্চয়ই কোন দেবতার প্রভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

কুবের অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া তাহার নাম রাখিলেন—কমলাক্ষ। কমলাক্ষ পাঁচ বৎসরে উপনীত হইলে কুবের তাঁহার "হাতে খড়ি" দিলেন। কমলাক্ষ একমাসের মধ্যে সংযুক্ত অক্ষরাদি চিনিয়া ফেলিলেন। তারপর তৎকালিক প্রথানুসারে কুবের সন্তানকে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন। কমলাক্ষ তিন বৎসরের মধ্যেই সমগ্র কলাপ ব্যাকরণ পাঠ করিলেন। যথাসময়ে কমলাক্ষের উপনয়ন সংস্কার হইল, কমলাক্ষ এবার সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষাদি শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন

কমলাক্ষ বাল্যাবস্থায় উপনীত হইয়া একদিন কালীদেবীর পূজা দেখিতে গেলেন। কালীদেবীর পূজোপলক্ষে তথায় বহুলোকের সমাবেশ হইয়া থাকে। কমলাক্ষ তথায় গিয়া কালীদেবীকে প্রণাম না করিয়াই সভামধ্যে বসিয়া পড়িলেন। কমলাক্ষের এইরূপ অভক্তিজ্ঞাপক আচরণ দেখিয়া রাজা দিব্য সিংহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা দেবীকে প্রণাম করিলেন না কেন?" উত্তরে কমলাক্ষ বলিলেন, "ভগবান এক, সেই একেরই পূজা করা উচিত। মানুষ যে নানা দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে, ইহা তাহাদের ভুল।"

পুত্রের কথায় কমলাক্ষের পিতাও প্রতিবাদ করিলেন। কমলাক্ষ কিন্তু অচল-অটল। তিনি বলিলেন, "যে দেবীর পূজায় জীববলি হয়, সে দেবীর পূজা করা কখনও উচিত নহে।"

"প্রাণীহিংসা যজ্ঞে যেই হয় উল্লাসিত।
সে দেবীর উপাসনা না হয় উচিত॥"

রাজা দিব্য সিংহ ও কমলাক্ষের পিতা যাহাই বলুন না কেন, সভাস্থ সকলেই কিন্তু কমলাক্ষের উক্তিরই সমর্থন করিলেন।

শান্তিপুরে অদ্বৈত

অদ্বৈত যখন বার বৎসরের বালকমাত্র, তখন তিনি একদিন মাতা-পিতার অজ্ঞাতসারে শান্তিপুরে আগমন করেন। লাভা দেবী ও কুবের পুত্রের অকস্মাৎ অন্তর্ধানে একেবারে চিন্তায় আকুল হইলেন। তাঁহারা আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পুত্রের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। কয়েকদিন পরে অদ্বৈতের সংবাদ পাইয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন। অদ্বৈত লোক দ্বারা তাঁহার শান্তিপুর-আগমনের বার্ত্তা মাতা-পিতাকে জানাইয়াছিলেন।

যে সংসারে পুত্র নাই, সে সংসারে কি আর বাস করিতে কাহারও অভিলাষ হয়? অদ্বৈত-হারা হইয়া কুবের লাউড় গ্রাম অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা অচিরাৎ লাউড় ছাড়িয়া শান্তিপুরে আসিলেন।

এদিকে অদ্বৈত শান্তিপুরে আসিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন না। তিনি ষড়দর্শনপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। যিনি আজন্ম শ্রুতিধর ও প্রতিভাবান, তাঁহার পক্ষে ষড়্দর্শন পড়িতে আর ক'দিন লাগে? তিনি অল্প কালের মধ্যে ষড়দর্শনের পাঠ সমাপন করিয়া বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। শান্তিপুরের নিকট পূর্ণবাটী নামে একখানি গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে বেদান্তবাগীশ উপাধিধারী এক মহাপণ্ডিত বাস করিতেন। অদ্বৈত তাঁহার নিকট গিয়া বেদ পড়িবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে বেদান্তবাগীশ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বেদ পড়াইতে স্বীকৃত হইলেন। অদ্বৈতের প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া বেদান্তবাগীশ পরম আনন্দিত হইলেন এবং এই বালক যে একদিন অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবে, এই ভবিষ্যদ্বাণীও করিলেন।

এদিকে কুবের আচার্য্যের বয়স নব্বই বৎসর পরিপূর্ণ হওয়ায় তিনি দেহত্যাগ করিলেন। অদ্বৈত পিতার অন্তিম ইচ্ছাক্রমে গয়াধামে গিয়া পিতার পিণ্ড দিয়া আসিলেন এবং গয়া হইতে ফিরিবার পথে রেণু মা, সেতুবন্ধ, শিবকাঞ্চী, মথুরা, ধনুতীর্থ প্রভৃতি তীর্থস্থানসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীমৎ মধ্বাচার্য্যের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। আশ্রমস্থ সকলে অদ্বৈতের ভক্তিভাব দেখিয়া পরম পুলকিত হইলেন। অদ্বৈত ভাবাবেশে একেবারে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে আশ্রমস্থ সকলে বলিতে লাগিলেন, এই বালকই ভবিষ্যতে ভক্তিপথের প্রদর্শক হইবে। শ্রীমৎ মধ্বাচার্য্য অদ্বৈতের নিকট যতই ভাগবত পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রাণ ভক্তিরসে উথলিয়া উঠিতে লাগিল।

একদা মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত কথাপ্রসঙ্গে অদ্বৈত বলিলেন, "দেখ দেশ ত যায়, ধর্ম্মের স্থানে অধর্ম্ম, আচারের স্থলে অনাচার, ভক্তির স্থলে চুক্তি আসিয়া ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছে। কিরূপে এই যথেচ্ছাচারের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারা যায়, বলিতে পার ঠাকুর?" মাধবেন্দ্র পুরী তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ ভগবানের দয়া না হইলে দেশের পবিত্রতা আসিতে পারে না। যখনই দেশে অধর্ম আসিয়া আধিপত্য স্থাপন করে, ভগবান তখনই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যুগে যুগে ইহা দেখা গিয়াছে, এ যুগেও ভগবান আসিবেন—নিশ্চয়ই আসিবেন। অনন্তসংহিতা লিখিয়াছেন, এ যুগেও তিনি জীবের উদ্ধার-সাধনের জন্য আবির্ভূত হইবেন।"

মাধবেন্দ্র পুরীর কথা শুনিয়া অদ্বৈত "অনন্তসংহিতা" পুস্তকখানি পাঠ করিলেন। তাঁহার মনে আর সন্দেহ থাকিল না যে, ভগবান আসিবেন। অতঃপর তিনি তথা হইতে দণ্ডকারণ্য, প্রভাস, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি দর্শন করিয়া মথুরা ও বৃন্দাবনে গমন করেন। তথায় শ্রীকৃষ্ণলীলা-সমূহের নিদর্শন দেখিয়া তাঁহার প্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠিল। প্রকাশ, বৃন্দাবনে অবস্থানকালে একদা তিনি স্বপ্নযোগে দেখিলেন যেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমীপে আবির্ভূত হইয়া জগতে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁহাকে প্রণোদিত করিতেছেন। ভগবানের এই অনুপ্রেরণা পাইয়া অদ্বৈত শান্তিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিছুদিন পরে ভক্ত মাধবেন্দ্র পুরী আসিয়াও তাঁহার শান্তিপুরের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। দুই বন্ধুর পরস্পর মিলন হইল। মাধবেন্দ্র তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন।

এদিকে চারিদিকে অদ্বৈতের বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্য-প্রকাশের সুযোগ ঘটিল। তর্কপঞ্চানন নামে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া অদ্বৈতের

সঙ্গে তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অদ্বৈত তাঁহাকে তর্কে পরাজিত করিলেন। ইহাতে চারিদিকে তাঁহার সুযশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িল। লাউড়ের রাজা দিব্য সিংহ ধর্ম্মমতে শৈব হইলেও শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈতের নিকট বিষ্ণুধর্ম্মে দীক্ষা লইলেন এবং স্বদেশে যাইয়া দশবৎসর-কাল শুধু ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তার পর এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া জীবনের শেষদিনগুলি নিরন্তর হরিনাম-কীর্ত্তনে কাটাইয়া ছলেন। লাউড়াধিপতি অদ্বৈতের বাল্যজীবনী সংস্কৃত ভাষায়লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে হরিদাস নামে এক যবন বালক অদ্বৈতের নিকট দর্শন-শাস্ত্র পাঠ করিতে আইসেন। অদ্বৈত তাঁহাকে অতি স্নেহের সহিত পড়াইতেন এবং তাঁহাকে আহারাদিও দিতেন। অবশ্য হরিদাস অদ্বৈতেরই বাড়ীর নিকট অন্য গৃহে অবস্থান করিতেন। এজন্য স্বসমাজে তাঁহাকে বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু অদ্বৈত সমাজের ভ্রূকুটীতে ভীত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি সমাজস্থ লোকদিগকে স্পষ্টই বলিলেন, "লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে যে ফললাভ হয়, একমাত্র হরিদাসকে ভোজন করাইলে তাহার দ্বিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে।"

একদিন অদ্বৈত গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন, সেই সময় নারায়ণপুরের নৃসিংহ ভাদুড়ী নামক এক ব্রাহ্মণ তাহার দুইটি পরমা সুন্দরী কন্যা লইয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈতের অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া কন্যাদ্বয় তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, অদ্বৈতও বালিকাদ্বয়ের রূপে গুণে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাতে সম্মতি জানাইলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে সেই দুই কন্যারই সহিত অদ্বৈতের বিবাহ হইল; অদ্বৈত যেমন রূপবান, গুণবান, তেমনি ধনবানও ছিলেন।

বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু কামিনীর কমনীয় কান্তি তাঁহাকে ভক্তিমার্গ হইতে স্খলিতপদ করিতে পারিল না। কিরূপে বঙ্গদেশে আবার সুমধুর কৃষ্ণনাম প্রচারিত হইবে—কিরূপে লোকসকল ভক্তিমান হইয়া উঠিবে—কিরূপেই বা মুসলমানদের অমানুষিক অত্যাচারের হাত হইতে হিন্দুদের দেব-দেবীর বিগ্রহ ও ভাগবতাদি শাস্ত্র রক্ষা পাইবে, অদ্বৈত সেই কথা নিরন্তর ভাবিতে লাগিলেন। অদ্বৈত যবন হরিদাসের মুখে শুনিতে পাইলেন, মুসলমানেরা দেবমন্দিরাদি অপবিত্র করিতেছে, ভাগবতাদি ধর্ম্মগ্রন্থসকল কাড়িয়া লইয়া তাহা অগ্নিতে পোড়াইয়া ভস্মীভূত করিতেছে, সাধুদিগের প্রতি অতি মন্দ আচরণ করিতেছে, "পাগল" বলিয়া তাহাদিগকে উপহাস করিতেছে। হরিদাসের মুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়া অদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন, "হরিদাস, তুমি কাতর হইও না, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান আবার আসিবেন, আসিয়া এ সমস্তের প্রতিকার করিবেন। ভগবান দুর্নীতি-সংহারক ; তিনি কি এত দুর্নীতির প্রশ্রয় দিবেন ?"

অদ্বৈতের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে নরদেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইবেন, হইয়া ভক্তির প্লাবনে বঙ্গভূমিকে প্লাবিত করিবেন। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন এবং তথায় টোল চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়া ছাত্রদিগকে পড়াইতে লাগিলেন। সারাদিন অদ্বৈত টোলে ছাত্রদিগকে দর্শনাদি শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন, রাত্রিকালে হরিদাসকে লইয়া সঙ্কীর্ত্তনে মাতোয়ারা হন। ক্রমে অদ্বৈতের অকপট ভক্তি ও তৎসহ অগাধ পাণ্ডিত্য সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিল। শত শত ছাত্রের কল-কলনাদে তাঁহার টোল মুখরিত হইল।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব

নবদ্বীপে তখন জগন্নাথ মিশ্র নামে এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পত্নী শচীদেবী বাস করিতেন। তাঁহারা অর্থসম্পদে সুখী হইলেও, কোন সন্তানাদি না হওয়ায় পরম দুঃখে কালাতিপাত করিতেছিলেন। একদিন সেই ব্রাহ্মণ-দম্পতী অদ্বৈত ঠাকুরের নিকট আসিয়া বলিলেন, "ঠাকুর! আমাদের দিন কি এমনই বিষাদে কাটিবে?" অদ্বৈত বলিলেন, "আচ্ছা আপনাদের বাটীতে যাইয়া আমি এ কথার জবাব দিব।" পরদিন অদ্বৈত জগন্নাথ মিশ্রের বাটীতে গেলেন। জগন্নাথের সহধর্ম্মিণী আচার্য্যের চরণে প্রণিপাত করিলে তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, "মা তুমি পুত্রবতী হও।" যথাসময়ে শচীদেবী এক পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন, সকলে বালকের নাম রাখিল "বিশ্বরূপ।" বিশ্বরূপ বাল্যে অদ্বৈতের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতেন; কিন্তু তিনি অল্পকালের মধ্যে সন্ন্যাসী হন। আর একদিন শচীদেবী গঙ্গায় স্নানার্থ গমন করিলে অদ্বৈতচার্য্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে গর্ভবতী দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "মা, এই গর্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিবেন।"

শচীদেবী আনন্দে আত্মহারা হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং স্বামীর নিকট অদ্বৈতের আশীর্ব্বাদ-কাহিনী নিবেদন করিলেন।

বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হইল না। ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে গৌরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলেন। সে সংবাদ শুনিয়া অদ্বৈতের যে কি পরিমাণ আনন্দ হইল তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তিনি আনন্দে অধীর হইয়া, হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া, ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তার পর আর কি? গঙ্গার তীরে যাইয়া অদ্বৈত ব্রাহ্মণদিগকে নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী দান করিতে লাগিলেন।

প্রথম সন্দর্শন

গৌরচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন বিশ্বরূপের বয়স মাত্র বার বৎসর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিশ্বরূপ অদ্বৈতের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতেন। গৌরচন্দ্রের বয়স যখন মাত্র ছয় বৎসর, তখন একদিন বিশ্বরূপকে চতুষ্পাঠী হইতে ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া শচীদেবী শ্রীগৌরাঙ্গকে অদ্বৈতের চতুষ্পাঠীতে অগ্রজকে ডাকিয়া আনিবার জন্য প্রেরণ করেন। ছয় বৎসরের শিশু নিমাই ধীরে ধীরে মন্থরগমনে অদ্বৈতের চতুষ্পাঠীতে যাইয়া যখন মধুর স্বরে বলিলেন, "দাদা! এস, মা ডাক্‌ছেন", তখন সকলেরই দৃষ্টি এই নধরকান্তি সুন্দরকায় শিশুটির উপর পড়িল। অদ্বৈতও একদৃষ্টে শিশুটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন। আহা মরি! মরি! কি অপরূপ রূপ! শিশুর প্রতি অঙ্গ দিয়া যেন সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তিনি আর চোখ ফিরাইতে পারিলেন না।

ক্রমে গৌর নবদ্বীপে শিক্ষা লাভ করিয়া নবদ্বীপেই অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তিনি কিছুদিন পরে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনেই মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিলেন। যখন গৌরাঙ্গের যশঃ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল—যখন অদ্বৈতের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি বুঝিলেন, এই গৌরাঙ্গের দ্বারাই দেশের দুষ্কৃতি বিনষ্ট হইবে। একদিন অদ্বৈত ভাগবতের কোন শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া না খাইয়া শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। স্বপ্নযোগে দেখিলেন, কে একজন যুবক যেন তাঁহাকে বলিতেছেন, "তুমি যাঁহাকে চাহিয়াছিলে তিনি আসিয়াছেন, তুমি আশ্বস্ত হও আর এই শুন, তুমি ভাগবতের যে শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে পারিতেছ না, তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ—।"

অদ্বৈতের স্বপ্নঘোর কাটিয়া গেল। তিনি নিদ্রোত্থিত হইয়া শ্লোকের অর্থ পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিলেন। আর দেখিতে পাইলেন, স্বপ্নযোগে যে যুবক তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই যুবকের আকৃতির সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের আকৃতির পূর্ণ সৌসাদৃশ্য আছে। এ সময়ে অদ্বৈত শান্তিপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিবার পরই পত্নী সীতাদেবীকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপে গেলেন এবং গৌরাঙ্গের ভক্তমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইলেন। গৌরাঙ্গ তাঁহার মস্তকোপরি পদস্থাপন করিয়া তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন।

তার পর হইতে অদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্ব সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হন। তিনি শান্তিপুরে থাকিতেন, গৌরাঙ্গাদি সন্ন্যাস-গ্রহণের পর নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাটীতে তাঁহাকে দর্শন দান করিতে আসিতেন। ভক্তের সহিত ভগবানের এই অপূর্ব্ব সম্মেলন বস্তুতই প্রীতিকর।

শ্রীগৌরাঙ্গ যখন নীলাচলে অবস্থান করিতেন, অদ্বৈত তখন প্রতি বৎসরই রথযাত্রার সময় নীলাচলে যাইয়া মহাপ্রভুর সহিত কীর্ত্তনাদি করিয়া মহাসুখে দিনাতিপাত করিয়া আসিতেন।

একবার অদ্বৈত মহাপ্রভুর হাতে কিল খাইয়াছিলেন। একদিন মহাপ্রভু অদ্বৈতের বাটীতে শিষ্যাদি সহ গমন করেন। তখন অদ্বৈত ছাত্রদিগকে পড়াইতেছিলেন। অদ্বৈতকে মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা বল ত, জ্ঞান বড় কি ভক্তি বড়?" অদ্বৈত বলেন, "জ্ঞানই বড়।" ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু অদ্বৈতের পৃষ্ঠে সজোরে এক কিল মারেন। ইহাতে অদ্বৈত অসন্তুষ্ট না হইলেও সীতাদেবী কিন্তু মহাপ্রভুর উপর বিশেষ কুপিত হন এবং বলেন, "কর্‌লে কি ঠাকুর! বুড়া মানুষকে শেষে

কি কিল দিয়া মেরে ফেল্‌বে।" অদ্বৈত বলিলেন, "ও কিল নয় গো, ও কিল নয় ও ভক্তের ভক্তিপরীক্ষা!"

অদ্বৈতাচার্য্য আমরণ গৌরাঙ্গের সংবাদ লইতেন। তিনি শান্তিপুরে বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণ পড়িয়া থাকিত নীলাচলে। গৌরাঙ্গের দেহত্যাগের পর অল্পদিনমাত্র তিনি দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, তার পর গৌরাঙ্গ-বিচ্ছেদজ্বালা অসহনীয় হওয়ায় তিনি নরদেহ পরিত্যাগ করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ

১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে ও শচীদেবীর গর্ভে ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আবির্ভাবের সময়ে এবং পূর্ব্বে দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে কিছু না বলিলে তাঁহার আগমনের কারণ কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। তখন কেহ ভুলিয়াও কৃষ্ণনাম করিত না, পণ্ডিতেরা শাস্ত্র পড়াইতেন বটে, কিন্তু তাহাতে ভক্তির লেশমাত্র ছিল না, যাঁহারা গীতা ভাগবত পাঠ করিতেন তাঁহাদের রসনাতেও ভক্তির ব্যাখ্যা উচ্চারিত হইত না; দেশের এই দুর্দ্দিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নররূপ ধারণ করিয়া জন্ম পরিগ্রহ করেন। ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, সে সময়ে গ্রহণ। গ্রহণোপলক্ষে তখন নবদ্বীপের আবালবৃদ্ধবনিতা হরি সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র শচীদেবীর পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "দেখ এই শিশু ভবিষ্যতে বৃহস্পতির সমান বিদ্বান হইবে, ইহার দ্বারা দেশে সর্ব্বধর্ম্মের স্থাপন হইবে।" নীলাম্বর নিজে মহাজ্যোতিষী ছিলেন, তিনি শিশুর কোষ্ঠী গণনা করিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন—বিশ্বম্ভর এবং বলিলেন লোকে ইঁহাকে "নবদ্বীপচন্দ্র" বলিয়া পূজা করিবে। নীলাম্বর কোষ্ঠী গণনা করিয়া সকল কথাই বলিলেন, কেবল প্রভুর সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের কথা বলিলেন না; কি জানি যদি তাহাতে জগন্নাথ ও শচীদেবীর প্রাণে ব্যথা লাগে।

দিন দিন বিশ্বম্ভর মায়ের ক্রোড়ে পৌর্ণমাসীর শশিকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিলেন। অন্যান্য শিশুর ন্যায় এ শিশুও হাসেন, কাঁদেন কিন্তু "হরিনাম" শুনিলেই তিনি চুপ করেন। ইহা দেখিয়া প্রতিবেশিগণ সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, বিশ্বম্ভরকে চুপ করাইবার একমাত্র উপায় হরিনাম। তখন হইতে শিশু কাঁদিলেই তাঁহারা হরিনাম করিতেন।

"তাবত কান্দেন প্রভু কমললোচন
হরিনাম শুনিলে রহে ততক্ষণ।
পরম সঙ্কেত এই সবে বুঝিলেন।
কান্দিলেই হরিনাম সবেই লয়েন॥"

—শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত।

ক্রমে একমাস—উত্তীর্ণ হইল, শচীদেবী শিশু লইয়া সূতিকাগৃহ হইতে বাহির হইয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলেন। বিশ্বম্ভরও ক্রমে ক্রমে চারিমাসে উপনীত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দুরন্তপনাও অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিল। শচীদেবী এক নিমেষের জন্য ঘর ছাড়িলে তিনি সমস্ত ঘরে তেল, দুধ, ঘোল, ঘি ঢালিয়া একাকার করিতেন; তার পর মাকে আসিতে দেখিয়া প্রভু যেন কিছুই জানেন না এইভাবে শুইয়া কাঁদিতে থাকিতেন। শচীদেবী আসিয়া চারিদিক তাকাইয়া দেখিতেন, ধান, চাউল, দাইলের ভাণ্ড সমস্ত ঘরের মেজেতে পড়িয়া রহিয়াছে আর শিশু নিমাই শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে। জগন্নাথ মিশ্র এই কথা শুনিয়া ভাবিলেন, নিশ্চয় কোন দানব আসিয়াছিল. শিশুটীকে দেখিতেছি রক্ষা করা দায় হইল।

যেই শচীদেবী এ ঘর হইতে অন্য ঘরে যান, নিমাইও উঠিয়া অমনি চাউল, দাউল সমস্ত এধার ওধার ফেলিয়া দধি-দুগ্ধের ভাণ্ড

ভাঙ্গিয়া চূরিয়া একাকার করেন। কে যে এ কাজ করে শচীদেবী তাহা বুঝিয়াই উঠিতে পারেন না। চারি মাসের শিশু নিমাই, সে কি এ কাজ করিতে পারে!

"যে সময়ে যখন না থাকে কেহ ঘরে।
যে কিছু থাকয়ে ঘরে সকল বিচারে॥
বিচারিয়া সকল ফেলায় চারিভিতে,
সর্ব্বঘর ভরে তৈল দুগ্ধ ঘোল ঘৃতে॥

—শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

অতঃপর গৌরাঙ্গের নামকরণের দিন সমাগত হইল; গ্রামের পুরনারীগণ সকলে আসিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন "নিমাই", আর নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বিদ্বানগণ নাম রাখিলেন "বিশ্বম্ভর"। অতঃপর জগন্নাথ শিশুর সম্মুখে ধান্য, পুঁথি, খড়ি, স্বর্ণ, রজতাদি উপস্থিত করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, নিমাই সে সমস্ত কিছু স্পর্শ না করিয়া ভাগবত ধরিলেন। তদ্দর্শনে সকলে বলিতে লাগিলেন, "বাঁচিয়া থাকিলে নিমাই বড় পণ্ডিত হইবে।" গ্রামের মেয়েরা সকলে নিমাইকে কোলে করেন, নিমাই কোলে উঠিয়াই কাঁদিতে আরম্ভ করেন। শেষে অনন্যগতি হইয়া মেয়েরা হরিনাম করিলে নিমাই চুপ করেন এবং কোলের উপরই নাচিতে থাকেন। এইভাবে শিশুকাল হইতে নিমাই লোককে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে কৌশলে প্রবৃত্ত করাইতে লাগিলেন। লীলাময়ের ছলনা বুঝা ভার!

নিমাই বড় দুষ্ট—বড় নির্ভীক। দিন দিন নিমাই যত বাড়িতে লাগিলেন ততই তাঁহার দৌরাত্ম্য বাড়িতে লাগিল। আগে তিনি ঘরের হাঁড়ি-কুড়ী ফেলিয়া সর্ব্বনাশ করিতেন, এখন বাড়ীতে সাপ ব্যাঙ যা আসে তাই ধরিতে যান। এবাড়ী ওবাড়ী যাইয়া কাহারও ঘর হইতে

নিমাই দুগ্ধ চুরি করিয়া খান, যাহার ঘরে কিছুই পান না তাহার ঘরে হাঁড়ী-কুড়ি ভাঙ্গিয়া দফারফা করেন। কোন বাড়ীতে যাইয়া যদি কোন শিশুকে ঘুমাইতে দেখেন নিমাই অমনি তাহাকে জাগান এবং কাঁদান, যেই কেহ দেখিতে পায় অমনি নিমাই দৌড়িয়া পলান, আর যদি কখন ধরা পড়েন তবে "আর করিব না" বলিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া সেদিনকার মত অব্যাহতি লাভ করেন। শিশুর ভাবগতিক দেখিয়া সকলেই অবাক হয়। নিমাই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নহেন। একস্থানে বসিয়া থাকিতে নিমাই কোন মতেই পারেন না। সর্ব্বদাই টো টো করিয়া বাড়ীর বাহিরে বেড়ান। একদিন দুই চোর নিমাইয়ের অঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কার দেখিয়া পরস্পরে পরামর্শ করিল যে, এই শিশুটিকে চুরি করিতে হইবে। এই ভাবিয়া এক চোর নিমাইয়ের নিকট গিয়া বলিল, "এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে বাবা!" এই ভাবিয়া চোর নিমাইকে কোলে লইল। নিমাই হাসিতে হাসিতে তাহাদের কোলে উঠিলেন। নিমাইকে বাজারের বড় কেহ চিনিল না, সকলে ভাবিল যাহার ছেলে সেই বুঝি শিশুকে লইয়া যাইতেছে। এদিকে চোর দুইটা মনে করিল এইবার কোন নির্জ্জন স্থানে শিশুটিকে লইয়া তাহার অঙ্গের গহনাপত্র সমস্ত কাড়িয়া লইব।

এ দিকে ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত অথচ নিমাই ফিরিলেন না দেখিয়া জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী সকলেই একেবারে ভাবিয়া আকুল। কি হইল, কোথায় গেল, কতদিন ত নিমাই মাঠে ঘাটে, হাটে, বাজারে যায়, এমনিধারা বিলম্ব ত কোন দিন হয় না!— ভাবিতে ভাবিতে সকলেই আকুল। এদিকে নিমাইকে কাঁধে করিয়া চোর দুইজন জগন্নাথ মিশ্রেরই বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। চোরেরা মায়ার প্রভাবে নিজ

বাড়ী মনে করিয়া জগন্নাথেরই বাড়ীতে আসিয়া নিমাইকে নামিতে বলিল। নিমাই নামিয়াই পিতার অঙ্কে গিয়া উঠিয়া বসিয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। চোর দুইটী দেখিয়াই ত অবাক্! হাঁ তাই ত কোথায় আসিলাম, এ কার বাড়ী—হাঁ তাই ত এ ত আমাদের বাড়ী নয়—হাঁ তাই ত এ কি করিয়াছি—এই বলিতে বলিতে তাহারা উদ্ধর্শ্বাসে ছুটিয়া পলাইল।

একদিন জগন্নাথ মিশ্র বলিলেন, "বাবা নিমাই—আমার পুস্তকখানি আন ত!" নিমাই পুস্তক আনিতে গেলেন, জগন্নাথ সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলেন যেন নূপুরের ধ্বনি হইতেছে। কিন্তু কৈ নিমাইয়ের পায়ে ত নুপুর নাই!

"বাপের বচন শুনি ধাই ঘরে যায়ে।
ঝুনু ঝুনু করিয়ে নুপুর বাজে পায়ে॥"

স্বামী স্ত্রী তখন স্থির করিলেন, ঘরে যে দামোদর শালগ্রাম আছেন এ নুপুরের ধ্বনি তাঁহাদেরই। তখন তাঁহারা পঞ্চগব্যে শালগ্রাম স্নান করাইয়া তাঁহার পূজা করিলেন।

একদিন এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে জগন্নাথ মিশ্রের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। জগন্নাথ—ব্রাহ্মণের পাকের আয়োজন করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ যেই গোবিন্দকে নিবেদন করিবার জন্য চক্ষু মুদ্রিত করেন, নিমাই অমনি যাইয়া তাহা ভক্ষণ করেন। এই ভাবে জগন্নাথ দুই দুই বার ব্রাহ্মণের পাকের আয়োজন করিয়া দিলেন, নিমাই দুই দুই বারই ব্রাহ্মণের অন্ন উচ্ছিষ্ট করিয়া দিলেন। জগন্নাথ আবার ব্রাহ্মণের রন্ধনের ব্যবস্থা করিলেন, এবার নিমাইকে তাঁহারা ঘুম পাড়াইয়া চারিদিকে সকলে বসিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণ এবারও যেই অন্ন উৎসর্গ করিলেন, অমনি নিমাই

সকলকে মোহাবিষ্ট করিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। নিমাইকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হায়। হায়! এবারও আমার ভাগ্যে অন্ন জুটিল না!"

নিমাই বলিলেন, "আমার আর অপরাধ কি? তুমি আমাকে ডাকিয়া আন কেন?"

"তুমি আমা ডাকি আন কি দোষ আমার?
মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান।
রহিতে না পারি আমি আসি তোমা স্থান।
আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব তুমি।
অতএব তোমারে দিলাম দেখা আমি॥"

ব্রাহ্মণ তখন বুঝিলেন, এই শিশুই ত্রিভুবনমোহন মুরলীধর যাঁহার ধ্যান তিনি নিরবধি করেন।

নিমাইয়ের এই কথা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ তখন আচমন করিয়া নির্বিঘ্নে ভোজন করিলেন।

এইভাবে প্রভু শৈশবে কতই না লীলা করিলেন। জগন্নাথ মিশ্র শুভ-দিনে শুভক্ষণে তাঁহার হাতে খড়ি দিলেন। কর্ণবেধ ও চূড়াকরণ সমাপ্ত হইল। শিশুর কি আশ্চর্য্য ব্যবহার! কাঁদিলে পর হরিনাম না করিলে কিছুতেই তিনি চুপ করেন না! গঙ্গার ঘাটে গিয়া নিমাই স্নানার্থীদিগকে বড়ই বিরক্ত করিতেন। জলে ডুব দিয়া তিনি কাহারও পা ধরিয়া টানিতেন, কাহারও গায়ে জল ছিটাইয়া দিতেন, আবার কাহারও নিকটে গিয়া বলিতেন, "তোমরা ফুল দিয়া কার পূজা করিতেছ, আমার পূজা কর।" লোকে এত বিরক্ত হইয়াও কিন্তু তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিতেন।

নিমাইয়ের এখন বিদ্যারম্ভের সময় হইয়াছে, তাই জগন্নাথ মিশ্র তাঁহার হাতে খড়িও দিয়াছেন। এই সময় একদিন গভীর রজনীতে নিমাইয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া গেলেন। ইহাতে মিশ্র-পরিবারে গভীর বিষাদের সঞ্চার হইল।

"বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস দেখিয়া ভক্তগণ।
অদ্বৈতাদি সভে বহু করিলা ক্রন্দন॥
উত্তম মধ্যম যে শুনিল নদীয়ায়।
হেন নাহি যে শুনিয়া দুঃখ নাহি পায়॥
জগন্নাথ শচীর বিদীর্ণ হয় বুক।
নিরন্তর ডাকে বিশ্বরূপ! বিশ্বরূপ॥"

বিশ্বরূপ নিরুদ্দেশ হইবার পর হইতে নিমাই আর বড় একটা বাহিরে যাইতেন না, সর্ব্বদা পিতামাতার নিকট অবস্থান করিতেন। নিমাইকে দেখিয়া জননী শচীদেবী বিশ্বরূপের বিরহ কতকটা ভুলিয়া গেলেন। জগন্নাথ মিশ্র রোরুদ্যমানকণ্ঠে শচীদেবীকে বলিলেন, "এই পুত্রও তোমার সংসারে থাকিবে না, বিশ্বরূপ নানাশাস্ত্র পড়িয়া শিখিয়াছিল যে, সংসার অনিত্য, এও যদি ঐরূপ সর্ব্বশাস্ত্র পড়ে, তাহা হইলে দেখিও এও সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।"

অতঃপর নিমাইয়ের উপনয়নের দিন আসিল। জগন্নাথ মহা সমারোহে পুত্রের উপনয়ন সংস্কার করিলেন। নবদ্বীপে তখন গঙ্গা দাস নামে এক প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। জগন্নাথ নিমাইকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাদাসের টোলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। নিমাই গঙ্গাদাসের নিকটে থাকিয়া পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার এমন আশ্চর্য্য ক্ষমতা যে, তিনি গুরুর প্রতি যুক্তি খণ্ডন করিয়া দিতে লাগিলেন। গঙ্গাদাসের টোলের আর যত ছাত্র কেহই নিমাইয়ের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে

না। গঙ্গার ঘাটে মধ্যাহ্নকালে যত টোলের ছাত্র অধ্যয়ন করে নিমাই ঘাটে গিয়া তাহাদিগকে ত্যক্ত-বিরক্ত করিয়া প্রশ্নের উপর প্রশ্ন-বাণে তাহাদিগকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, নিমাইয়ের উপর কোন ছাত্রই অসন্তুষ্ট হন না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিমাইয়ের ক্রোধের পরিমাণ বাড়িতে লাগিল; কোন কিছু দিতে ত্রুটি হইলে নিমাই ঘরের জিনিষপত্র ভাঙ্গিয়া চূরমার করিতেন।

গঙ্গাদাসের টোলে পড়িতে পড়িতেই নিমাইয়ের প্রতিভার কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কেবল ব্যাকরণ নহে—দর্শন, অলঙ্কার, প্রভৃতি নানা শাস্ত্র তিনি গঙ্গাদাসের নিকট না পড়িলেও অধ্যাপকগণের মুখে শুনিয়া শুনিয়া তিনি তাহাতে এরূপ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, দর্শন, অলঙ্কারের বড় বড় ছাত্র পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত তর্কে পরাজিত হইত।

বিশ্বরূপের সন্ন্যাস অবলম্বনের পর জগন্নাথ মিশ্র একদিন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, নিমাইও যেন সন্ন্যাসী হইয়া যাইতেছেন। এই চিন্তায় দিন দিন তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। অচিরাৎ তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন। নিমাই জননী শচীদেবীকে নানা প্রবোধবাক্য বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

পিতার মৃত্যুর পরও নিমাই গঙ্গাধরের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দৌরাত্ম্যের মাত্রাও ক্রমে বাড়িয়া যাইতে লাগিল, তিনি সামান্য কারণে উত্যক্ত হইয়া ঘরের সমস্ত জিনিষপত্র চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিতেন। সতীর্থ ও টোলের অন্যান্য ছাত্রদিগকে তিনি তর্ক-বিতর্কে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া তুলিতেন। ক্রমে ব্যাকরণাদি নানাশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া নিমাই নিজেই এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেন। তাঁহার

অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা ইতিপূর্ব্বেই চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ফলে দলে দলে ছাত্র তাঁহার নিকট পড়িবার জন্য আগমন করিতে লাগিল। অলঙ্কারই বলুন, দর্শনই বলুন, যে কোন শাস্ত্র সম্বন্ধে তর্ক করিবার জন্য যে কেহ নিমাইয়ের নিকট আসিত নিমাই তাহাকেই পরাস্ত করিয়া দিতেন। এই সময়ে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্য ও নবদ্বীপে শ্রীবাস পণ্ডিত-প্রমুখ বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেন। তাঁহারা নিমাইকে হরিনামকীর্ত্তন করিতে বলিলে নিমাই তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "তোমরা কীর্ত্তন করিতে হয় কর, আমি কিন্তু হরিনাম লইয়া থাকিব।"

নিমাই এখন ষোড়শ বৎসরের উদ্ভিন্ন যুবক। তাহা দেখিয়া শচী দেবী পুত্রের বিবাহের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। নবদ্বীপে তখন বল্লভাচার্য্য নামে একজন সুব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার লক্ষ্মী নাম্নী রূপে গুণে পরমাসুন্দরী এক কন্যা ছিল। একদিন স্নান করিবার জন্য নিমাই গঙ্গার ঘাটে গিয়াছেন, লক্ষ্মীও গিয়াছেন। উভয়ের দৃষ্টি উভয়ের উপরে পড়িতেই পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিলেন।

সেইদিন বনমালী আচার্য্য নামে এক ব্রাহ্মণ শচীদেবীর নিকট গিয়া বলিলেন, "পুত্রের ত বিবাহের বয়স হইয়াছে। বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতেছেন না কেন? নবদ্বীপে বল্লভাচার্য্য নামে ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহার লক্ষ্মীর ন্যায় কন্যা আছে তাহার সহিত পুত্রের বিবাহ দিন।" শচী দেবী বলিলেন, "পিতৃহীন পুত্র আমার, এখন পড়িতেছে পড়ুক, তার পর বিবাহ দিব।" শচীদেবীর কথা শুনিয়া বনমালী আচার্য্য হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। পথিমধ্যে নিমাইয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। নিমাই জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কোথায় গিয়াছিলেন?" বনমালী বলিলেন, "আমি তোমারই বিবাহের কথাবার্ত্তা বলিবার জন্য তোমার মাতার নিকট

গিয়াছিলাম ; কিন্তু তিনি এখন বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক।" আচার্য্যের কথা শুনিয়া নিমাই তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিলেন এবং মাকে আসিয়া বলিলেন, "মা তুমি আচার্য্যের কথায় কান দেও নাই কেন?" বিবাহ করিতে পুত্রের ইচ্ছা হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া শচীদেবী তৎক্ষণাৎ বনমালী আচার্য্যকে বিবাহের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। আচার্য্য আর কালবিলম্ব না করিয়া একেবারে বল্লভাচার্য্যের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বল্লভাচার্য্য শুনিয়া বলিলেন, "এ ত আমার পরম সৌভাগ্য! নিমায়ের মত জামাতা পাইলে আমি ত নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করিব, তবে একটা কথা আমি পাঁচটি হরিতকী ছাড়া আর কিছু পারিব না।" বনমালী আসিয়া বল্লভের কথা শচীমাতাকে জানাইলেন, শচীমাতা সম্মতা হইলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে লক্ষ্মীর সহিত নিমাইয়ের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল।

"প্রভু পাশে লক্ষ্মী হইলেন বিদ্যমান।
শচীগৃহ হইল পরম জ্যোতির্ধাম॥"

নিমাইয়ের বিবাহ হইল বটে, কিন্তু বালকসুলভ চপলতা তাঁহার গেল না। কিয়দ্দিন পরে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বর পুরী নবদ্বীপে আগমন করেন। আসিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের বাটীতে উঠেন। অদ্বৈতচার্য্য পরম ভক্তি-ভরে তাঁহাকে সমাদর করেন। একদিন ঈশ্বর পুরীর সহিত পথিমধ্যে নিমাইয়ের সাক্ষাৎকার হইল, ঈশ্বর পুরী নিমাইকে দেখিয়াই নিমাই পণ্ডিত বলিয়া চিনিতে পারিলেন; নিমাইও ঈশ্বর পুরীকে দেখিয়া একজন পরম ভাগবত বলিয়া চিনিতে পারিলেন। নিমাইয়ের অনুরোধে ঈশ্বর পুরী একদিন নিমাইয়ের বাটীতে গেলেন। পুরী "কৃষ্ণলীলামৃতে"র রচয়িতা, তিনি কৃষ্ণকথা বলিতে লাগিলেন, দাম্ভিক নিমাই যদিও কৃষ্ণ-কথা শুনিতে তত ভালবাসিতেন না এবং দাম্ভিক বৈয়াকরণিক বলিয়া

তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল, তথাপি ঈশ্বর পুরীর কথাগুলি তিনি অতি মনো-যোগের সহিত শুনিলেন এবং ঈশ্বর পুরীর একান্ত অনুরোধে তাঁহার ভক্তি-গ্রন্থের কয়েক স্থানে ছন্দঃ ও ব্যাকরণের দোষ সংশোধন করিয়া দিলেন।

"প্রভু বলে কৃষ্ণ বাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দেখে দোষ সেই পাপী জন॥
ভক্তের কবিত্ব যে তে মতে কেনে নয়।
সর্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয়॥

—শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত।

কিন্তু তবুও ঈশ্বর পুরী তাঁহাকে অনুরোধ করায় তিনি 'শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃতে'র কতিপয় ভ্রম প্রদর্শন করেন।

শাস্ত্রে বলে—

"মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়স্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥"

মূর্খ নারায়ণকে নমো বিষ্ণায় বলে, পণ্ডিত নমো বিষ্ণবে বলে, কিন্তু পুণ্য উভয়েরই হয়, কেননা, ভগবান ভাবগ্রাহী। এই ঈশ্বর পুরীর নিকট হইতেই নিমাই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে নবদ্বীপে কেশব কাশ্মীরি নামে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আগমন করেন। তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অনেক বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তিনি নবদ্বীপে আসিয়া প্রচার করিলেন যে, তিনি সকল পণ্ডিতের সহিত সকল বিষয়েই তর্ক-বিতর্ক করিতে প্রস্তুত আছেন, যদি কোন পণ্ডিত তাঁহার সহিত তর্ক করিতে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে তাঁহাকে জয়পত্র

দিতে হইবে। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী প্রমাদ গণিলেন। এতদিনে বুঝি নবদ্বীপের গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হইল!

একদিন নিমাই পণ্ডিত নদীতটে ছাত্রগণসহ সভা করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় কাশ্মীরি পণ্ডিত সভামধ্যে গিয়া নিমাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার নামই কি নিমাই? তুমিই না নবদ্বীপের প্রধান বৈয়াকরণিক?" নিমাই বলিলেন, "আমি ব্যাকরণের অধ্যাপনা করি বটে, কিন্তু ব্যাকরণে আমার অধিকার সামান্য।" কাশ্মীরি দিগ্বিজয়ী নিমাইয়ের বিনয়বাক্য বুঝিয়াও বুঝিলেন না। তিনি দম্ভভরে বলিলেন, "নিমাই পণ্ডিত! তুমি যে কোন বিষয়ে হউক আমাকে প্রশ্ন করিতে পার।" নিমাই বলিলেন; "আচ্ছা যদি নিতান্তই আমাদিগকে আপনার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইবার সুযোগ দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ঐ যে সম্মুখে কুলুকুলু-নাদিনী জাহ্নবী, ঐ জাহ্নবীর মহিমা কিছু বর্ণন করুন, আমরা শুনিয়া পরিতৃপ্ত হই।" কেশব কাশ্মীরি মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া একশত শ্লোকে গঙ্গার মহিমা বর্ণন করিলেন। দিগ্বিজয়ীর সুমধুর শ্লোক শুনিয়া সকলেই মোহিত হইলেন। দিগ্বিজয়ীর অনেক পীড়াপীড়িতে নিমাই সেই এক শত শ্লোকের মধ্যে দুইটি শ্লোকের অলঙ্কারগত দোষ প্রদর্শন করিলেন। দিগ্বিজয়ী নিমাইয়ের অসাধারণ স্মরণশক্তি দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন,"আমি এতদিন নিমাই পণ্ডিতকে শুধু বৈয়াকরণিক বলিয়াই জানিতাম, আজ বুঝিলাম নিমাই পণ্ডিত আলঙ্কারিকও বটে! নিমাই, তুমি শ্লোকের মধ্যে যে সমস্ত দোষ-ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছ, তাহা অতি প্রকৃতই হইয়াছে।" দিগ্বিজয়ীর ম্লান মুখ ও পরাজয়ে অবনতশির দেখিয়া নিমাইয়ের ছাত্রগণ সকলেই হাসিয়া উঠিল, নিমাই তাহাদিগকে ধমক দিয়া হাসিতে নিষেধ করিলেন। পরদিন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিমাইয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

দিগ্বিজয়ীকে পরাস্ত করিবার পর নিমাই পণ্ডিতের সুযশঃ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল, নানা দিগ্দেশ হইতে বহু ছাত্র আসিয়া নিমাই পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে ভর্ত্তি হইল। "নিমাই পণ্ডিত শুধু যে ছাত্রগণকে পড়াইতেন তাহা নহে, তাঁহার বাটীতে প্রতিদিন প্রায় ২০।২৫ জন বিদ্যার্থী আহার করিত—জননী শচীদেবী ও পুত্রবধূ লক্ষ্মীদেবী পরম যত্নের সহিত তাহাদের জন্য রন্ধনাদি করিতেন।

এইভাবে নবদ্বীপে অধ্যাপনা করিয়া এবং সংস্কৃত-বিদ্যার সৌরভে চতুর্দ্দিক বিকীর্ণ করিয়া নিমাই ভাবিলেন, আর কত কাল পাষণ্ডদের অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা দেখিব? চারিদিকে বৈষ্ণবের লাঞ্ছনা, বৈষ্ণবের দুর্গতি আর ত দেখিতে পারি না! এই ভাবিয়া নিমাই আত্ম-প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু আত্মপ্রকাশ করিবার পূর্ব্বে একবার গয়াভূমি দর্শন করিবার বাসনা তাঁহার চিত্তে বলবতী হইল। ইতিমধ্যে তাঁহার বহু শিষ্য হইয়াছিল, নিমাই শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে নানা গ্রাম অতিক্রম করিয়া অবশেষে গয়াধামে উপস্থিত হইলেন।

"ইচ্ছাময় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ভগবান।
গয়াভূমি দেখিতে ইচ্ছা হৈল তান॥
শাস্ত্রবিধি মত শ্রাদ্ধকর্ম্মাদি করিয়া।
যাত্রা করি চলিলা অনেক শিষ্য লৈয়া॥
জননীর আজ্ঞা লই মহা হর্ষ মনে।
চলিলেন মহাপ্রভু গয়া দরশনে॥"

গয়াধামে গিয়া ব্রাহ্মণগণের মুখে হরিপাদপদ্মের মহিমা শুনিয়া নিমাই আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

"অবিচ্ছিন্ন গঙ্গা বহে প্রভুর নয়নে।
পরম অদ্ভুত রহি দেখে বিপ্রগণে॥"

সেই সময়ে ভক্তপ্রবর ঈশ্বর পুরীও গয়াধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিমাই ঈশ্বর পুরীকে নমস্কার করিলেন, ঈশ্বর পুরীও নিমাইকে আলিঙ্গন করিলেন। নিমাই ঈশ্বর পুরীকে বলিলেন, "তোমার পাদপদ্ম আমার কোটি কোটি তীর্থ।" ঈশ্বর পুরী শুনিয়া বলিলেন, "নিমাই তুমি শুধু পণ্ডিত নহ তুমি ঈশ্বরের অংশ।" গয়াধামে পিতৃশ্রাদ্ধাদি সারিয়া নিমাই ঈশ্বর পুরীর নিকট দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। ক্রমে নিমাইয়ের অন্তর্নিহিত ভক্তিরস বাহিরে প্রকটিত হইল। একদিন নিভৃতে বসিয়া নিমাই "কৃষ্ণরে বাপরে! মোর জীবন শ্রীহরি" বলিয়া একেবারে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ আসিয়া তবে তাঁহাকে সুস্থ করেন। গয়াধামে কিছুকাল থাকিয়া নিমাই নব প্রেমের বন্যা সঙ্গে লইয়া সশিষ্য নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। নিমাই গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া নবদ্বীপের যাবতীয় লোক তাঁহার মুখে গয়া-কাহিনী শুনিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। নিমাই যতই গয়ার মাহাত্ম্য বলেন, ততই তাঁহার নয়ন দিয়া বিগলিতধারায় প্রেমাশ্রু পড়িতে লাগিল, তাহা দেখিয়া সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল—

"এমত ইহানে কভু নাহি দেখি আর।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল ইহানে।
কি বিভব পথে বা হইল দরশনে।"

সেদিন আর নিমাই গয়া-কাহিনী কাহাকেও বলিতে পারিলেন না, পরদিন শুক্লাম্বরের গৃহে নিমাই গেলেন, সেখানে সদাশিব, মুরারি প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়া মিলিত হইলেন। নিমাই সেখানে "হা কৃষ্ণ" বলিয়া স্তম্ভের উপর পড়িয়া গেলেন। স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া গেল। ভক্তরাও সকলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তদবধি সকলেই নিমাইয়ের ভাবান্তর দৃষ্টি করিতে লাগিল। শচীদেবী পুত্রের ভাববিপর্য্যয় দেখিয়া গঙ্গা

বিষ্ণুর পূজা করিতে লাগিলেন। ছাত্রগণ পড়িতে আসে, নিমাই তাহাদিগকে আজ নয়, কাল আসিও বলিয়া বিদায় দেন। শচীদেবী লক্ষ্মীকে আনিয়া নিমাইয়ের সমক্ষে বসান, প্রভু সেদিকে দৃক্‌পাতও করেন না। একদিন, দু'দিন করিয়া কয়েকদিন গেল, একদিন ছাত্রগণ "হরিধ্বনি" করিয়া পড়িতে বসিল। প্রভু সূত্র ব্যাখ্যান করিতে বসিলেন।—

"প্রভু বোলে সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বই না বোলয়ে আন॥
কর্ত্তা হর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ যে ঈশ্বর।
অজ-ভব আদি যত কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে।
ব্যর্থ জন্ম যায় তার অকথ্য-কথনে॥
আগম-বেদান্ত আদি যড় দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে "কৃষ্ণ পদে ভক্তিধন।"

—শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত।

এইভাবে সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে করিতে প্রভুর যখন কথঞ্চিৎ বাহ্যজ্ঞান হইল, তখন তিনি বলিলেন, "কেমন কিছু বুঝিলে কি ?" ছাত্রগণ বলিল, "কৈ কিছুই ত বুঝিলাম না, আপনি যাহা কিছু বলিলেন, সবই কেবল কৃষ্ণনাম।" তখন নিমাই বলিলেন, "আচ্ছা আজ থাক্, চল গঙ্গাস্নানে যাই।" এইভাবে নিমাই হরিনামে মাতোয়ারা হইলেন। তিনি হরিকথা ছাড়া আর কিছুই বলিতেন না। প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নানে যাইতে শ্রীবাস প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র নিমাই তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। শ্রীবাসের বাটীতে প্রভু প্রতিদিন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের

চতুষ্পাঠী চিরদিনের জন্য বন্ধ হইল—ছাত্রগণ গ্রন্থ ফেলিয়া নিমাইয়ের সহিত হরিনামে মাতোয়ারা হইল—চারিদিক হইতে দলে দলে লোক আসিয়া নিমাইয়ের সঙ্গে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল। শান্তিপুরে শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বাস করিতেছিলেন, তিনি বহুদিন হইতে একজন মহাপুরুষের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, নিমাইয়ের ভাবাবেশের কথা শুনিয়া তাঁহার মনে সেই কল্পিত মহাপুরুষ সম্বন্ধে বিশ্বাস দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল। নিমাই নবদ্বীপের বৈষ্ণবপ্রধান শ্রীবাসের অঙ্গনে কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাত্রির উপর রাত্রি কাটিতে লাগিল, নিমাইয়ের বাহ্যজ্ঞান নাই। শত শত লোক শ্রীবাসের বাটীতে উপস্থিত হইয়া নিমাইয়ের ভাববিভোরতা দেখিয়া পরিতৃপ্ত ও বিমুগ্ধ হইতেন।

অতঃপর নিমাই শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। নিমাইকে দেখিয়াই অদ্বৈতাচার্য্য কৃষ্ণপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, নিমাই ভাবের আবেগে ভূতলে পড়িয়া জ্ঞানহারা হইলেন। অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া পুষ্প বিল্বপত্র দিয়া পূজা করিলেন। নিমাই সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখেন, অদ্বৈতা চার্য্য তাঁহাকে পূজা করিয়াছেন। তখন তিনি অদ্বৈতের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন।

নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিমাই আবার হরিসঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইলেন। নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য, হরিদাস প্রভৃতি সকলে আসিয়া তাঁহার সহিত সঙ্কীর্ত্তনে মিলিত হইলেন। নিমাইয়ের এখন আর বড় বাহ্যজ্ঞান নাই। তিনি একদিন শ্রীবাসের বাটীতে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে বিষ্ণু-খট্টায় উপবেশন করিয়া শিষ্য ও ভক্তবৃন্দকে বলিলেন, "তোমরা আমার অভিষেক কর।" ভক্তগণ ইহা শুনিয়া দূর্ব্বা, ধান্য,

তুলসী দিয়া তাঁহার পাদপদ্ম সুশোভিত করিল, কেহ চম্পক, মল্লিকা, কুন্দ, কদম্ব, মালতী দিয়া তাঁহার পাদপদ্মে অর্ঘ্য প্রদান করিল। প্রভু হাত নাড়িয়া বলিলেন, "আমায় কিছু খাইতে দাও।" তখন—

"কেহো দেই কদলক, কেহো দিব্য মুদ্গ।
কেহো দধি ক্ষীর বা নবনী কেহো দুগ্ধ ॥
প্রভুর শ্রীহস্তে সব দেয় ভক্তগণ।
আমায়ায় মহাপ্রভু করেন ভোজন ॥"

অতঃপর প্রভু একে একে সকল শিষ্যকে ডাকিয়া তাহাদের জীবনকথা সম্বন্ধে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। প্রভু খোলা-বেচা ব্রাহ্মণ শ্রীধরকে আনিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশ পাইবামাত্র শিষ্যগণ শ্রীধর ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। প্রভু কহিলেন, "শ্রীধর তুমি কিছু বর প্রার্থনা কর।" শ্রীধর বলিলেন, "প্রভু আর কি বর মাগিব? তুমি জন্মে জন্মে আমার নাথ হইও।"

"শ্রীধর বোলয়ে আমি কিছুই না চাই।
হেন কর প্রভু! যেন তোর নাম গাই ॥"

নিমাই একে একে সকল ভক্তকে বর দিলেন, কিন্তু মুকুন্দকে কিছুই দিলেন না। মুকুন্দ সর্ব্বদা সুমধুর সঙ্গীতে নিমাইকে পরিতৃপ্ত করেন, অথচ সেই মুকুন্দকে কোন বর না দেওয়ায় শ্রীবাস নিমাইকে বলিলেন, "প্রভু এ তোমার কি লীলা? মুকুন্দ নিশিদিন সুমধুর গানে তোমায় পরিতৃপ্ত করে, তুমি সকলকে বর দিলে, অথচ মুকুন্দকে দিলে না।"

"শ্রীবাস বোলেন শুন জগতের নাথ।
মুকুন্দ কি অপরাধ করিল তোমাত ॥
মুকুন্দ তোমার প্রিয় মো সবার প্রাণ।
কেবা নাহি দ্রবে শুনি মুকুন্দের গান ॥"

প্রভু বলিলেন, "দেখ মুকুন্দ যখন যে দলে মিশে, তখন সেই দলের কথা বলিয়া আমার স্তুতি করে।"

"ভক্তি হৈতে বড় আছে ইহা যে বাখানে।
নিরন্তর জাঠি মারে মোরে সেই জনে।
ভক্তি স্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেক উহার হৈল দরশন-বাধ॥"

প্রভুর কথা শুনিয়া মুকুন্দ কাঁদিতে লাগিলেন। মুকুন্দের ক্রন্দন দেখিয়া প্রভু তাহার উপর করুণাপরবশ হইয়া বলিলেন, "কোটি জন্ম পরে তুমি আমার দর্শন পাইবে।" প্রভুর এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া মুকুন্দ মনে সান্ত্বনা পাইলেন।

এইভাবে কখনও বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া, কখনও বা চৈতন্য লাভ করিয়া নিমাই ভক্তগণসহ হরিনামামৃত পান করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। নবদ্বীপের ঘরে ঘরে হরিনাম বিতরণ করিবার জন্য নিমাই এই সময় হরিদাস ও নিত্যানন্দকে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, "সারাদিন নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিতরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে আসিয়া আমার নিকট সারাদিনের কার্য্যের বিবরণ দিবে।" প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া হরিদাস ও নিত্যানন্দ নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে নাম প্রচার করিতে বাহির হইলেন। কত লোকে তাঁহাদিগকে উপহাস করিতে লাগিল—কত জনে বিদ্রূপ করিতে লাগিল, তাঁহারা তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। এই সময়ে নবদ্বীপে জগাই ও মাধাই নামে দুইজন সুরাসেবী দুর্দ্ধর্ষ যুবক ছিল। তাহারা দুই ভ্রাতা। একদিন তাহারা সুরাপান করিয়া রাস্তার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, নিত্যানন্দ তাহাদিগকে মধুর হরিনামের মহিমা শুনাইবার জন্য তাহাদের নিকট গেলেন। মাধাই ক্রোধে আত্মহারা হইয়া এক

কলসীর কানা নিত্যানন্দের চক্ষে ছুঁড়িয়া মারিল। অবিরল ধারে নিত্যানন্দের বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া শোণিতধারা ঝরিতে লাগিল। নিত্যানন্দ কিন্তু ইহাতে একটুও বিচলিত হইলেন না, তিনি ধৈর্য্যের সহিত সমস্তই সহ্য করিলেন। তখন গৌরচন্দ্র স্বয়ং সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া জগাই মাধাইকে নিজ বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং নিত্যানন্দের সহিষ্ণুতা-দর্শনে বিমোহিত হইলেন।

যে সময়ে চৈতন্যদেব এইভাবে নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছিলেন, সেই সময়ে হুসেন সাহ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁহার প্রতিনিধিরূপে একজন কাজী নবদ্বীপ শাসন করিতেন। গৌরচন্দ্র হরিনামে নবদ্বীপকে মাতাইয়া তুলিয়াছেন, চারিদিকে বৈষ্ণবদিগের মহিমা বিঘোষিত হইতেছে, এ চিন্তা কাজী কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি নানা প্রকারে গৌরাঙ্গের ভক্তদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। কোন কোন দিন নিজে সদলবলে সঙ্কীর্ত্তনের স্থলে উপস্থিত হইয়া গায়কদের খোলকরতাল ভাঙ্গিয়া দিলেন, ইহা দেখিয়া কোন কোন ভীরু লোক হরিনাম-কীর্ত্তন বন্ধ করিল বটে, কিন্তু যাঁহারা সত্য সত্য হরিনামে বিশ্বাসী তাঁহারা কোনও ক্রমেই ইহা ছাড়িলেন না। ক্রমে গৌরচন্দ্রের কর্ণে ভক্ত-পীড়নের কথা পৌছিল, তিনি নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "চল আমরা প্রাণ ভরিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করি, দেখি কে আমাদের কার্য্যে বাধা দেয়।" গৌরের আদেশমত দলে দলে ভক্তগণ তাঁহার বাটীতে সমবেত হইতে লাগিলেন, একদল দুইদল করিয়া বহু দলে সঙ্কীর্ত্তনের দল বিভাগ করিয়া গৌরচন্দ্র নিজে শেষ দলের নায়কত্ব গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। শত শত খোল-করতালের বাদ্যে সমগ্র নবদ্বীপ মুখরিত হইয়া উঠিল। কাজী আপন আলয়ে বসিয়া সেই

তুমুল ধ্বনি শুনিতে পাইয়া প্রমাদ গণিলেন। তৎক্ষণাৎ অনুচরবর্গকে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন। অনুচরেরা কাজিকে গিয়া বলিল :—

"কোটি কোটি লোক সঙ্গে নিমাই আচার্য্য।
সাজিয়া আইসে আজি কিবা করে কার্য্য॥
লাখ লাখ মহাতাপ দেউটি সব জ্বলে।
লাখ কোটি লোক মেলি হিন্দুয়ানী বোলে॥
দুয়ারে দুয়ারে কলা ঘট আম্রসব।
পুষ্পময় পথ সব দেখি নদীয়ার॥
না জানি কতেক খই কড়ি ফুল পড়ে।
বাজন শুনিতে দুই শ্রবণ উফড়ে॥
হেন মত নদীয়ার নগরে নগরে।
রাজা আনিতেও কেহ এমত না করে॥
যে সকল নগরিয়া মারিল আমরা।
আজি কাজি মার বলি আইসে তাহারা॥"

অনুচরদিগের কথা শুনিয়া কাজী আর কালবিলম্ব না করিয়া বাটীর মধ্যে লুকাইয়া পড়িলেন। এদিকে গৌরচন্দ্র বহু সহস্র ভক্তসহ কাজীর বাটীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "কাজী সাহেব কোথায়, ডাকিয়া আন।" গৌরাঙ্গের আহ্বানে কাজী স্ত্রীলোকের ন্যায় বাটীর অভ্যন্তরে লুকাইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি বাহিরে আসিয়া গৌরচন্দ্রের সকাশে উপস্থিত হইবামাত্র গৌরচন্দ্র বলিলেন, "আমরা আপনার বাটীতে আসিয়াছি, আর আপনি বাড়ীর ভিতরে বসিয়া আছেন?" গৌরচন্দ্রের কথায় কাজী বিশেষ লজ্জিত হইলেন। অতঃপর কাজী ও গৌরচন্দ্র উভয়ের মধ্যে বহুক্ষণ ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে কথা-

বার্ত্তা হইল। কাজী বলিলেন, "অতঃপর আপনাদের উপর আর কোনরূপ অত্যাচার করা হইবে না, আপনারা স্বচ্ছন্দে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইবেন।" বলা বাহুল্য, শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট কাজীর এই নৈতিক পরাজয় নিতান্ত সামান্য পরাজয় নহে। যুগে যুগে খাঁটি ভক্ত সাধক যাঁহারা তাঁহারা এই ভাবে বিনা রক্তপাতেও লোককে পরাজিত করিয়া আসিতেছেন।

নবদ্বীপে কিছুকাল হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া গৌরাঙ্গদেব ভাবিলেন, এমন সুধামাখা হরিনাম কি কেবল নবদ্বীপেই আবদ্ধ রাখিব? আমার গৌড়বাসী ভ্রাতৃগণ কি এমন মধুর নামের কোন আস্বাদ পাইবে না? গৌরচন্দ্র বঙ্গের দ্বারে দ্বারে এই মধুর নাম প্রচার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী না হইলে ত এই মহাব্রত তিনি উদ্‌যাপন করিতে পারিবেন না। জগতে এপর্য্যন্ত যাঁহারাই কোন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছে, তাঁহারাই যে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন! গৌরচন্দ্র এবার সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া বাহির হইতে সঙ্কল্প করিলেন। কেশব ভারতী নামক একজন পরিব্রাজক দণ্ডী এই সময়ে নবদ্বীপে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গৌরচন্দ্র তাঁহার নিকট অতি সংগোপনে দীক্ষা লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। গৌরাঙ্গের অনুরোধে কেশব ভারতী তাঁহাদের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। দীক্ষার দিন স্থিরীকৃত হইল। কেশব ভারতী তৎপর দিবস কাটোয়ায় তাঁহার আশ্রমে চলিয়া গেলেন। নিমাই সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিবেন, নিত্যানন্দকে এ কথা বলিলেন। ক্রমে ক্রমে গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাস-গ্রহণের বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার কর্ণেও এ সংবাদ পৌঁছিল। শচীদেবী কাঁদিতে কাঁদিতে নিমাইকে বলিলেন, "বাবা সত্যই কি তুমি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবে?"

নিমাই বলিলেন, "মা, এ সংসারে কিছুই নিত্য নয়, সকলই অচিরস্থায়ী। শ্রীকৃষ্ণের ভজন পূজন ও নামকীর্ত্তনই মানব-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। নিমাই শচীদেবীকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু শচীর মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না।

শচীদেবী বলিলেন—

"অদ্বৈত শ্রীবাস আদি তোর অনুচর।
নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোসর॥
পরম বান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে।
গৃহে রহি কীর্ত্তন করহ তুমি রঙ্গে॥
ধর্ম্ম বুঝাইতে বাপ! তোর অবতার।
জননী ছাড়িয়া কোন্ ধর্ম্ম বা বিচার॥"

আর এদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া! স্বামীর বৈরাগ্য অবলম্বনের কথা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া যৎপরোনাস্তি মনোকষ্টে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। সংসারের কোন কার্য্যে আর তাঁহার শান্তি নাই—কোন বিষয়েই তাঁহার মন নাই। বিষ্ণুপ্রিয়াকে গৌরচন্দ্র অনেক বুঝাইলেন। দেখ আমি যেখানেই যাই, সর্ব্বদা তোমারই রহিব। যখনই তুমি আমাকে স্মরণ করিবে, আমি তখনই তোমার নিকট উপস্থিত হইব। ক্রমে নিমাইয়ের দীক্ষা গ্রহণের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। ১৪৩১ শকে সন্ন্যাস-যাত্রার পূর্ব্বদিন প্রত্যুষ হইতে না হইতেই গৌরচন্দ্র শয্যা ত্যাগ করিয়া শ্রীবাসের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। চারিদিক হইতে তাঁহার ভক্তগণ আসিয়া সম্মিলিত হইল, মহানন্দে সকলে কীর্ত্তন করিলেন। অতঃপর গঙ্গাতটে যাইয়া শিষ্যগণ সহ নিমাই হরিকথাপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, নিমাই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত এক

শয্যায় শয়ন করিলেন। কবি লোচনদাস বলেন, সে রাত্রি নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে মধুর আলিঙ্গনে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। ক্রমে রজনী অবসানপ্রায় হইল। বিষ্ণুপ্রিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। বাতায়ন দিয়া পৌর্ণমাসীর সুধাংশুকিরণ আসিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বর্ণাভ গণ্ডস্থলে পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে। গৌরাঙ্গ শয্যা হইতে উঠিয়া অনিমেষ-নয়নে তাহা দেখিতে লাগিলেন। এক পা দুই পা করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, আবার একবার পশ্চাৎ দিকে অবলোকন করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখশশী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। দাম্পত্য প্রেম ও বিষ্ণুপ্রেম এতদুভয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ দ্বন্দ্ব চলিবার পর গৌরসুন্দর গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ঘরের বাহিরে দরজায় মাতা শচীদেবী ভূম্যবলুণ্ঠিতা ছিলেন। গৌরসুন্দর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সবেগে চলিয়া গেলেন। অভাগী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর প্রেমালিঙ্গনে আজ পরিতৃপ্ত হইয়া এমন ঘুম ঘুমাইতেছেন যে, তাঁহার সংজ্ঞা নাই। কোন সময়ে যে তাঁহার হৃদয়বল্লভ তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই। ক্রমে প্রাচীললাটে বালভানুর উদয় হইল। চারিদিকে প্রভাত-সহচর পক্ষিকুল আপনার স্বভাবসিদ্ধ স্বরে কাকলী করিতে লাগিল। বিষ্ণুপ্রিয়া নেত্রোন্মীলন করিলেন, করিয়া দেখিলেন,পার্শ্বে জীবনের জীবন গৌর-সুন্দর নাই। সমস্ত জগৎ তাঁহার চক্ষের সমক্ষে ঘুরিতে লাগিল, মনে হইল যেন কে তাঁহার হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়াছে! আগে যদি জানিতাম, এমনি ভাবে আমাকে ফাঁকি দিয়া যাইবেন, তবে কি তাঁহাকে যাইতে দিতাম। আমি তাঁহার পা' দুখানি ধরিয়া আটকাইয়া রাখিতাম। আবার ভাবিলেন, না, না, আমার স্বামী দেবতা—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। দেবতার লীলা বুঝে কার সাধ্য! তিনি

গিয়াছেন বিশ্ববাসীর কল্যাণ-কামনায়, তাঁহাকে কি বাধা দেওয়া উচিত ?

রজনী প্রভাত হইলে শিষ্যবৃন্দ আসিয়া দেখেন, গৌরসুন্দর ঘরে নাই, মাতা শচীদেবী মৃতের ন্যায় স্পন্দহীন ভাবে পড়িয়া রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে ভক্তগণ কাঁদিয়া আকুল হইল—অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়াও সমস্ত লোকলজ্জা বিস্মৃত হইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন। কোন কোন শিষ্য বলিলেন, "যখন গৌরচন্দ্রই চলিয়া গেলেন, তখন আমাদের আর এ জীবন রাখিয়া লাভ কি, চল আমরাও তাঁহার অনুসরণ করি।" ক্রমে বহু লোক আসিয়া নিমাইয়ের গৃহে সমবেত হইল। নিমাই ঘরের দ্বার অতিক্রম করিবার সময় দেখিয়াছিলেন, দ্বারদেশে শচীমাতা মৃতার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। তিনি মাতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন।
পড়িলাঙ শুনিলাঙ—তোমার কারণ॥
আপনার তিলার্দ্ধেকো না লইলা সুখ।
আজন্ম আমার তুমি বাড়াইলা ভোগ॥
দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমার।
আমি কোটী জন্মেও নারিব শুধিবার॥
তোমার সদ্‌গুণ্য সে তাহার প্রতিকার।
আমি পুন জন্ম জন্ম ঋণী যে তোমার॥
শুন মাতা! ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার॥
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ।
তার ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত॥

দশদিন অন্তরে কি এখনে বা আমি।
চলিলেও কোন চিন্তা না করিহ তুমি॥
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে সব মোর ভার॥"

—শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত।

এই বলিয়া জননীর পদধূলি শিরে লইয়া গৌরসুন্দর প্রস্থান করিয়াছিলেন।

গৃহ হইতে বাহির হইয়া নিমাই হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে একাকী কাটোয়া অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি শিষ্যগণ তৎশ্রবণে ব্যাকুল হইয়া প্রভুর অনুসরণ করিলেন। পথিমধ্যে ইঁহাদের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হইল। তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়। পশ্চিমাকাশে অস্তগমনোন্মুখ রবির ক্ষীণ স্বর্ণরেখা অস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। বিহঙ্গমকুল দিবাবসান বুঝিয়া পক্ষ মেলিয়া আপনাপন নীড়াভিমুখে গমন করিতেছে। দিবসের কর্ম্ম-কোলাহলের পর ধরণী ধূসরবর্ণের বসনে আবৃত হইয়া ক্রমশঃ সৌম্য ও শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। দিবস ও রজনীর এমনই শুভ সন্ধিক্ষণে মহাপ্রভু কাটোয়ায় কেশব ভারতীর আশ্রমে গমন করিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া পরদিন তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইবেন বলিয়া অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। কেশব ভারতী বলিলেন, "ভগবানে তোমার যেরূপ অচলা ভক্তি সেরূপ ভক্তি সাধারণ মানবে সম্ভবে না। আমি তোমার ন্যায় ভক্তপ্রবরের দীক্ষাদানের যোগ্য পাত্র না হইলেও ধর্ম্মরাজ্যে যখন একজনকে গুরুপদে বরণ কর্ত্তব্য, তখন আমি অবশ্যই তোমাকে দীক্ষা দান করিব।" পরদিন নিমাই দীক্ষা গ্রহণ করিবেন স্থির হইল।

সে সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র দলে দলে লোক তাহা দেখিবার জন্য কেশব ভারতীর আশ্রমে সমবেত হইল। তখন—

"প্রভুর আজ্ঞায় চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
করিতে লাগিল সর্ব্ব বিধিযোগ্য কার্য্য॥
নানা গ্রাম হইতে সে নানা উপায়ন।
আসিতে লাগিল অতি অকথ্য কথন॥
তবে মহাপ্রভু জগতের প্রাণ।
বসিলা করিতে শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান॥
নাপিত বসিলা আসি সম্মুখে যখনে।
ক্রন্দনের কলরব উঠিল তখনে॥
ক্ষুর দিতে সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে।
দুখে নাহি দেয় নাপিত ক্রন্দনমাত্র করে॥
কথং কথমপি সর্ব্বদিন অবশেষে।
ক্ষৌরকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল প্রেমরসে॥"

—শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত।

অতঃপর কেশব ভারতী প্রভুবক্ষে হস্ত দিয়া বলিলেন, "যে হেতু কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়া তুমি সকলকে চৈতন্য দান করিয়াছ, সেই হেতু তোমার নাম "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" রাখিলাম।"

যেদিন শ্রীচৈতন্য দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, সে দিন সারারাত ভক্তগণ সুমধুর হরিনামে কাটোয়া গ্রামখানি মুখরিত করিয়া তুলিল। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিক বসন ও দণ্ড কমণ্ডলু ভক্তের প্রাণে এক নব ভক্তিভাবের বীজ বপন করিল। তিনি কোন এক নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া হরিনাম জপ করিতে মানস করিলেন। তিনি অন্যান্য

কতিপয় স্থান দর্শন করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আগমন করিলেন। এদিকে তাঁহার আদেশে চন্দ্রশেখর ইতিপূর্ব্বে নবদ্বীপে পৌঁছিয়া গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণের বার্ত্তা মাতা শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে শুনাইয়াছিলেন। তাঁহারা শুনিয়া একেবারে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। নিত্যানন্দ, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তেরা গৌরের অদর্শন-জ্বালা আর সহ্য করিতে না পারিয়া শান্তিপুরে আগমন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে জননী শচীদেবীও আসিলেন। মাতা-পুত্রে পুনরায় সাক্ষাৎকার হইল। গৌরাঙ্গ জননীকে নানা প্রকারে প্রবোধ ও সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "মা তুমি আমার জন্য কাতর হইও না, আমি এখন নীলাচলে যাইব বটে তথা হইতেও তুমি মধ্যে মধ্যে আমার সংবাদ পাইবে।" ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া প্রভু বলিলেন—

"চিত্তে কেহো কোন কিছু না ভাবিহ ব্যথা।
তোমা সবা আমি নাহি ছাড়িব সর্ব্বথা॥
কৃষ্ণনাম লহ সবে বসি গিয়া ঘরে।
আমিই আসিব দিন কথোক ভিতরে॥"

এইরূপ প্রবোধ দিয়া ভক্তগণকে আলিঙ্গন করিয়া গৌরাঙ্গদেব নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দ, গদাধর মুকুন্দ, গোবিন্দ, সংহতি, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ-প্রমুখ কতিপয় শিষ্য তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন। পথে যাইতে যাইতে প্রভু শিষ্যবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের কাহার নিকট কি আছে বল।" তাঁহারা বলিলেন, "তোমার বিনানুমতিতে আমরা কি কোন দ্রব্য আনিতে পারি? কার দ্রব্য আমরা আনিব?" প্রভু এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "তোমরা যে কোন দ্রব্য আন নাই, ইহা শুনিয়া আমি পরম পরিতুষ্ট হইলাম।"

"ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যে দিনে লিখন।
অরণ্যেও আসি মিলে অবশ্য তখন॥
প্রভু যারে যেদিন বা না লিখে তাঁহার।
রাজপুত্র হই তভো উপবাস তার॥"

—শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত।

ভক্তগণকে এই ভাবের উপদেশ দিতে দিতে মহাপ্রভু সদলবলে "আটিসারা" নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই নগরে অনন্ত নামে এক পরম সাধু বাস করিতেন, প্রভু রাত্রিকালে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে পাইয়া অনন্তের বাহ্যজ্ঞান একরূপ লোপ পাইল, সারারাত্রি তাঁহার বাড়িতে কেবল সুমধুর কৃষ্ণনাম চলিতে লাগিল। প্রভাতে মহাপ্রভু শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ছত্রভোগে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই ছত্রভোগকে সকলে অম্বুলিঙ্গ ঘাট বলিত। এখানে গঙ্গা শতমুখী হইয়া প্রধাবিতা। গঙ্গার এই অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া প্রভু বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কেবল হরিনাম করিতে লাগিলেন। সেই স্থানের ভূস্বামী রামচন্দ্র খাঁ শিবিকারোহণে তখন সেই পথ দিয়া যাইতে ছিলেন। প্রভুর এইরূপ ভাবাবেশ দেখিয়া তিনি শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন। সংজ্ঞালাভ করিয়া প্রভু রামচন্দ্রকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রামচন্দ্র অতি বিনীতভাবে বলিলেন,"আমি এই দক্ষিণ রাজ্যের সামান্য ভূম্যধিকারী।" প্রভু তাঁহাকে নীলাচলে যাইবার পথ দেখাইয়া দিবার জন্য বলিলেন। রামচন্দ্র খাঁয়ের বিশেষ অনুরোধে ভক্তগণ অতঃপর আহারাদি সমাপন করিলেন। নীলাচলে লইয়া যাইবার জন্য রামচন্দ্র নৌকার ব্যবস্থাদি করিয়া দিলেন। হরিধ্বনি করিতে করিতে প্রভু শিষ্যগণ সহ নৌকায় আরোহণ করিলেন। নৌকার মাঝি ও দাঁড়ীরা মহাপ্রভুকে কত

বলিল, "আপনারা কীর্ত্তন বন্ধ করুন, এখানে জলে যেমন বৃহদাকার কুম্ভীরসকল বিচরণ করে, স্থলে তেমনি ভীষণাকার শার্দ্দুল। তদুপরি জলদস্যুর উপদ্রব এত অধিক যে,জীবন লইয়া কাহারও নিরাপদে যাইবার উপায় নাই।" মাঝিদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া মহাপ্রভু হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়া প্রাণ খুলিয়া হরিনাম করিতে করিতে জলেশ্বর, যাজপুর প্রভৃতি স্থান হইয়া কমলপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। কমলপুর হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের অম্বরচুম্বী মন্দিরের ধ্বজা দৃষ্টিপথে পতিত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ এই ধ্বজাদর্শনে অতিমাত্র পুলকিত হইলেন। যে বিগ্রহ দর্শন করিবার জন্য তিনি সুদূর বঙ্গদেশ হইতে কত পথ, ঘাট, অরণ্য অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়াছেন, অদূরে ঐ সেই জগন্নাথের ধ্বজা। তাঁহার সমগ্র শরীর আনন্দের আবেগে শিহরিত হইয়া উঠিল। কখনও দাঁড়াইয়া, কখনও বা সাষ্টাঙ্গে ভূমি-সাৎ হইয়া তিনি জগন্নাথদেবের উদ্দেশে প্রণাম করিতে করিতে বলি-লেন। চারিদিকে উড়িয়া অধিবাসিগণ বিস্ময়-পুলকিত-নেত্রে এই নবীন সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব ভক্তিভাব দর্শন করিতে লাগিল। শ্রীগৌরাঙ্গ আর কতক্ষণ ধৈর্য্য অবলম্বন করিবেন? তাঁহার প্রাণ যে আর ধৈর্য্য মানে না। তিনি বিদ্যুতের মত ছুটিয়া হরি হরি বলিতে বলিতে একেবারে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বেদীর উপর জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার দারুময় মূর্ত্তি। তাহা দেখিয়া তিনি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। মূর্ত্তিত্রয়কে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য তিনি ছুটিয়া চলিলেন। পাণ্ডারা আসিয়া অমনি তাঁহাকে ধরিল। কোন কোন পাণ্ডা তাঁহাকে মারিতে পর্য্যন্ত উদ্যত হইল। সেই সময় পুরীরাজের সভা-পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আসিয়া পাণ্ডাগণের হাত চাপিয়া ধরিলেন।

"সার্ব্বভৌম বোলে ভাই পড়িহারিগণ !
সভে তুলি লহ এই পুরুষ রতন ॥"

অতঃপর সার্ব্বভৌমের কথায় পাণ্ডারা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া সার্ব্বভৌমের বাটীতে লইয়া আসিলেন। নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ-প্রমুখ ভক্তগণও কিছুক্ষণ পরে আসিয়া সার্ব্বভৌমের বাটীতে মিলিত হইলেন। সার্ব্বভৌম এই ভক্ত অতিথিগণের যথাযোগ্য সমাদর ও আতিথেয়তা করিয়া নিজেকে পরম ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিলেন।

সার্ব্বভৌম নীলাচলে বৈদান্তিক পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার নিকট বহু ছাত্র বেদান্ত অধ্যয়ন করিত। পরদিন প্রাতঃকালে সার্ব্বভৌম গৌরচন্দ্রকে সম্মুখে বসাইয়া সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন দেখ,

"প্রণমেদ্দণ্ড বত্তুমাবাশ্চ চাণ্ডাল গোখরম্।
প্রবিষ্টো জীবকলয়া তত্রৈব ভগবানিতি ॥

অর্থাৎ ভগবান জীবরূপ অংশে সকল দেহেই প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া কুক্কুর, চণ্ডাল, গো এবং গর্দ্দভ পর্য্যন্ত সকলকেই ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥

স্বর্গাদি কর্ম্মফলে কামনা না করিয়া যিনি শাস্ত্রবিহিত অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং তিনিই যথার্থ যোগী—অগ্নিহোত্র প্রকৃত কর্ম্মপরিত্যাগী—যতিবেশধারী সন্ন্যাসী নহেন, আর শরীর-কর্ম্মপরিত্যাগীও সন্ন্যাসী নহেন।

"নিষ্কাম হইয়া করে যে কৃষ্ণ ভজন।
তাহারে সে বলি যোগী সন্ন্যাসী লক্ষণ॥
বিষ্ণুক্রিয়া না করিয়া পরান্ন খাইলে।
কিছু নহে; সাক্ষাতে এই বেদে বোলে॥"

—শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত।

তৎকর্ম্ম পরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।
হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ॥

যাহা শ্রীহরির সন্তোষ সম্পাদন করে তাহাই কর্ম্ম, যাহা দ্বারা শ্রীহরিতে মতি হয় তাহাই বিদ্যা। কেননা শ্রীহরি দেহধারীমাত্রেরই আত্মা ও ঈশ্বর, যেহেতু, তিনি স্বয়ং বা স্বতন্ত্ররূপে সকলেরই কারণস্বরূপ।

"তাহারে সে বলি ধর্ম্ম-কর্ম্ম সদাচার।
ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সভার॥
তাহারে সে বলি বিদ্যা মন্ত্র অধ্যয়ন।
কৃষ্ণ-পাদপদ্মেতে করায় স্থির মন॥
সভার জীবন কৃষ্ণ, জনক সভার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে, সর্ব্ব ব্যর্থ তার।

শঙ্করেরও মত ইহাই। শঙ্করাচার্য্য ষট্পদী স্তোত্রে বলিয়াছেন—

"সত্যপি ভেদাপগমে—
নাথ! তবাহং ন মামকীনস্তম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গ
ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গ॥

অর্থাৎ জগতে ও তোমাতে ভেদ না থাকিলেও নাথ! আমি জানি, আমি তোমারই অধীন—আমি তোমা হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

কিন্তু তুমি আমার অধীন নহ—তুমি আমার নিকট হইতে সঞ্জাত হও নাই। তরঙ্গ ও তরঙ্গময় সমুদ্রে পরস্পর পার্থক্য না থাকিলেও ইহা সুনিশ্চিত যে, তরঙ্গই সমুদ্রের, কিন্তু সমুদ্র তরঙ্গের নহে।

এই সমস্ত কথা বলিয়া সার্ব্বভৌম গৌরচন্দ্রকে বলিলেন, "লোকে শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায় না বুঝিয়া ভক্তিপথ ছাড়িয়া অনর্থক মাথা মুড়াইয়া কষ্ট পায়। এখন তোমার পরিপূর্ণ যৌবন, এখন কি তোমার সন্ন্যাসে অধিকার হইয়াছে? তুমি যে ভক্তিতত্ত্ব লাভ করিয়াছ, সেই তোমার পরমার্থ, তবে আবার এই সন্ন্যাসী বেশে প্রয়োজন কি?"

সার্ব্বভৌমের এই কথা শুনিয়া প্রভু কহিলেন, "আমি সন্ন্যাসী নহি, কেবল কৃষ্ণের বিরহে মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি।" সার্ব্বভৌম বলিলেন, "দেখুন আপনার নিকট আমি ভাগবতের একটু ব্যাখ্যা শুনিতে চাই" আচ্ছা—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

অর্থাৎ যাঁহারা বিধি-নিষেধের অতীত বা যাঁহাদের অহঙ্কার-গ্রন্থি ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে সেই আত্মারাম মুনিগণও অমিতপরাক্রম ভগবানের ফলকামনাশূন্য ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কেন না, শ্রীহরির গুণই এইরূপ।

সার্ব্বভৌম শ্রীগৌরাঙ্গকেই এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিবার ভার দিলেন। গৌরচন্দ্র বলিলেন, "না আপনিই ইহার ব্যাখ্যা করুন।" তখন সার্ব্বভৌম শ্লোকটির ত্রয়োদশ প্রকার ব্যাখা করিলেন। তখন গৌরাঙ্গ শ্লোকটির অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন, সে ব্যাখ্যা এত মৌলিক যে, তাহাতে সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যার ছায়ামাত্র ছিল না। শ্রীগৌরচন্দ্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া সার্ব্বভৌমের মনে প্রভুর অবতারত্বের সম্বন্ধে আর কোন

সন্দেহ থাকিল না। তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্ম ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন। কয়েক দিন সার্ব্বভৌমের ঘরে বাস করিবার পর মহাপ্রভু সমুদ্রের উপকূলে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সম্মুখে নীল বারিধি, তাহাতে উর্ম্মির উপর উর্ম্মিমালা। মহাপ্রভুর মন-প্রাণ কি এই অনন্তের পথ-যাত্রী অনন্ত সমুদ্রদর্শনে স্থির থাকিতে পারে? তিনি দিনরাত ভক্তগণসহ কেবল নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরম ভক্ত গদাধর সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট থাকেন। সার্ব্বভৌম ইতিপূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যের বিচারে পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে নীলাচলের বহু লোক তাঁহার প্রদর্শিত ভক্তিমার্গের অনুযায়ী হইয়াছিল। কিছুদিন নীলাচলে অবস্থান করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দক্ষিণদিকাভিমুখে রওনা হইলেন।

সমুদ্রের বেলাভূমি দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ নামকীর্ত্তন করিতে করিতে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে আলালনাথে উপস্থিত হইলেন। পথিপার্শ্বস্থ সকলে এই নবীন সন্ন্যাসীর অপরূপ রূপ-দর্শনে বিমোহিত হইল। আলালনাথ হইতে তাঁহার অপরাপর শিষ্যগণ পুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, একজনকে মাত্র সঙ্গে লইয়া ভগবানাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ দক্ষিণ দেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর তিনি গোদাবরীতীরে উপস্থিত হইলেন। এইখানে ধনী ও ঐশ্বর্য্যশালী রামানন্দ রায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। রামানন্দের কথা সার্ব্বভৌম ইতিপূর্ব্বেই তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যকে দেখিয়া রায় রামানন্দ দোলা হইতে অবতরণ করিলেন। উভয়ে উভয়ের সাক্ষাৎ হইবামাত্র যেন কতকালের পরিচয়—এইভাবে উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন। রামানন্দের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন

এবং তাঁহার নিকট অনেক তত্ত্বকথা শুনিলেন। সে সমস্ত কথা রামানন্দের জীবনী আলোচনার সময় সবিস্তারে বলা যাইবে। অতঃপর গৌরচন্দ্র "সিদ্ধবট" নামক স্থানে গিয়া একজন রামভক্ত ব্রাহ্মণের আতিথ্য গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ গৌরচন্দ্রের অকাট্য ভক্তিভাব সন্দর্শনে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরম শ্রীকৃষ্ণ-অনুরাগী হইয়া উঠিলেন। তথা হইতে শ্রীচৈতন্য ত্রিমন্দিরে গমন করিলেন। তথায় রামগিরি নামক এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অনেক শিষ্যাদি লইয়া বাস করিতেছিলেন। গৌরাঙ্গের নিকট রামগিরি বিচারে পরাস্ত হইলেন এবং তিনি কৃষ্ণভক্ত হইয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রামগিরির শিষ্যেরাও মহাকৃষ্ণভক্ত হইয়া উঠিল। অতঃপর তথা হইতে নিমাই শ্রীরঙ্গধামে গমন করেন। তথায় বেঙ্কট ভট্ট নামক এক ব্রাহ্মণের গৃহে তিনি চারিমাস অবস্থান করিয়াছিলেন। বেঙ্কট ভট্টের পুত্র গোপাল ভট্ট পিতৃবিয়োগের পর শ্রীকৃষ্ণভজনে দিবানিশি অতিবাহিত করিতেন। অতঃপর নিমাই বহু বারবনিতা-অধ্যুষিত জিজুরী গ্রামে গমন করিয়া তাহাদিগকে পাপজনক ব্যবসায় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন। চোরানান্দিবনে অনেক দস্যুকে তিনি ভক্তিপথের পথিক করেন। এইভাবে বহু অসাধুকে সাধু, নাস্তিককে আস্তিক, অধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেব পুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবা মাত্র রাজা প্রতাপ রুদ্র তাঁহাকে দেখিবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইলেন। চৈতন্যদেব রাজদর্শনে আপত্তি জানাইলেন। কিন্তু তাহাতে ভক্ত যে সে কি চুপ করিয়া থাকিতে পারে? রাজা প্রতাপ রুদ্র ছদ্মবেশে ভাগবতের শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে একেবারে চৈতন্যদেবের পাদপদ্মে আসিয়া ভূম্যবলুণ্ঠিত কদলীবৃক্ষের ন্যায় পতিত হইলেন। এবার আর মহাপ্রভু স্থির

থাকিতে পারিলেন না। ভক্তের হাত ধরিয়া তুলিয়া তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তদবধি রাজা প্রতাপ রুদ্র মহাপ্রভুর দাসানুদাস-ভাবে দিনাতিপাত করিয়াছিলেন।

প্রতিবৎসর আষাঢ় মাসে গৌড়দেশ হইতে মহাপ্রভুর বহুশিষ্য পুরুষোত্তমে আগমন করিতেন। তাঁহারা তিন চারি মাস যাবৎ মহাপ্রভুর নিকট অবস্থান করিয়া, হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া জগন্নাথের বিরাট মন্দির মুখরিত করিয়া তুলিতেন। সে সঙ্গীতের মনোপ্রাণহারী ঝঙ্কার শুনিয়া কাহার সাধ্য যে চুপ করিয়া থাকে? উৎকলবাসিগনও সেই কীর্ত্তনানন্দে মাতিয়া মধুর হরিগুণ গান করিত। এইভাবে আরও কিছুকাল পুরুষোত্তমে কাটাইবার পর শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। এবার বলভদ্র নামক এক ব্রাহ্মণকে তিনি সঙ্গী করিলেন। বৃন্দাবন যাইবার পথে নিমাই কাশীধামে কয়েক দিনের জন্য অবস্থিতি করেন। তথায় প্রকাশানন্দ নামক এক দেশপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক তাঁহার সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেন। গৌড়ের অধিপতি সুবুদ্ধি রায় এই সময় সন্তাপিতচিত্তে কাশীধামে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি গৌড়দেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকা কালে কোন কারণে ব্রাহ্মণগণের অসন্তোষের ভাজন হন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বিষপান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন। কিন্তু সুবুদ্ধি রায় ব্রাহ্মণগণের এইরূপ নৃশংস-বিধানে সম্মত না হইয়া মুক্তিক্ষেত্র বারাণসীধামে গমন করেন। শ্রীচৈতন্যের নিকট সজলনয়নে আপন কাহিনী বর্ণন করিতেই মহাপ্রভু বলিলেন, "সর্ব্বদা হরিনাম কর, তাহা হইলেই সকল পাপ ক্ষয় হইবে।" সুবুদ্ধি রায় তদবধি অবশিষ্ট জীবন হরিনামেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

বারাণসীধাম হইতে শ্রীচৈতন্য অবশেষে বৃন্দাবনে গমন করিলেন।

একে ত বৃন্দাবন সর্ব্বদা কৃষ্ণকথায় মুখরিত, তদুপরি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তনে উহা আরও মুখরিত হইয়া উঠিল। ব্রজবাসিগণ তাঁহাকেই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া পূজা করিতে লাগিল।

কিছুদিন বৃন্দাবনে বাস করিবার পর মহাপ্রভু আবার নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর ছয় বৎসর কাল তিনি পুরুষোত্তম, দক্ষিণাঞ্চল, কাশী, বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করিলেন; এখন হইতে তিনি পুরুষোত্তমেই অবস্থান করিতে স্থির সংকল্প করিলেন। পুরুষোত্তমকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার ভক্তি-মন্দাকিনী সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হইতে লাগিল। রাজা প্রতাপ রুদ্র হইতে অনেক ধনী দরিদ্র তাঁহার নিকট নিয়ত বসিয়া ধর্ম্মালাপ শ্রবণ করিতেন। এ সময়ে শ্রীচৈতন্যের আর লোকালয়ে বাস করিয়া কীর্ত্তনাদি করিতে ভাল লাগিত না। তিনি তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য গদাধরকে উদ্যান মধ্যে গোপীনাথের একটি মন্দির প্রস্তুত করিতে বলেন। গুরুর আদেশে গদাধর তাহাই করেন। কথিত আছে, ১৪৫৫ শকের মাঘমাসে পূর্ণিমা তিথির দিন মহাপ্রভু গোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করেন, আর বাহির হন না। বৈষ্ণব সাধকেরা মনে করেন, মহাপ্রভু আপন দেহকে গোপীনাথের দেহের সহিত মিলাইয়া দিয়াছিলেন। ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মহাপ্রভু নরলীলা সংবরণ করেন।

নিত্যানন্দ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে নিত্যানন্দের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এখনও পল্লীর উষা ও সান্ধ্য কীর্ত্তনে ভক্ত বৈষ্ণবগণ করতালি ধ্বনি করিয়া গাহিতে থাকে,

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
হরে কৃষ্ণ হরি নাম॥"

এই নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী একচাকা গ্রামে হাড়াই ওঝা নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। হাড়াই ওঝাকে সাধারণতঃ লোকে হাড়াই পণ্ডিত বলিত। নিত্যানন্দের মাতা পদ্মাবতী পরম বৈষ্ণবী ছিলেন। গ্রামের নিকট মৌড়েশ্বর নামে এক দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, হাড়াই দম্পতী প্রতিদিন সেই মন্দিরে যাইয়া মৌড়েশ্বরের পূজার্চ্চনা করিতেন। হাড়াই পণ্ডিত পুরুষানুক্রমে উক্ত দেব বিগ্রহের পৌরহিত্য করিতেন। এই পৌরহিত্য করিয়া তাঁহার যাহা প্রাপ্য হইত তাহাতেই তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের ব্যয়ভার অতি স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। পদ্মাবতীর উপর্য্যুপরি কয়েকটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তার পর মৌড়েশ্বরের কৃপায় ১৩৯৫ শকের মাঘ মাসে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ হাড়াই পরিবারের বিষণ্ণ মুখ প্রফুল্ল করেন। শিশু সর্ব্বদাই কেবল আনন্দ করিত, তদ্দর্শনে পাড়ার সকলে তাহার নাম রাখিল নিত্যানন্দ। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নিত্যানন্দের হাতে খড়ি দেওয়া হইল। নিত্যানন্দ শিশুগণের সহিত কখন বা রামলীলা আবার কখনও বা কৃষ্ণলীলা করেন। এইভাবে কৃষ্ণভক্তির ভিতর দিয়া নিত্যানন্দের শৈশব, বাল্য ও কৈশোর জীবন গড়িয়া উঠিল

এখন নিত্যানন্দ সংসার ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। পিতা হাড়াই পণ্ডিত পুত্রের সংসার-বৈরাগ্য দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন। আর তিনি পুত্রকে চক্ষের অগোচরে রাখেন না। তাঁহার বৈষয়িক কর্ম্ম, যজমানী কর্ম্ম সমস্তই বন্ধ হইল—পুত্রকে তিনি মুহুর্মুহু আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ একদিন এক সন্ন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে আগমন করিলেন। হাড়াই পণ্ডিত সন্ন্যাসীকে মহা সমাদর করিয়া আতিথ্য সৎকার করিলেন। সমস্ত রাত্রি হাড়াই পণ্ডিত তাঁহার সহিত সুমধুর কৃষ্ণকথা বলিতে লাগিলেন। উষাকালে সন্ন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের নিকট একটি ভিক্ষা চাহিলেন। হাড়াই পণ্ডিত সন্ন্যাসীর মনস্কামনা পূর্ণ করিতে সম্মত হইলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিব, আমার সহিত কোন সুব্রাহ্মণ নাই, তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে আমায় দেও।" হাড়াই পণ্ডিত যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই হইল। এত যত্নে রক্ষা করিয়াও পুত্রকে তিনি সংসারে রাখিতে পারিলেন না। গৃহিণীর নিকট গিয়া সন্ন্যাসীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। গৃহিণী বলিলেন, "তুমি স্বামী, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হউক।" নিত্যানন্দ সেই সন্ন্যাসীর সহিত চলিয়া গেলেন, হাড়াই পণ্ডিত মাটীতে পড়িয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

এদিকে নিত্যানন্দ বৈদ্যনাথ, গয়া প্রভৃতি নানা তীর্থস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে কাশীতে উপনীত হইলেন। তথায় গঙ্গায় অবগাহন করিয়া নিত্যানন্দ ক্রমে প্রয়াগ, মথুরা হইয়া বৃন্দাবন, তথা হইতে প্রভাস, নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা, হরিদ্বার, তাম্রপর্ণী, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া মহামুনি ব্যাসের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

"এইমত অভয় পরমানন্দ রায়।
ভ্রমে নিত্যানন্দ ভয় নাহিক কাহায়॥
নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ।
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, কে বুঝে সে রস॥"

এইভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত নিত্যানন্দের সাক্ষাৎকার হইল। পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দুইজনে কিছুকাল একত্র অতিবাহিত করিয়া অবশেষে দুইজনেই সেতুবন্ধে উপস্থিত হইলেন।

"মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দে ছাড়িতে না পারে।
নিরবধি নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে॥
মাধবেন্দ্র বলে প্রেম না দেখিলুঁ কোথা।
সেই মোর সর্ব্বতীর্থ হেন প্রেম যথা॥
জানিলুঁ কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি॥"

উভয়ে নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইলেন। দূর হইতে জগন্নাথের ধ্বজা দেখিয়াই নিত্যানন্দ ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তথা হইতে নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণারাধনা করিতে লাগিলেন। এদিকে নবদ্বীপে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিকাশ হইল, নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রতীক্ষাই করিতেছিলেন। মহাপ্রভু নবদ্বীপে নরদেহ পরিগ্রহ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, শুনিতে পাইয়া নিত্যানন্দ বৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপে গেলেন। এখানে শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকার হইল। শ্রীবাস তাঁহাকে মহাপ্রভুর নিকট লইয়া যাইতেই

মহাপ্রভু শ্রীবাসকে ভাগবতের একটী শ্লোক পাঠ করিতে বলিলেন। শ্রীবাস পড়িলেন—

"বর্হাপীড়ম্ নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারম্।
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশম্ বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্॥
রন্ধ্রান বেণোরধর সুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
বৃন্দারণ্যম্ স্বপদরমণম্ প্রাবিশদ্ গীতকীর্ত্তিঃ॥"

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০ স্কন্ধ।

শ্রীবাসের মুখে এই ভাগবতীয় শ্লোক শুনিবামাত্র নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভুকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—

"সকল জগৎ চাহি ফিরিয়া আইনু।
কোথাও তোমার লাগ মুই না পাইনু॥
শুনিলাম গৌর দেশে নবদ্বীপ পুরে।
লুকাঞা রয়েছে আসি নন্দের কুমারে॥
চোর ধরিবারে মুই আইলাম হেথা।
ধরিলাম চোর আজি পলাইবে কোথা॥"

নিত্যানন্দ এই কথা বলিয়া কখনও হাসিতে, কখনও কাঁদিতে, কখনও বা নাচিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দের ভাবাবেশ দেখিয়া মহাপ্রভুও হাসিতে, নাচিতে লাগিলেন।

"পড়িলেন প্রভুপদে নিত্যানন্দ রায়।
দুঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে চায়॥"

শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে নিত্যানন্দের থাকিবার বন্দোবস্ত হইল। শ্রীবাস ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী মালিনী দেবী তাঁহাকে নিজের পুত্রের

ন্যায় স্নেহ করিতেন। কখনও কখনও মালিনী দেবী নিত্যানন্দকে আপন হাতে খাওয়াইয়া দিতেন। শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের বাটীতেও নিত্যানন্দ যাইতেন। নিমাই-জননী শচীমাতা তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ মনে করিয়া আদর-যত্ন করিতেন। একদিন প্রভু নিত্যানন্দকে আপন বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। মাতা শচীদেবী পরমযত্নসহকারে রন্ধনাদি করিয়া গৌর-নিতাইয়ের জন্য পাশাপাশি দুইখানি আসন পাতিয়া ভোগ পরিবেশন করিলেন। মাতা শচীদেবী পরিবেশন করেন আর দেখেন যেন কৃষ্ণ-শুক্লবর্ণ দুই মনোহর শিশু বসিয়া আহার করিতেছেন। তখন—

"পড়িলা মূৰ্চ্ছিতা হৈয়া পৃথিবীর তলে।
তিতিল বসন সব নয়নের জলে॥
অন্নময় সব ঘর হইল তখনে।
অপূৰ্ব্ব দেখিয়া শচী বাহ্য নাহি জানে।"

মহাপ্রভু মাতাকে স্বহস্তে তুলিয়া ধরিলেন। মাতা শচীদেবী বলিলেন, "আজি হৈতে তোমরা দুইজন আমার পুত্র।" পুত্রভাবে শচীদেবী নিত্যানন্দকে কোলে লইলেন, নিত্যানন্দও মাতৃভাবে শচী-দেবীকে প্রণাম করিলেন।

পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীবাসের গৃহে নিত্যানন্দ বাস করিতেন। শ্রীবাসকে তিনি বাপ বলিয়া ডাকিতেন। অহর্নিশ তাঁহার বাল্যভাব ছিল, তিনি শ্রীবাস-পত্নী মালিনীর স্তন্য পান করিতেন। একদিন একটি বায়স শ্রীকৃষ্ণ-পূজার ঘৃতের বাটী লইয়া উড়িয়া গেল। মালিনী একেবারে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। এমন সময় নিত্যানন্দ আসিয়া বলিলেন, "ভয় কি, আমি এখনই তোমার পাত্র আনিয়া দিতেছি।" এই

বলিয়া তিনি কাককে ডাক দিবা মাত্র কাক আসিয়া ঘৃতপাত্রটী দিয়া গেল। মালিনী নিত্যানন্দের প্রভাব দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও হর্ষোৎফুল্ল হইলেন। মাতা শচীদেবী কখনও মহাপ্রভুকে লক্ষ্মীর সঙ্গে বসাইয়া রাখেন, সেই যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার পরম আনন্দ হয়। নিত্যানন্দ কিন্তু বাহ্যজ্ঞানহীন, অন্ততঃ লক্ষ্মীর কথা একেবারে মনে না আনিয়াই তিনি উলঙ্গ অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হন। প্রভু তাহা দেখিয়া তাঁহাকে কাপড় পরিতে বলেন। কখনও বা প্রভু স্বহস্তে তাঁহাকে কাপড় পরাইয়া দেন।

এইভাবে নিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে নানা অলৌকিক লীলার অভিনয় করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু একদিন নিত্যানন্দ, হরিদাস প্রভৃতি ভক্তবৃন্দকে আদেশ করিলেন যে, তোমরা নবদ্বীপের ঘরে ঘরে গিয়া কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন কর।

"শুন শুন নিত্যানন্দ! শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কর শিক্ষা॥
ইহা বহি আর না বলাবে, না বলিবা।
দিন-অবসানে আসি আমারে কহিবা॥"

মহাপ্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া নিত্যানন্দ, হরিদাস প্রভৃতি নবদ্বীপের ঘরে ঘরে গিয়া কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

"আজ্ঞা পাই দুই জনে বুলে ঘরে ঘরে।
বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই, হই একমন॥"

তাঁহাদের দু'জনের সঙ্গীতোন্মাদে নদীয়া নগরী ভরপূর হইল। তাঁহাদের দুইজনেরই সন্ন্যাসি-বেশ, কেহ তাঁহাদের ভিক্ষা দিতে আসিলে তাঁহারা বলেন, "অন্য ভিক্ষা চাই না, শুধু কৃষ্ণনাম বল।" যাঁহারা সৎলোক তাঁহারা ইঁহাদের কীর্ত্তনে বড় আনন্দ পান, আর যাহারা দুর্জ্জন তাহারা কেহ বা ইঁহাদিগকে উন্মাদগ্রস্ত, কেহ বা ক্ষিপ্ত বলিয়া উপহাস করে। আবার কেহ বা বলে, নিমাই পণ্ডিত সকল লোকগুলিকে নষ্ট করিল, এই দুইটা নিমাইয়ের চর ও আমাদিগকে নষ্ট করিতে আসিয়াছে। কেহ বলে, ব্যাটারা চোর, ইহাদিগকে মার, ইহারা চুরির মৎলবে এখানে আসিয়াছে। নিত্যানন্দ ও হরিদাস দুর্জ্জনদের কথা শুনেন, আর হাসেন। সারাদিন নদীয়ার দ্বারে দ্বারে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া সন্ধ্যাকালে নিমাই-সকাশে ফিরিয়া দুই ভক্তপ্রবর সারাদিনের কার্য্যের বিবরণ জানান। একদিন পথিমধ্যে জগাই মাধাই নামক দুই পাষণ্ডের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহারা দেবদ্বিজ মানে না, দস্যুবৃত্তি, তস্করতা তাহাদের নিত্যক্রিয়া আর তাহারা গোমাংস-ভক্ষণে মহাপটু। মদ খাইয়া তাহারা দুইজনে রাস্তায় পড়িয়া গড়াগড়ি যায় আর যাহাকেই সম্মুখে দেখিতে পায় তাহাকেই ধরিয়া কিল, ঘুসি ও চর মারিতে থাকে। নিত্যানন্দ ও হরিদাস একদিন দূর হইতে এই দুই পাষণ্ডের কাণ্ড দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন, এই দুই নরপশুকে উদ্ধার করিতে পারিলে প্রভুর আজ্ঞা সম্যক্ প্রতিপালিত এবং আমাদের শ্রম সার্থক হইল বলিয়া মনে করিব। এই ভাবিয়া তাঁহারা দুষ্টদ্বয়ের নিকট গেলেন, লোকে তাঁহাদিগকে নিকটে যাইতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু কৃষ্ণগতপ্রাণ নিত্যানন্দ হরিদাস তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। নিকটে যাইয়া নিত্যানন্দ গাহিলেন—

"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধনপ্রাণ॥
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার॥"

নিত্যানন্দের গান শুনিয়াই জগাই মাধাই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, শুধু দাঁড়ান নহে—নিত্যানন্দ ও হরিদাসপ্রভুকে ধরিবার জন্য তাহারা ধাবমান হইল। প্রভুদ্বয় আর কি করেন, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলিয়া দৌড়িতে লাগিলেন। লোকেরা দূর হইতে তাহা দেখিয়া বলিতে লাগিল, "কেমন, পূর্ব্বেই ত বলিয়াছিলাম, ও তুই যমদূতের নিকট ভণ্ডামি করিতে যাইও না, এখন কেমন? যেমন ভণ্ড, তার উপযুক্ত শাস্তি হোক।" শেষে কিছুদূর দৌড়িয়া পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে মাতাল-দ্বয় নিজেরাই নিজেদের মধ্যে মারামারি বাধাইয়া দিল, তদ্দর্শনে প্রভুদ্বয় হাসিতে হাসিতে নিশ্চিন্তমনে গৌরাঙ্গসকাশে যাইয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। মহাপ্রভুর সম্মুখে শ্রীনিবাস বসিয়াছিলেন, তিনি মহাপ্রভুকে পাষণ্ডদ্বয়ের পরিচয় দিলেন।—

"সে দুইয়ের নাম প্রভু, জগাই মাধাই।
সুব্রাহ্মণ পুত্র দুই, জন্ম এই ঠাঁই॥
সঙ্গদোষে সে দোঁহার হৈল হেন মতি।
আজন্ম মদিরা বহি আর নাহি গতি॥
সে দুয়ের ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে।
হেন নাহি, যার ঘরে চুরি নাহি করে॥"

মহাপ্রভু বলিলেন, "সেই পাষাণ্ডদ্বয় যে মুহূর্ত্তে নিত্যানন্দকে দর্শন করিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহারা উদ্ধার পাইয়াছে। একদিন নিত্যানন্দ

রাত্রিকালে জগাই-মাধাইয়ের নিকট দিয়া আসিতেছেন, মত্তপ জগাই-মাধাই জিজ্ঞাসা করিল, তুই কে ? নিত্যানন্দ বলিলেন, আমি অবধূত। অবধূত-নাম শুনিয়া মাধাই কুপিত হইয়া নিত্যানন্দের মাথায় একটি মুটকী তুলিয়া মারিল। মুটকী তাহার মাথায় ফুটিয়া অবিরলধারে রক্ত পড়িতে লগিল। মাধাই আবার তাঁহার মাথায় কলসীর কানা মারিতে উদ্যত হইল। নিত্যানন্দের মাথায় দর-বিগলিত রক্ত ধারা দেখিয়া জগাইয়ের প্রাণে দয়ার উদ্রেক হইয়াছে ; তিনি মাধাইয়ের হাত ধরিয়া তাঁহাকে একার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিলেন। এই সময় লোকজন গিয়া মহাপ্রভুকে সংবাদ দিল। মহাপ্রভু সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রভু আসিয়া নিত্যানন্দের অবস্থা দেখিয়া "চক্র" "চক্র" বলিয়া হুঙ্কার করিলেন। নিত্যানন্দ দেখিলেন, মহাবিপদ! আজ না জানি জগাই-মাধাইয়ের ভাগ্যে কি হয়! তিনি জগাই-মাধাইকে বাঁচাইবার জন্য বলিলেন—

"মাধাই মারিতে প্রভু! রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই॥
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু! এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর, তুমি হও স্থির॥"

জগাই নিত্যানন্দের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু জগাইকে আলিঙ্গন করিলেন। তদ্দর্শনে মাধাই কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "প্রভু যদি জগাইকে উদ্ধার করিলে, তবে আমাকে আর বাকী রাখ কেন? ও চরণে আমি কোন অপরাধ করিয়াছি?" প্রভু বলিলেন, "তুই নিত্যানন্দের অঙ্গে রক্তপাত করিয়াছিস্, আমি কোন মতে তোর পরিত্রাণ দেখিতেছি না।" মাধাই বলিল, "সে কি প্রভু! অসুরগণ তোমায়

বাণে বিদ্ধ করিয়াছিল, তুমি তাহাদিগকে চরণদানে শৈথিল্য কর নাই, তবে আজ মাধাইয়ের বেলা করিতেছ কেন?" তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন—

"আমা হৈতে এই নিত্যানন্দ দেহ বড়।
তোমা স্থানে এই সত্য করিলাম দড়।"

তখন মাধাই বলিল, "প্রভু যদি আমার সম্মুখে সমস্ত সত্য কথাই বলিলে, তাহা হইলে কি উপায়ে আমার মুক্তি হইবে আমাকে তাহাই বলিয়া দাও।" প্রভু বলিলেন, "তুমি নিত্যানন্দের চরণ ধরিয়া ক্ষমা চাও, তিনি ক্ষমা করিলেই তুমি মুক্তি পাইবে।" মাধাই তখন নিত্যানন্দের চরণে পতিত হইল, নিত্যানন্দ তাহাকে কোল দিলেন, উভয়ে উভয়কে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর জগাই-মাধাইকে সঙ্গে লইয়া প্রভু নিজের আলয়ে গেলেন, প্রভুর দুই পার্শ্বে নিত্যানন্দ ও গদাধর বসিয়া, সম্মুখে অদ্বৈত, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, হরিদাস, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর আচার্য্য প্রভৃতি উপবিষ্ট। ইঁহাদের মধ্যে পড়িয়া জগাই-মাধাই গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। মহাপ্রভু সমবেত ভক্ত-বৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আজি হইতে এই জগাই-মাধাই আর মদ্যপ নহে, ইহারা দুইজন আমার পরমভক্ত। ইহাদের যাহা কিছু অপরাধ সকলে তাহা ভুলিয়া গিয়া ইহাদিগকে আলিঙ্গন কর এবং আমার ভক্তমধ্যে ইহাদিগকে গণ্য কর।" ভক্তগণ সকলে জগাই মাধাইকে আলিঙ্গন করিলেন। মহাপ্রভু তাহাদের সঙ্গে হরিনাম কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। দস্যু জগাই-মাধাই মহাভক্তে পরিণত হইল।

এইভাবে মহাপ্রভুর সঙ্গে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া নিত্যা-নন্দপ্রভু নবদ্বীপে বসবাস করিতে লাগিলেন। একদিন মহাপ্রভু

ভক্তগণসহ বসিয়া আছেন, কথা-প্রসঙ্গে তিনি এমন একটি কথা বলিলেন, যাহাতে নিত্যানন্দ প্রভু ছাড়া আর কেহ বুঝিতে পারিল না যে, মহাপ্রভু শীঘ্রই সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিবেন। প্রভুর ইঙ্গিত শুনিয়া নিত্যানন্দের মুখ বিষাদে আচ্ছন্ন হইল। শ্রীগৌরাঙ্গের এমন সুন্দর কেশপাশ মুণ্ডিত হইবে—এ চিন্তা নিত্যানন্দের নিকট নিতান্তই দুর্ব্বিষহ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "দেখ আমি কালই সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষা লইব। সন্ন্যাসী হইয়া যদি আমি ঘরে ঘরে এই নাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াই, কেহই আমাকে মারিবে না, অথবা কিছু বলিবে না।" তাহা শুনিয়া নিত্যানন্দ বলিলেন—

"যেরূপ করাহ তুমি, সেই হই আমি।
এতেকে বিধান দেহ অবতার জানি॥
জগৎ উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে॥"

অতঃপর প্রভু বলিলেন, "দেখ ইন্দ্রাণি নিকটে কাটোয়া নামক গ্রাম আছে, তথায় কেশব ভারতী নামক সন্ন্যাসী আছেন, আমি উত্তরায়ণ দিবসে তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা লইব। আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখরাচার্য্য ও মুকুন্দকে মাত্র এই সংবাদ দিবে। নিত্যানন্দ সম্মত হইলেন।

অতঃপর গৌরচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে গমন করিলেন। বঙ্গদেশ হইতে প্রতিবৎসর শ্রীচৈতন্যের বহুসংখ্যক শিষ্য পুরীধামে যাইয়া মহাপ্রভুর সহিত অতিবাহিত করিতেন এবং মধুর হরিনামে সমগ্র জগন্নাথক্ষেত্র মুখরিত করিয়া তুলিতেন। নিত্যানন্দপ্রভুও সেই সঙ্গে

যাইতেন। মহাপ্রভুর সহিত নিত্যানন্দও নীলাচলে যাইতেছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহাকে পথিমধ্যে বলেন—

"প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
শ্রীবাসাদি যত আছে ভাগবতগণ।
সবার করহ গিয়া দুঃখ বিমোচন॥
এই কথা তুমি গিয়া কহিও সবারে।
আমি যাই নীলাচলচন্দ্র দেখিবারে॥"

মহাপ্রভুর অবর্ত্তমানে নবদ্বীপে যাঁহারা ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছিলেন নিত্যানন্দের আগমনে আবার তাঁহারা উৎফুল্ল হইলেন।

একবার রথযাত্রার সময় নিত্যানন্দ ভক্তগণসহ নীলাচলে যাইতেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নিত্যানন্দকে ডাকিয়া নিভৃতে অনেক কথাবার্ত্তা বলিলেন, বোধ হয় নিত্যানন্দকে দারপরিগ্রহ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের জন্যই বলিয়াছিলেন। তাহার পর হইতেই নিত্যানন্দ অম্বিকানগরে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের বসুধা ও জাহ্নবী নাম্নী দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা পরের কথা। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-চরিতামৃত-পাঠে জানা যায়, মহাপ্রভুর সহিত নিত্যানন্দপ্রভুও পুরীধামে আসিয়াছিলেন। মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করিয়া তাঁহাকে কোলে লইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, তাহার পর নিত্যানন্দপ্রভুও মন্দিরে গিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় নিত্যানন্দপ্রভুর পদধূলি গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দপ্রভু জগন্নাথকে দেখিয়া তাঁহাকে ধরিতে গিয়াছিলেন, পাণ্ডাগণ কেহই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তিনি এক লম্ফে জগন্নাথের সুবর্ণ-সিংহাসনে উঠিয়া

বলরামকে আলিঙ্গন করিয়া বসিলেন। পাণ্ডারা তাঁহাকে ধরিয়া নামাইলেন, বলরামের গলার মালা পরিয়া নিত্যানন্দ সার্ব্বভৌমের বাটীতে চলিয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া পাণ্ডারা মহা বিস্মিত হইল। মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইতেই মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বলিলেন—

"পরম সন্দেহ চিত্তে আছিলা আমার।
কিরূপে পাইব আমি সংহতি তোমার।
কৃষ্ণ তাহা পূর্ণ করিলেন অনায়াসে।"

* * * * *

এইরূপ নানা কথাবার্ত্তা বলিয়া মহাপ্রভু মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন। একদিন নিত্যানন্দকে নিভৃতে লইয়া গৌরাঙ্গদেব বলিলেন, "দেখ নিত্যানন্দ তুমি নবদ্বীপে যাইয়া এই প্রেমধর্ম্ম প্রচার কর। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, মূর্খ নীচ সকলকে প্রেমসুখে ভাসাইব, আমার সে প্রতিজ্ঞা আমি পালন করিতে পারি নাই, তোমাকে পালন করিতে হইবে, কিন্তু তুমি যদি সন্ন্যাসীর মত সংসারাশ্রমাদি পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে অবস্থিতি কর, তাহা হইলে গৌড়ের মূর্খ নীচ সকলকে কে আর প্রেমধর্ম্মে দীক্ষা দিবে?

"মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবারে মোচন॥"

প্রভুর আদেশ পাইয়া নিত্যানন্দ গৌড়দেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রামদাস, গদাধর দাস, রঘুনাথ বৈদ্য ওঝা, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণও নিত্যানন্দের সঙ্গে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথে আসিতে আসিতে তাঁহাদের

এক একজনের প্রাণে এক এক প্রকার ভাবের উপজয় হইল। কেহ বা রাধা ভাবে, কেহ বা যশোদা ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভাবনা করিতে করিতে আসিতে লাগিলেন, ফলে তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া সকলেই বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইলেন। পথিমধ্যে এইভাবে তাঁহারা কতবার যে প্রকৃত পথ রাখিয়া অন্য পথে গিয়া পড়িয়াছিলেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তার পর যে পথ আসিবেন দুইমাসে সেই পথ ছয়মাসে অতিক্রম করিয়া তাঁহারা গঙ্গাতীরে পাণিহাটি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাণিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের বাটী, তথায় সপারিষদ্ নিত্যানন্দ কিছুকাল অবস্থান করিলেন। এখানে দিনরাত সঙ্কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। কীর্ত্তনে সিদ্ধহস্ত মাধব ঘোষ আসিয়া নিত্যানন্দের সহিত যোগদান করিলেন। মাধব, গোবিন্দ ও বাসুদেব তিন ভাই মনের আনন্দে গান গাহিতে লাগিলেন, আর নিত্যানন্দ তাঁহাদের সহিত নাচিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাবোচ্ছাস-উদ্ভূত পদভরে পৃথিবী যেন কাঁপিতে লাগিল। নাচিয়া নাচিয়া গান শেষ হইলে নিত্যানন্দ খট্টার উপরে উপবেশন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিষেক করিবার জন্য ভক্তবৃন্দের প্রতি আদেশ করি-লেন। রাঘবপণ্ডিত-প্রমুখ পারিষদগণ তাঁহাকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। গঙ্গাজলে নিত্যানন্দকে স্নান করাইয়া নানা গন্ধে তাঁহার দেহ সুবাসিত করিয়া তাঁহাকে নূতন বসনে বিভূষিত করা হইল। দিব্য স্বর্ণখচিত খট্টার উপর প্রভুকে বসান হইল, রাঘবানন্দ তাঁহার শিরোদেশে ছত্র ধারণ করিলেন। কতক্ষণে নিত্যানন্দ রাঘবানন্দের প্রতি আজ্ঞা করিলেন, "দেখ আমি কদম্বপুষ্প বড় ভালবাসি, আমাকে কদম্বফুল আনিয়া দেও।" রাঘবানন্দ বলিলেন, "প্রভু এখন ত কদম্বের ফুল ফুটিবার সময় নহে।" তদুত্তরে নিত্যানন্দ বলিলেন, "একবার বাড়ীর ভিতর গিয়া ভাল করিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়াই দেখ, নিশ্চয়ই কদম্বের ফুল পাইবে।"

সত্যই রাঘবানন্দ বাড়ীর অভ্যন্তরে গিয়া দেখেন, স্তরে স্তরে কদম্বের ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। রাঘবানন্দ সেই ফুল চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া নিত্যানন্দের গলায় দিলেন।

এই ভাবে নিশিদিন কীর্ত্তনানন্দে মাতিয়া নিত্যানন্দপ্রভু তিন মাস কাল পাণিহাটি গ্রামে কাটাইলেন। অতঃপর মহাপ্রভু নিত্যানন্দের অলঙ্কার পরিতে বিশেষ ইচ্ছা হইল। ভক্তগণ নানাবিধ অলঙ্কার আনিয়া তাঁহাকে পরিতে দিলেন। দুই হস্তে তিনি সুবর্ণের বলয় ধারণ করিলেন, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, অঙ্গুরীতে অঙ্গুলীয়ক, পাদপদ্মে রজত-নূপুর, অঙ্গে শুক্ল, পট্ট, নীল, পীত প্রভৃতি নানাপ্রকার বসন পরিধান করিলেন। এইভাবে নানাবিধ অলঙ্কার পরিয়া প্রভু ভক্তগণের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

"জাহ্নবীর দুই কূলে যত আছে গ্রাম।
সর্ব্বত্র ভ্রমেন নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম॥"

তাঁহার সেই দিব্যমূর্ত্তি দর্শনে নিতান্ত পাষণ্ডও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়। কি ভোজনে, কি শয়নে, কি বা পর্য্যটনে কোন সময়ই সঙ্কীর্ত্তন ছাড়া কার্য্য যায় না।

"যেদিকে চাহেন নিত্যানন্দ প্রেমরসে।
সেই দিগে স্ত্রীপুরুষ কৃষ্ণসুখে ভাসে॥
হেন সে করেন কৃপাদৃষ্টি অতিশয়।
পরানন্দে দেহস্মৃতি কারো না থাকয়॥"

এইভাবে গান করিতে করিতে প্রভু নিত্যানন্দ গদাধরের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। গদাধর বাহ্যজ্ঞানহীন, নিরন্তর হরিনাম ভিন্ন

গদাধর আর কিছুই জানেন না। কিন্তু ঐ গ্রামের কাজী বড়ই অত্যাচারী, সে হরিনাম শুনিলেই পদাহত। ফণীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠে। গদাধর একদিন রাত্রিকালে কাজীর বাটীর অভ্যন্তরে উপস্থিত হইলেন। রাত্রিকালে গদাধরকে আপন আলয়ে দেখিয়া কাজী একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল এবং বলিল, "একি! গদাধর তুমি এত রাত্রে এখানে কেন?" গদাধর বলিলেন—

"শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু অবতরি।
জগতের মুখে জানাইল হরি হরি॥
সবে তুমি মাত্র নাহি বল হরি নাম।
তাহা বলাইতে আইলাম তোমা স্থান॥"

গদাধরের কথা শুনিয়া কাজী বলিলেন, "কাল হরি বলিব, আজ তুমি ঘরে যাও।" গদাধর বলিলেন, "আবার কালি কেন? এই ত এই মাত্র তুমি হরিনাম করিলে! আর তোমার কোন কালে কোন অমঙ্গল হইবে না, যেহেতু তুমি হরিনাম করিয়াছ।" গদাধরের বাসনা চরিতার্থ হইল, তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। যে কাজী হিংসা ভিন্ন জানিত না, আজ সেই কাজী নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় মহসাধুসজ্জনে পরিণত হইল।

এইভাবে কতদিন খড়দহে থাকিয়া নিত্যানন্দপ্রভু সপ্তগ্রামে আসিলেন। সপ্তগ্রাম "ত্রিবেণীঘাট" নামে পরিচিত, জাহ্নবী, যমুনা ও সরস্বতীর তথায় শুভ সম্মিলন হইয়াছে। ভক্তবৃন্দ-সমভিব্যাহারে প্রভু নিত্যানন্দ সেই ত্রিবেণীঘাটে স্নান করিলেন। ত্রিবেণীতে উদ্ধারণ দত্ত নামে এক মহা ভক্ত ছিলেন, তিনি সপারিষদ নিত্যানন্দের পরম সমাদর করিলেন। নিত্যানন্দের পাদস্পর্শে শুধু যে উদ্ধারণের গৃহ পবিত্র হইল,

তাহা নহে ; সমস্ত বণিক-কুল পর্য্যন্ত ধন্য ও কৃতার্থ হইল। সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে ঘরে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন করিলেন।

"মহা ভাগবতশ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ ॥"

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

১৪০৩ শকে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মুক্ত-বেণীস্থান ত্রিবেণীর তীরবর্ত্তী হুগলী জেলার অন্তঃপাতী সপ্তগ্রাম নগরে (ত্রিশবিঘা ষ্টেশনের সন্নিকট) বৈশ্য জাতীয় সুবর্ণবণিকবর্ণসম্ভূত শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীশ্রীধরচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ঔরসে ও শ্রীমতী ভদ্রাবতীর গর্ভে মহাত্মা শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মহা অন্তরঙ্গ প্রিয় ভক্ত এবং প্রিয় পার্শ্বদ ছিলেন। ইনিই শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবতারে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা শ্রীদাম, সুবল প্রভৃতি দ্বাদশ গোপালের মধ্যে সুবাহু নামক পঞ্চম গোপালরূপে অবতীর্ণ হয়েন।

"শ্রীদামাচ সুদামাচ সুবলশ্চ মহাবল।
সুবাহুর্ভদ্রসেনশ্চ স্তোক কৃষ্ণ সুরামকৌ ॥
লবঙ্গশ্চ মহাবাহুর্গন্ধর্ব্ব বীরবাহুকৌ ॥"

—বৃহৎ গণদীপিকা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা উক্ত দ্বাদশ গোপালের মধ্যে "সুবাহুর্যো ব্রজে গোপো দত্ত উদ্ধারণাখ্যক" অর্থাৎ ব্রজলীলায় যিনি সুবাহু নামে গোপাল-সখা ছিলেন তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর নামে অবতীর্ণ হন। শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর মহাশয় যুবা বয়সেই নিজ পুত্র শ্রীশ্রীনিবাসচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে গার্হস্থ্যে শ্রীশ্রী৺প্রভুর সেবাদি কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া বৈরাগ্যবশতঃ শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর

একান্ত শরণাগত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তদীয় সেবা করিতে করিতে তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হন। উদ্ধারণ দত্ত নিত্যানন্দ প্রভুর এতদূর প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন যে, প্রভু তাঁহার হস্তের রন্ধন-দ্রব্য খাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা-বোধ করিতেন না। শ্রীনিত্যাঃবংশবিস্তার গ্রন্থে আছে—

"একদিন বিপ্র সব একত্র হইয়া।
হাস পরিহাস রূপে প্রভুরে সুধায়া॥
শ্রীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আয়োজন।
স্বপাক করয়ে কিংবা আছয়ে ব্রাহ্মণ॥
প্রভু বলে কখন বা আমি পাক করি।
না পারিলে "উদ্ধারণ" রাধয়ে উতরি॥
এই মত পরিবর্ত্ত রূপে পাক হয়।
শুনিয়া সবার মনে লাগিল বিস্ময়॥
তারা কহে এ বৈষ্ণব হয় কোন জাতি।
পূর্ব্বাশ্রমে কোন্ নামে কোথায় বসতি॥
প্রভু কহে "ত্রিবেণী"তে বসতি উহার।
সুবর্ণ বণিক দেখি করিনু স্বীকার॥
এত শুনি সব বিপ্র হাসিতে লাগিল।
ঈশ্বরের স্বেচ্ছাময় আচার জানিল॥"

উদ্ধারণ দত্ত কয়েক বৎসর শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর সেবা করিতে করিতে নীলাচল, শ্রীবৃন্দাবনধাম প্রভৃতি নানা তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে কাটোয়ার উত্তর "উদ্ধারণপুরে" শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভুর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক সেবা করেন। এইরূপ কিছুকাল যাপন করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে তিনি তিরোহিত হন।

সপ্তগ্রামে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া প্রভু নিত্যানন্দ শান্তিপুরে আগমন করেন। শান্তিপুরে আসিয়া তিনি অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিছুকাল শান্তিপুরে অবস্থানপূর্ব্বক প্রেমবন্যায় শান্তিপুর প্লাবিত করিয়া নিত্যানন্দ অতঃপর নবদ্বীপে আসিলেন।

নিত্যানন্দ নবদ্বীপে পৌছিয়াই প্রথমে শচীমাতার চরণে প্রণাম করিলেন। শচীমাতার ইচ্ছানুসারে তিনি নবদ্বীপে থাকিয়া ঘরে ঘরে কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র প্রচার করিতে লাগিলেন।

"নবদ্বীপে নিত্যানন্দ প্রতি ঘরে ঘরে।
সব পারিষদ-সঙ্গে কীর্ত্তন বিহরে॥"

নিত্যানন্দকে নবদ্বীপবাসী সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যের মত ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে লাগিল। কিন্তু নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ ছিল, সে পূর্ব্বে মহাপ্রভুর সহপাঠী ছিল। নিত্যানন্দের প্রভাব দেখিয়া সে সন্দিহান হইল। কিন্তু পরিশেষে নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে প্রভুকে সে বলিল, "আচ্ছা প্রভু নিত্যানন্দকে যে নবদ্বীপের সকলে অবধূত বলে, ইহা কিরূপে বলে তাহা আমি বুঝিতে পারি না। লোকে বলে, নিত্যানন্দ পরম সন্ন্যাসী, কিন্তু কর্পূর তাম্বুল তাঁহার নিত্য ভক্ষ্য। সন্ন্যাসীর পক্ষে ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করা উচিত নহে, কিন্তু নিত্যানন্দের অঙ্গে কত সোনা রূপা দেখিতে পাই, কষায়-কৌপীন তাঁহার পরিধানে নাই, তিনি দিব্য পট্টবাস পরিধান করেন; তিনি দণ্ড ধারণ করেন না, পরন্তু লৌহদণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন। আর ব্রাহ্মণ হইয়া শূদ্রের আশ্রমে তাঁহার বাস দেখি।"

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন,

"ন মধ্যে কান্ত ভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমপেয়ুষাম্ ॥
— শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত।

যেমন পদ্মপত্রের গাত্রে কখনও জল লাগে না, সেইরূপ নিত্যানন্দ বিলাসিতার মধ্যে থাকিলেও তাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল জানিবে। অধিকারীবিহীন হইয়া যে নিত্যানন্দের ন্যায় আচরণ করে, সে পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হয়। যেমন মহাদেব ব্যতীত অন্য কেহ বিষ পান করিলে তাহার নিশ্চিত মৃত্যু হয়, সেইরূপ অধিকারী না হইলে কখনও ভোগৈশ্বর্য্য উপভোগ করিতে নাই, তাহাতে পতন অবশ্যম্ভাবী। নিত্যানন্দ অধিকারী, সুতরাং এই সব বিলাসিতায় তাঁহার অন্তঃকরণ কখনও অভিভূত হয় না।

"চল বিপ্র! তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে যাও।
এই কথা কহি তুমি সবারে বুঝাও॥
পাছে তাঁরে কেহ কোনরূপে নিন্দা করে।
তবে আর রক্ষা তার নাহি যম-ঘরে॥
যে তাঁহারে প্রীতি করে, সে করে আমারে।
সত্য সত্য বিপ্র! এই কহিলুঁ তোমারে॥
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিলুঁ তোমারে॥"

প্রভুর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের নিত্যানন্দের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি জন্মিল। নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি সন্ধ্যাগ্রে নিত্যানন্দের

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার চরণধূলি লইলেন এবং আনুপূর্ব্বিক যথাযথ বিবরণ বলিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন।

কিছুকাল নিত্যানন্দ নবদ্বীপধামে লীলামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গৌরচন্দ্রকে দেখিবার জন্য সপারিষদ নীলাচলে যাত্রা করিলেন। কমলপুরে পৌঁছিয়া জগন্নাথদেবের ধ্বজা দেখিয়াই তিনি ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীচৈতন্য বলিতে বলিতে তিনি এক পুষ্পোদ্যানের মধ্যে বসিলেন। নিত্যানন্দ আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া মহাপ্রভুও পুরী হইতে একাকী সেই পুষ্পোদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়ে উভয়ের সন্দর্শনে গলাগলি করিয়া হরিনাম করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটিলে নিত্যানন্দের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আপন আশ্রমে আসিলেন। তার পর জগন্নাথ দর্শন করিয়া নিত্যানন্দের প্রাণ যে কিরূপ হইয়াছিল তাহা নিত্যানন্দ-চরিতামৃতকারের ভাষাতে বলিতেছি—

"জগন্নাথ দেখি মাত্র নিত্যানন্দ রায়।
আনন্দে বিহ্বল হই গড়াগড়ি যায়॥
আছাড়ি পড়েন প্রভু প্রস্তর-উপরে।
শতজনে ধরিলেও ধরিতে না পারে॥"

অতঃপর গৌরচন্দ্র একদিন নিত্যানন্দকে বলিলেন, "তুমি গৌড়দেশে যাইয়া সংসার কর। সংসারী না হইলে লোকের নিস্তার হইবে কিরূপে? আমি পুনরায় তোমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়া দ্বারে দ্বারে ভক্তি-মন্ত্র বিলাইব। দ্বাপরে যদুবংশ বিস্তৃত হয় নাই, কিন্তু তোমার বংশ বিস্তৃত হইবে। প্রভুর অবতার নিত্যানন্দ গৌড়দেশে ফিরিয়া আসিলেন, পাণিহাটি গ্রামে রাঘবাচার্য্যের ঘরে আসিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন।

চারিদিক হইতে সে সংবাদ শুনিয়া দলে দলে লোক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল।

অতঃপর অম্বিকানগরের সূর্য্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যার সহিত নিত্যানন্দের বিবাহ হয়। পত্নীদ্বয়ের নাম বসুধা ও জাহ্নবী। বসুধার গর্ভে বীরচন্দ্র নামে নিত্যানন্দের এক সর্ব্ব-সুলক্ষণ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই বীরচন্দ্র গৌড়দেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতা হইয়াছিলেন।

অতঃপর নিত্যানন্দ খড়দহে আগমন করেন। তাঁহার আগমনে খড়দহে হরিনামের মহা-কীর্ত্তন উত্থিত হইল। নিত্যানন্দ এই সময়ে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। একদিন শ্যামসুন্দরের মন্দিরে হরিনাম করিতে করিতে সেই যে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, আর কোন মতেই তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হয় না। ভক্তগণকে শোকাশ্রু-সাগরে ভাসাইয়া নিত্যানন্দ চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করেন।

——:০:——

রূপ-সনাতন

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম্মবাদ-প্রচারে যে সমস্ত ভক্ত সহায়তা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিত্যানন্দের সহিত রূপ-সনাতনের নাম সমসূত্রে গ্রথিত। নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর আজ্ঞায় গৌড়দেশে কীর্ত্তন করিয়া হরিনাম বিতরণ করিয়াছিলেন, আর রূপ-সনাতন দুই ভাই বৃন্দাবনে গিয়া নানা ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশ করিয়া গৌরাঙ্গ-লীলারহস্য সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। সনাতন-প্রণীত হরিভক্তিবিলাস, ভাগবতামৃত, দশম টিপ্পনী ও দশম চরিত আজিও বৈষ্ণবসমাজে আদৃত। রূপ-গোস্বামীর ব্রজবিলাস, রসামৃতসিন্ধু, বিদগ্ধমাধব, উজ্জ্বলনীলমণি, ললিতমাধব, দানকেলী-কৌমুদী, স্তবাবলী, অষ্টাদশলীলা, গোবিন্দ-বিরুদাবলী, মথুরা-মাহাত্ম্য, ব্রজবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইঁহাদের ভক্তিগ্রন্থের দ্বারা ভগবান শ্রীশ্রীচৈতন্যের ভাবধারা সুদূর বৃন্দাবনে কিরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা মহাতীর্থ বৃন্দাবনেই প্রকাশ।

রূপ ও সনাতন ছিলেন দুই সহোদর। কুমারদেব নামক এক উচ্চবংশসম্ভূত সম্ভ্রান্ত লোকের ঔরসে ইঁহারা জন্মগ্রহণ করেন। কুমারদেব বাকলা চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। অনেক সময় বিষয়-কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে যশোহর জেলার অন্তঃপাতী ফতয়াবাদ নামক স্থানে গমনাগমন করিতে হইত। এই ফতয়াবাদেই কুমারদেবের ঔরসে দেশবিখ্যাত ভক্ত রূপ-সনাতন জন্মগ্রহণ করেন। কুমারদেব নিজে অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। আচার-অনুষ্ঠান-পালনে তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠা সচরাচর অন্য কাহাতেও দেখা যাইত না। এমনই ধারা ধর্ম্মনিষ্ঠ জনকের আত্মজ বলিয়া রূপ-সনাতনের

জীবনও শৈশব হইতে ধর্ম্মময় হইয়াছিল। পিতা মাতা যদি ধর্ম্মপরায়ণ হন, তাহা হইলে তাঁহাদের পুত্র-কন্যারাও যে ধর্ম্মশীল হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। রূপ-সনাতনের জীবন ইহার জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন।

রূপ-সনাতন যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে বঙ্গদেশে সৈয়দ হুসেন শাহ নামক এক মুসলমান নরপতি গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া একতাবিহীন হিন্দুজাতির দৌর্ব্বল্যের প্রতি তীব্র উপহাস করিতেছিলেন। সে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর কথা। রূপ-সনাতনের পিতা মাতা তাঁহাদের পুত্রদ্বয়কে উত্তম রূপ সংস্কৃত শিক্ষা দিয়াছিলেন। সংস্কৃতশাস্ত্রে তাঁহারা এরূপ প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তিশালী হইয়াছিলেন যে, গৌড়াধিপতি হুসেন শাহ তাঁহাদের দুই সহোদরকে সাদরে আহ্বান করিয়া সনাতনকে মন্ত্রিপদে এবং রূপকে প্রধান রাজ-কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত করেন। রূপ-সনাতন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারা রাজকার্য্য কখনও অবহেলা করিতেন না। হুসেন শাহ তাঁহাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দর্শনে পুলকিত হইয়া তাঁহাদিগকে বিস্তর ভূসম্পত্তি দান করেন। এইরূপ রাজদত্ত ভূসম্পত্তি পাইয়া তাঁহারা দুই ভাই যথেষ্ট ধনশালী হইয়া উঠেন এবং রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ফতেয়াবাদ গমনাগমন করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় তাঁহারা গৌড়ের নিকট রামকেলিতে বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। একাকী নিঃসঙ্গ বাস করা অসম্ভব বিধায় তাঁহারা ফতেয়াবাদ হইতে তাঁহাদের বহুতর প্রতিবেশীকে রামকেলিতে আনাইয়া বাস করান। হুসেন শাহ রূপ-সনাতনকে দুইটি যাবনিক নামে অভিহিত করিতেন। রূপের নাম হইয়াছিল দবির খাঁ আর সনাতনের নাম সাকার মল্লিক। নবাব-সরকারে ইঁহারা এই দুই নামেই পরিচিত ছিলেন।

রূপ-সনাতন রাজ-সরকারে উচ্চপদে চাকুরী করেন, তাঁহাদিগকে একরূপ গৌড়ের বাদশাহ বলিলেও অত্যুক্তি হইত না, কিন্তু এত ধনরত্ন-

ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকিয়াও তাঁহারা ভগবৎবিমুখ ছিলেন না। রাজকার্য্য সমাপন করিয়াই তাঁহারা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, ভক্তি-শাস্ত্রাদি পাঠ এবং ভক্তগণের সহিত ধর্ম্মকথায় অতিবাহিত করিতেন। পণ্ডিতগণ তাঁহাদের বাটীতে সমবেত হইয়া সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনা করিতেন। এইরূপ শাস্ত্রালোচনার ফলে ইঁহারা "হংসদূত" ও "পদ্যা-বলী' নামক দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সকল ধর্ম্মের মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। শত শত শাস্ত্র অনুশীলন করিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ভক্তের দ্বারে ভগবান চিরকালই বাঁধা। ভগবান ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু। যেমন পঙ্কবিহীন স্বচ্ছ সরসী-সলিলে মানুষের প্রতিবিম্ব স্পষ্টতর প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি ভক্তের হৃদয়-মুকুরে ভগবানের প্রতি-চ্ছবিও প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এইজন্যই ভগবান বলিয়াছেন—

"সমোহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি
যো ভজন্তি তুমাং ভক্ত্যা, ময়ি তে তেষু যাধ্যহম্॥"

এই জন্যই ভগবান হস্তিনাপুরের রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া বিদুরের ক্ষুদও পরম আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য ভগবান দ্বারকার রাজসিংহাসনে বসিয়াও সুদামা বিপ্রের চিপিটকও গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবানকে পাইতে গেলে তর্ক-যুক্তিতে লাভ করা যায় না, ভক্তিই তাঁহাকে পাইবার শ্রেষ্ঠ সোপান।

"ভক্তিশূন্য আমি ব্রাহ্মণেরও নই।
ভক্তিমান্ আমি চণ্ডালের হই।
ভক্তিহীন জনে সুধা দিলে পরে সুধাই নারে।
ভক্তিমান মোরে গরল দিলেও খাই॥"

ইহাই ভগবানের বাণী। একমনে, একপ্রাণে ভগবানকে ডাক, ডাকার মত ডাকিতে পারিলে তিনি কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? প্রহ্লাদ তাঁহাকে ডাকার মত ডাকিয়াছিল, তাই কি জলন্ত পাবকে, কি ভীমগর্জ্জন জলধিবক্ষে, কি মদমত্ত হস্তীপদতলে পড়িয়াও তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন। ধ্রুব ডাকার মত ডাকিয়াছিল, তাই ভগবানও মূর্ত্তিমান্ হইয়া বরাভয়দাতারূপে তাহার অভীষ্ট-পূরণের জন্য প্রকট হইয়াছিলেন।

রূপ-সনাতন শাস্ত্রাদিতে পরম পণ্ডিত হইলেও এই ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাটীর সন্নিকটে "শ্যামকুণ্ড" ও "রাধাকুণ্ড" নামে সরোবর খনন করিয়াছিলেন। এই নিভৃত কুণ্ডে বসিয়া তাঁহারা হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন। সে সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবল প্রভাব। সমগ্র গৌড়দেশ চৈতন্যের প্রেমধারায় অভি-সিঞ্চিত। রূপ-সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা পরম্পর শুনিতে পাইয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়াও ভক্তিপথ অবলম্বন করা যায় কি না, সে সম্বন্ধে ভগবান শ্রীচৈতন্যের অভিমত জানিবার জন্য তাঁহার নিকট একখানি লিপি প্রেরণ করেন। ভগবান শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে এই উপদেশ-লিপি প্রেরণ করেন যে, যেমন ব্যভি-চারিণী রমণী অন্য পুরুষে আসক্ত হইলেও সংসারের কাজ-কর্ম্ম করে, তেমনি ভগবানে ঐকান্তিক আসক্তি রাখিয়া নিষ্কামভাবে গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করা যাইতে পারে।

তদবধি রূপ-সনাতন ভগবচ্চিন্তাকে পুরোভাগে রাখিয়া নিষ্কামভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে যাইবার পথে রামকেলিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাছে গৌরাঙ্গদেবের

প্রতি হুসেন শাহ কোনরূপ অত্যাচার করেন, রূপ এই আশঙ্কায় তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন, "শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব অতি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ, তাঁহার আগমনে আপনার এই রাজ্য গৌরবান্বিত ও পবিত্র হইয়াছে। সুতরাং যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়া যাইতে পারেন আপনার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে সেই ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।"

দবীর খাঁয়ের (রূপের) কথা শুনিয়া হুসেন শাহ ঐরূপ আদেশ করিলেন। অতঃপর রূপ-সনাতন গভীর নিশীথে গিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রভু বলিলেন—

"গৌড় নিকট আসিতে নাহি মোর প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন॥"

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ইতিপূর্ব্বে রূপ-সনাতনের অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তির কথা শুনিয়াছিলেন। আজ সম্মুখে তাঁহাদিগকে দেখিয়া তাঁহার সে বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হইল। তিনি দুই ভাইকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া ভক্তবৃন্দের সমক্ষে বলিলেন, "আজ হইতে তোমাদের দুই ভাইয়ের নাম "রূপ-সনাতন" হইল।"

গৌরের স্পর্শ ও দর্শন যেন তাঁহাদের প্রাণের ভিতর এক মোহিনী মায়া বিস্তার করিল। তাঁহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন বটে, কিন্তু মন বাঁধা থাকিল সেই রাঙ্গা গৌরাঙ্গের রাঙ্গা চরণে। ভাবিলেন, এই ত সংসার! টাকা-কড়ি-ধন-রত্নসম্ভারে নিমগ্ন থাকিয়া সংসারে কি ফল? যে কৃষ্ণের চরণ ভজনা করিতে সংসারে আগমন হইল, কৈ সেই রাধাকৃষ্ণের চরণ ত ভজনা করা হইল না? সংসারে থাকিয়া কি কখনও কৃষ্ণচরণ ভজিবার মত ভজা যায়! এ সংসার যে মায়া-মোহের নিগড়ে আবদ্ধ। এখানে আশা আছে তৃপ্তি নাই, প্রবৃত্তি

আছে নিবৃত্তি নাই, হিংসা আছে প্রেম নাই, বিচ্ছেদ আছে মিলন নাই। অবসর সময়ে বসিয়া ভগবানকে ডাকিলে কি চলে ? ভগবানকে ডাকিতে গেলে সমস্ত মোহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, সর্ব্বকর্ম্ম পরিহার করিয়া তবে ডাকিতে হয়। ভোগ ও ত্যাগ এই দুই বিচ্ছিন্নমুখী প্রবৃত্তি কখনও একসঙ্গে চলিতে পারে না। ইত্যাকার নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে রূপ-সনাতন গৃহে ফিরিলেন।

রূপ বেশী দিন বিলম্ব না করিয়া তাঁহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দান করিয়া ফেলিলেন। চৈতন্যদেব কোথায় গিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য এক পরিচারক প্রেরণ করিলেন। পরিচারক অনুসন্ধান করিয়া আসিয়া বলিল, "শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবনাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছেন।" রূপও অতঃপর তাঁহার অনুজকে সঙ্গে লইয়া প্রয়াগধামাভিমুখে চৈতন্যের অনুসন্ধানে গেলেন। যাত্রাকালে তিনি সহোদর সনাতনকে একখানি পত্র দ্বারা সমস্ত অবস্থা জানাইয়া গেলেন।

রূপ চলিয়া গেলে সনাতন চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। এক বৃন্তের দু'টি ফল, একটি অগ্রে পাকিবে, আর একটি কাঁচা রহিবে, ইহা কি কখনও হইতে পারে? সনাতনও কবে এই সংসার-শিকল কাটিয়া "জয় হরি" বলিয়া যাত্রা করিতে পারিবেন সেই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নানাবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিতদিগকে লইয়া সনাতন নিশি-দিন ধর্ম্মালোচনা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মপুস্তকও মানুষের প্রধানতম সৎসংসর্গ। যে যেরূপ ধর্ম্মপুস্তক পড়ে, যদি অভিনিবিষ্টচিত্তে পড়া যায়, তবে তাহা দ্বারা তাহার ধর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠিয়া থাকে। এই জন্য যেমন সংসর্গ দেখিয়া লোকচরিত্র নির্ণয় করা যায়, তদ্রূপ যাহার নিকট যেরূপ পুস্তক থাকে তাহা দেখিয়া সে লোকের চরিত্র বুঝিতে পারা যায়। সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রানুশীলনে মনোনিবেশ করিলেন, তাহার ফলে তাঁহার

দ্বারা রাজকার্য্যের শিথিলতা প্রদর্শিত হইতে লাগিল। একে ত রূপের অভাবে পাতশাহ হুসেন শাহের রাজকার্য্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছিল; তাহার উপর যদি রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী সনাতনও রাজকার্য্যে অবহেলা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে রাজ্যই যে অচল হইয়া যায়—বিশেষতঃ পাতশাহ হুসেন শাহ সনাতনের উপর রাজ্যভার দিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিবেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। একদিন, দুইদিন, তিনদিন করিয়া কয়েক দিন কাটিল, পাতশাহ ভাবিলেন, নিশ্চয়ই সনাতনের কোনরূপ অসুখ-বিসুখ করিয়াছে। রাজবৈদ্যকে তিনি সনাতনের রোগের কারণ নির্ণয় করিবার জন্য পাঠাইলেন। রাজবৈদ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সনাতনের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার কোনই ব্যাধির লক্ষণ দেখিলেন না। পাতশাহের নিকট গিয়া তিনি বলিলেন, "জাঁহাপনা! সনাতনের নাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়াও কোন ব্যাধির লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না।" এবার পাতশাহ স্বয়ং সনাতনকে দেখিতে আসিলেন। সনাতন দেখিলেন, পাতশাহের নিকট সত্য গোপন না করাই ভাল। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "দেখুন, আমার রাজকার্য্যে মন লাগে না। যে হরিনামে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সমগ্র গৌড়দেশ মাতাইয়া গিয়াছেন, আমাকে সেই হরিনামে মাতোয়ারা হইতে দিন, আমার পদে অন্য লোক নিযুক্ত করুন, আমি রাজকার্য্য হইতে অবসর লইলাম।"

সনাতনের স্পষ্টোক্তি শুনিয়া পাতশাহ ক্রোধে আরক্তলোচন হইলেন। তিনি সনাতনকে বলিলেন, "আমি এখন যুদ্ধযাত্রা করিব, কোথায় তুমি এখন রাজ্য রক্ষা করিবে, না, এখন তোমার ধর্ম্মভাব ফুটিয়া উঠিল! তুমি হয় এই মুহূর্ত্তে রাজকার্য্যে যোগদান কর, নতুবা তোমাকে বন্দী করিয়া ডাল কুত্তা দিয়া খাওয়াইব।" সনাতন বলিলেন, "তাহাই করুন। হরিনামে বঞ্চিত হইয়া রাজকার্য্য করার চেয়ে আমি বন্দিদশায়

নির্জ্জন কারাগারে অবস্থান করাও শ্রেয়স্কর মনে করি। তাহাতে নিশিদিন সেই কাঙ্গালের ধন শ্রীহরিকে ডাকিবার ত অবসর পাইব।"

পাতশাহ তখন প্রহরিগণের প্রতি সনাতনকে বন্দী করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। তাঁহার আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল। অতঃপর পাতশাহ যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

সনাতন কারারুদ্ধ হইয়াছেন, এ সংবাদ রূপের কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না। তিনি গোপনে সনাতনকে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইলেন, "ভাই আমি শ্রীচৈতন্যের নিকট পরম আনন্দে দিন কাটাইতেছি। তুমি আসিলে আমার আনন্দ আরও পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু তুমি আসিবে কি প্রকারে? আমি বুঝিতে পারিতেছি, তোমার মন-প্রাণ শ্রীচৈতন্যের চরণেই প্রধাবিত হইতেছে, কিন্তু তোমার দেহকে কি উপায়ে মুক্ত করিতে পারা যায়? আমি সংসার ত্যাগ করিয়া আসিবার সময়েই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, তুমিও শীঘ্রই আমার পন্থানুসরণ করিবে। পাতশাহ যে তাহাতে প্রতিবন্ধক হইয়া তোমার উপর নির্য্যাতন আরম্ভ করিবেন, ইহাও আমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। ইহা বুঝিতে পারিয়াই আমি তোমার মুক্তির জন্য মুদীর নিকট দশ সহস্র টাকা রাখিয়া আসিয়াছি। তুমি গোপনে মুদীর নিকট হইতে সেই দশ সহস্র টাকা লইয়া কারারক্ষককে উৎকোচ দিয়া এখানে আগমন করিলে আর তোমাকে পাতসাহ কি করিবেন?"

রূপের পত্র পাঠ করিয়া সনাতন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—এখন কি করা উচিত? কারারক্ষককে উৎকোচ দিয়া মুক্তি লাভ করিলে লোকে আমায় কাপুরুষ, ভীরু, পলাতক বলিয়া নিন্দা করিবে। আবার না পলাইলেও মুক্তিলাভের অন্য উপায় কি? দুর্দ্ধর্ষ হুসেন শাহ

ফিরিয়া আসিয়া নিশ্চয়ই আমাকে ভাল কুত্তার আহার্য্য করিবে, কিন্তু তাহাতে ত আমার হরিনাম করা হইবে না—মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার লীলামাহাত্ম্য ত দেখিতে পাইব না। অতএব কারা-রক্ষককে উৎকোচ দিয়া পলায়ন করাই ভাল। ইহাতে সৎলোকে আমাকে কখনই মন্দ বলিবে না; অসৎ লোকে মন্দ বলিতে পারে। ইত্যাকার নানা বিষয় ভাবিয়া সনাতন একদিন গভীর রাত্রিতে কারা-রক্ষককে ডাকিলেন। কারারক্ষক আসিলে সনাতন তাহাকে চুপি চুপি বলিলেন, "ভাই সাহেব! তুমি অত্যন্ত ধার্ম্মিক মুসলমান, একদিন আমি তোমাদের মনিব ছিলাম; আজ গ্রহদোষে আমি তোমাদের নিকট বন্দী। তুমি নিশ্চয়ই জান যে, এ সংসারে যতপ্রকার ধর্ম্ম আছে তন্মধ্যে পরোপকারই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আমাকে আজ যদি তুমি এই গভীর নিশীথে মুক্ত করিয়া দাও, তাহা হইলে তোমার অক্ষয় পুণ্য হইবে। তোমায় পুরস্কারস্বরূপ আমি পাঁচ হাজার টাকা উৎকোচ প্রদান করিতেছি।" সনাতনের কথা শুনিয়া কারারক্ষক দাড়ী নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "তাও কি হয়! আমি রক্ষক হইয়া সামান্য টাকার লোভে কর্ত্তব্য কার্য্যে কি করিয়া উদাসীনতা প্রদর্শন করিব? পাতশাহ যদি ফিরিয়া আসিয়া জানিতে পারেন যে, আমি আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার ভাগ্যে আপনার ন্যায় ঐরূপ বন্দিদশা হইবে।" সনাতন দেখিলেন, পাঁচ সহস্র মুদ্রায় মুনসীজীর মন ভিজিবে না; তিনি মুদীর দোকান হইতে আরও দুই সহস্র টাকা আনিয়া তৎপর দিন রাত্রিতে মুনসীজীর সম্মুখে একুনে সাত সহস্র টাকা রাখিয়া বলিলেন, "মুনসীজী আমার অনুরোধ রাখ, আমাকে মুক্ত দাও; পাতশাহ যুদ্ধে গিয়াছেন, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ, আর ফিরিবেন কিনা সন্দেহ। যদি কখনও ফেরেন, বলিও যে, বন্দী সনাতনকে

যখন স্নান করাইতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তখন সে নদীগর্ভে ডুবিয়া আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে।" সম্মুখে একটি নয়—দুইটি নয়, একেবারে সাত সহস্র রূপার চাকৃতি, এত টাকা এক সঙ্গে মুনসীজী চোখেও দেখেন নি। এত টাকার লোভ কি সহসা সম্বরণ করা যায়? যা থাকে কপালে! মুনসীজি সনাতনকে কারাকক্ষ হইতে চুপি চুপি বাহির করিয়া নিজে সঙ্গে থাকিয়া সেই গভীর রাত্রে গঙ্গা পার করিয়া দিলেন। ঈশান নামক একজন ভৃত্য তাহার প্রভু সনাতনের সঙ্গে গেল। ভৃত্য সনাতনের অজ্ঞাতসারে তাহার সঙ্গে আটটি সোনার মোহর লইয়া যাইতেছিল। বৃন্দাবনের দিকে তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু পাছে কেহ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে, সেই ভয়ে বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহারা পাতরা নামক একটি পর্ব্বতে গয়া সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হইলেন। সেই পর্ব্বতে ভূয়া নামক এক জাতীয় দস্যুদল বাস করিত। সহায়হীন পথিকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত করিয়া তাহাদিগকে প্রাণে মারিয়া ফেলাই এই ভূয়া জাতির কার্য্য। তাহাদের মধ্যে আবার একজন গণক ছিল, সেই গণক মনে মনে গণা-পড়া করিয়া বুঝিল যে, ঈশানের নিকট আটটী সোনার মোহর আছে। সে এই সংবাদ চুপি চুপি ভূয়াদের নিকট প্রকাশ করিল। ভূয়ারা সেই রাত্রেই অতিথিদ্বয়ের জীবন নাশ করিবে সঙ্কল্প করিয়া অত্যন্ত যত্ন আরম্ভ করিল। তাহাদের আতিথেয়তা ও যত্ন দর্শনে সনাতনের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইল। তিনি ভাবিলেন, এই ভূয়াগণ নিশ্চয়ই কোন মন্দ অভিসন্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমাদিগকে যত্ন করিতেছে। এই ভাবিয়া তিনি ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঈশান! তোমার নিকট কি কিছু আছে?" ঈশান বলিল, "হাঁ আছে।" সনাতন বলিলেন, "তাহা ভূয়ার সর্দ্দারকে দান কর।" এই বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে

ভূয়ার সর্দ্দারকে বলিলেন, "সর্দ্দার মহাশয়! আমার এই ভৃত্যের নিকট যাহা আছে তাহা লও এবং তোমাদের একজন লোক সঙ্গে দিয়া আমাদিগকে এই পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া দাও।" ভূয়ার সর্দ্দারকে ঈশান সাতটি স্বর্ণমুদ্রা দিল, বাকী একটি আর দিল না। দস্যু সর্দ্দারের প্রেরিত লোক সনাতনকে পার্ব্বত্য পথ ছাড়াইয়া দিল। সনাতন কিছু দূর গিয়া ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঈশান! তোমার নিকট আরও কি কিছু আছে?" ঈশান বলিল, "হাঁ প্রভু! আমার নিকট এখনও একটী মোহর আছে।" সনাতন বলিলেন, "ঈশান! তোমাকে আর আমার সহিত আসিতে হইবে না, তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাও।" ঈশান বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

অতঃপর সনাতন নানাপথ অতিক্রম করিতে করিতে, দুই বাহু তুলিয়া হরিনাম করিতে করিতে হাজিপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় তখন সনাতনের ভগিনীপতি শ্রীকান্ত হুসেন সাহের কর্ম্মচারীদের লইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। শ্রীকান্ত দিল্লীর বাদশাহকে ঘোটকের মূল্যস্বরূপ তিন লক্ষ টাকা দিবার জন্য যাইতেছিলেন। সনাতন একটি তরুতলে পড়িয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন। দূর হইতে সে ধ্বনি শ্রীকান্তের কর্ণে পৌছিতেই তিনি স্বর শুনিয়া বুঝিলেন যে, ইহা তাঁহারই শ্যালক সনাতনের কণ্ঠস্বর। শ্রীকান্ত তাড়াতাড়ি সনাতনের নিকট আসিয়া দেখেন, সনাতন সেই দুঃসহ শীতে নগ্নগাত্রে এক বৃক্ষতলে পড়িয়া হরিনাম করিতেছেন। সনাতনের বিষয়-বৈরাগ্যের কথা শ্রীকান্ত ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, কিন্তু উচ্চ রাজপ্রসাদের অধিকারী সনাতন যে, এত শীঘ্র কৌপীনধারী পথের ভিখারী হইবেন, ইহা তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও আশা করেন নাই। তিনি শ্যালককে অনেক প্রবোধ দিয়া স্বদেশে ফিরিবার অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

তার পর নগ্নদেহ ঢাকিবার জন্য সনাতনকে একখানি বহুমূল্য শাল দিলেন, সনাতন তাহা গায়েও দিলেন না। পরিশেষে শ্রীকান্তের বিশেষ পীড়া-পীড়িতে সনাতন গায়ে একখানি ভোট কম্বল দিলেন। পরিধানে কৌপীন, গায়ে ভোট কম্বল—সনাতন উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে অতঃপর বারাণসীধামে চন্দ্রশেখরের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ তখন চন্দ্রশেখরের বাটীতেই অবস্থান করিতে ছিলেন। চন্দ্রশেখরের বাটীর দ্বারদেশে উপনীত হইয়া সনাতন সংবাদ পাঠাইলেন, মহাপ্রভুকে বলুন একজন বৈষ্ণব তাঁহার দর্শন-প্রার্থী। চন্দ্রশেখর দেখেন, বৈষ্ণবের ন্যায় সনাতনের সাজ-পোষাকে ও দেহে কোন চিহ্ন নাই। তিনি মহাপ্রভুকে গিয়া বলিলেন, "একজন দীন দরিদ্র লোক, পরিধানে তাহার কৌপীন, অঙ্গে তাহার একখানি ভোট কম্বল, দন্তে তাহার তৃণ, সে আপনার দর্শন প্রার্থনা করিতেছে।" মহাপ্রভু বলিলেন, "তাঁহাকে এখনই আমার নিকট লইয়া এস, তিনি পরম বৈষ্ণব।" সনাতন শ্রীচৈতন্যের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিলেন। উভয়ের নেত্রদ্বয় দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হইল। সনাতন বহুকষ্টে ঈপ্সিত ধন প্রাপ্ত হইলেন।

কিছুক্ষণ শ্রীচৈতন্যের সহিত সনাতনের কথাবার্ত্তা হইল। শ্রীচৈতন্যের নিকট সনাতন কেমন করিয়া মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিয়া কারাগার হইতে উন্মুক্ত হইয়া আসিয়াছেন, সে সমস্ত বিষয় বিবৃত করিলেন। শ্রীচৈতন্য তৎসমস্ত শুনিয়া বুঝিলেন, সত্য সত্যই গৌড়াধিপতির প্রধান মন্ত্রীর কঠোর বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে। তিনি চন্দ্রশেখরের প্রতি আদেশ করিলেন, সনাতনকে ক্ষৌর করাইয়া দীক্ষা-গ্রহণের উপযোগী করিয়া দাও। চন্দ্রশেখর তাঁহাকে ক্ষৌর ও গঙ্গাস্নান করাইয়া একখানি

নূতন বস্ত্র পরিধানের জন্য দিলেন। সনাতন বলিলেন, "না, না, আমি নূতন বস্ত্র পরিধান করিব না, আমাকে একখানি পুরাতন বস্ত্র দাও।" অতঃপর সনাতনের পীড়াপীড়িতে চন্দ্রশেখর তাঁহাকে আপনার একখানি পুরাতন বস্ত্র দিলেন। সনাতন সেই বস্ত্রখানি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একখানি পরিধান করিলেন আর একখানি বহির্ব্বাসরূপে ব্যবহার করিলেন। একজন ব্রাহ্মণ সে দিন তাঁহার বাটীতে সেবা করিবার জন্য সনাতনকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু সনাতন তাহা না করিয়া বৈষ্ণবের মাধুকরী ব্রত গ্রহণ করিয়া ভিক্ষা দ্বারা উদরান্নের সংস্থান করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সেইদিন হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সনাতন এইরূপ মাধুকরী ব্রত পালন করিয়া জীবিকা সংস্থান করিয়াছিলেন।

সনাতন বৈষ্ণব হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকান্ত তাঁহাকে যে ভোট কম্বলখানি দিয়াছিলেন, সেখানি তখনও তাঁহার গায়ে ছিল। মহাপ্রভু পুনঃ পুনঃ সেই ভোট কম্বলের দিকে তাকাইতেছিলেন। তাহা দেখিয়া সনাতন ভাবিলেন, নিশ্চয়ই প্রভু এই ভোট কম্বলখানি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতেছেন। ইহা ভাবিয়া তিনি বাহিরে গেলেন, বাহিরে গিয়া দেখেন একখানি জীর্ণ কন্থা গায়ে দিয়া একজন ভিখারী শুইয়া আছে। সনাতন সেই জীর্ণকন্থার সহিত আপনার ভোট কম্বলের বিনিময় করিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর মন তাহাতেও পরিতুষ্ট হইল না। তিনি বলিলেন, "সনাতন, বৈদ্যেরা রোগের চিকিৎসা করিয়া কি তাঁহার শেষ রাখে?" সনাতন শ্রীচৈতন্যদেবের ইঙ্গিত বুঝিলেন এবং তৎক্ষণাৎ গাত্র হইতে সেই জীর্ণ কন্থা উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন।—

৺কাশীধামে সনাতন দুইমাস অতিবাহিত করিলেন। তার পর শ্রীগৌরাঙ্গ সনাতনকে বলিলেন, "তুমি আর এখানে না থাকিয়া বৃন্দাবনে

যাও, তথায় যাইয়া ভক্তিগ্রন্থ রচনা কর। তাহা হইলে তোমার দ্বারা আমার প্রেমধর্ম্ম অনেক প্রচারিত হইবে।" সনাতন বলিলেন, "প্রভু! আমি অতি অকিঞ্চিৎকর সামান্য ব্যক্তি। দুরূহ ভক্তিশাস্ত্র রচনা করিব, আমার এমন কি সাধ্য আছে? তবে যদি তুমি দয়া কর, তাহা হইলে তোমার আদেশ প্রতিপালন করিতে পারি।" শ্রীচৈতন্যদেব তখন সনাতনকে তত্ত্ব শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

"কৃষ্ণের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
সূর্য্যাংশ কিরণ যেন অগ্নি জ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
বিচ্ছক্তি জীবশক্তি আর মায়াশক্তি॥"

—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতম্।

"বিষ্ণুশক্তি পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা॥
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তি রিষ্যতে॥
সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়॥"

* * * * *

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ॥
শাস্ত্র গুরু আত্মারূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান॥"

"অতএব ভক্তি কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায়।
অভিধেয় বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ।
তার জ্ঞানে আনুসঙ্গে যায় মায়াবন্ধ॥"

* * * *

"কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্ব্বাদি সর্ব্ব অংশী কিশোর শেখর।
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর॥"

* * * * *

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদি রাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণঃ॥"

* * * * *

"স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ গোবিন্দ পরনাম;
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ যাঁর পূর্ণ নিত্যধাম॥"

* * * * *

"জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে;
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥"

* * * * *

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

* * * * *

"অথবা বহু নৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহ মিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥"

* * * * *

"ভক্তে ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ॥
স্বয়ং রূপ তদেকাত্ম রূপাবেশ নাম॥
প্রথমেই তিনরূপে রহে ভগবান॥
স্বয়ং রূপে স্বয়ং প্রকাশ দুইরূপে স্ফূর্তি।
স্বয়ংরূপে এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্তি॥
প্রাভব বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।
এক বহু বহু রূপ যৈছে হৈল রাসে॥"

এইভাবে শ্রীচৈতন্যদেব সনাতনকে কৃষ্ণতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া—

"কহিতে কৃষ্ণের রসে শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে
প্রেমে সনাতন হাতে ধরি॥"

শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট এইভাবে তত্ত্ব-উপদেশ লাভ করিয়া সনাতন বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং মাধুকরী বা ভিক্ষাব্রত অবলম্বন করিয়া তথায় এক বৃক্ষতলে বসিয়া ভক্তিগ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

সনাতন বৃন্দাবনে থাকেন, আর প্রতিদিন যমুনার কাল জলে স্নান করেন। একদিন যমুনায় অবগাহন করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার পায়ে একটি দ্রব্য ঠেকিল। তিনি তাহা হাতে তুলিয়া দেখেন যে, উহা একখানি স্পর্শমণি, কিন্তু সনাতন স্পর্শমণি লইয়া কি করিবেন? গৌড়ের মন্ত্রিত্ব অগণিত ধনরত্ন বিষয়-বিভবকে পুরীষ-নিষ্ঠীবনের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া যিনি কৌপীনধারী সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাঁহার নিকট এক মুষ্টি ধূলির মূল্যও যাহা, একটী স্পর্শমণির মূল্যও তাহাই। সনাতন উহা হাতে করিয়া একবার ভাবিলেন উহা যমুনার জলে নিক্ষেপ

করিবেন, আর একবার ভাবিলেন, না কাজ নাই, কোন দরিদ্র ভিখারীকে উহা দান করা যাউক। শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি স্পর্শমণিটি একটি খাপরার মধ্যে পূরিয়া পথের পার্শ্বে মাটির মধ্যে পুতিয়া রাখিয়া আসিলেন। বাস সেই পর্য্যন্ত। আর কোনও দিন সনাতন স্পর্শমণির বিষয় ভাবিলেন না, কিংবা সে বিষয়ের কোন সন্ধানও করিলেন না।

এদিকে বর্দ্ধমান জেলার মানকর গ্রাম-নিবাসী জীবন নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোনরূপে বৃহৎ পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিতে না পারিয়া অবশেষে শিবের আরাধনায় মনোনিবেশ করিল। তাহার ঐকান্তিক প্রার্থনায় মহাদেব সত্য সত্যই পরিতুষ্ট হইয়া এক রাত্রিতে স্বপ্নযোগে তাহাকে বলিলেন, বৃন্দাবনে যমুনা-তটে সনাতন নামে একজন বৈষ্ণব আছেন, তাঁহার নিকট গেলে তুমি স্পর্শমণি পাইবে। সেই স্পর্শমণি যে কোন ধাতুতে ছোঁয়াইবে অমনি তাহা কাঞ্চনে পরিণত হইবে। পরদিন প্রাতে স্বপ্নবৃত্তান্ত স্মরণ হইতেই জীবন বৃন্দাবনাভিমুখে প্রস্থান করিল। সে ব্যক্তি বৃন্দাবন পৌঁছিয়াই একেবারে নদীতটে সনাতনের নিকট উপস্থিত হইল। সনাতনকে স্পর্শমণির কথা বলিতেই তিনি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তার পর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে করিলেন, একদিন অবগাহনে যাইবার সময় একটী স্পর্শমণি তাঁহার পায়ে ঠেকিয়াছিল, তিনি সেই স্পর্শমণি খাপরায় করিয়া মাটিতে পুতিয়া রাখিয়াছেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ জীবনকে সঙ্গে লইয়া সনাতন অতঃপর যে স্থানে স্পর্শমণি প্রোথিত ছিল, সেইস্থানে উপনীত হইলেন এবং পায়ের দ্বারা সেই স্পর্শমণি দেখাইয়া দিলেন। দরিদ্র জীবন মাটী খুঁড়িতেই সেই স্পর্শমণি প্রাপ্ত হইল এবং সর্ব্বধনের আকর সেই স্পর্শমণি লইয়া স্বদেশ-যাত্রা করিল।

পথে যাইতে যাইতে জীবন ভাবিতে লাগিল, কি অদ্ভুত লোক এই সনাতন! রাজচক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত যে স্পর্শমণি পাইবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত, যাহা লাভ করিলে পৃথিবীর ধনরত্নের দ্বার উন্মুক্ত হয়, সেই স্পর্শমণি স্পর্শ করা ত দূরের কথা, অতি অবহেলার সঙ্গে দেখাইয়া দিল! নিশ্চয়ই তাহা হইলে সনাতনের নিকট স্পর্শমণি অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট কোন রত্ন আছে। সেই রত্ন কি তাহা আমি না জানিয়া ত স্বদেশে যাইতে পারি না। যে ব্যক্তি স্পর্শমণির লোভ হেলায় ত্যাগ করিতে পারে, সে ব্যক্তি মানুষ না দেবতা! আমি কোন মতেই এই মহা-পুরুষের চরণ ছাড়িব না। ইত্যাকার নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে বটেশ্বর নামক গ্রাম হইতে জীবন আবার বৃন্দাবনাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াই জীবন সনাতনের চরণযুগল ধরিয়া বলিল, "ঠাকুর! আমি অতি অধম, অতি হীন, আমাকে দয়া করিয়া উদ্ধারের পথ বলিয়া দাও।" সনাতন বলিলেন, "তোমাকে উদ্ধারের পথ আর কি বলিব?" সনাতনের কথা শুনিয়া জীবন যমুনার সেই খরস্রোতে স্পর্শমণিখানি নিক্ষেপ করিল। এবার সনাতন বুঝিলেন, জীবন সত্য সত্যই ত্যাগ করিতে শিখিয়াছে। তখন সনাতন জীবনকে আপন বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিতে লাগিলেন। মহালুব্ধ আজ কৌপীনধারী বৈষ্ণবে পরিণত হইল। তদবধি জীবনের বংশাবলী বৈষ্ণব-আচার প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে।

এদিকে কাশীধাম হইতে শ্রীচৈতন্য পুণ্যতীর্থ প্রয়াগধামে আগমন করিলেন। এখানে সনাতনের সহোদর রূপের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ-কার হইল। রূপ শ্রীচৈতন্যের পদপ্রান্তে পড়িয়া কিছু উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। শ্রীচৈতন্য রূপকে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া নিজে নীলাচলাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং রূপকে শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া ভক্তি-

তত্ত্ব-প্রচারে যত্নবান হইতে আজ্ঞা দিলেন। বৃন্দাবনে রূপের সহিত সনাতনের শুভ মিলন হইল।

কিছুদিন বৃন্দাবনে থাকিয়া রূপ গোস্বামী কৃষ্ণলীলা-সম্বন্ধীয় কয়েক খানি নাটক লেখেন। তৎপরে তাঁহার সহোদর বল্লভকে সঙ্গে লইয়া তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন-মানসে গৌড়দেশে আগমন করেন। কিন্তু নবদ্বীপে পৌঁছিয়া তিনি শুনিতে পান যে, মহাপ্রভুর ভক্তগণ সকলেই গৌরাঙ্গ-দর্শন-মানসে নীলাচলে যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীরূপ কি আর থাকিতে পারেন? মহাপ্রভুর বিরহ-যন্ত্রণা ভক্ত রূপ আর কতদিন সহ্য করিতে পারেন? তিনিও নীলাচলাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে যেখানে বিশ্রাম করেন সেইখানে বসিয়া নাটক লেখেন। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ ও দ্বারকা-লীলা বর্ণন করিয়া তিনি অতিসুন্দর একখানি নাটক সমাপ্ত করিয়া ফেলিলেন।

নীলাচলে হরিদাসের আশ্রম। নীলাচলে উপস্থিত হইয়া রূপ হরিদাসেরই আতিথেয়তা গ্রহণ করিলেন। মহাপ্রভু এই আশ্রমে প্রায় প্রতিদিনই আসিতেন, এইখানে মহাপ্রভুর সহিত রূপের সাক্ষাৎকার হইল। রূপ তাঁহাকে নাটকের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া শুনাইলেন। নাটকের রচনা-ভঙ্গী ও পদলালিত্যশ্রবণে মহাপ্রভু সাতিশয় পুলকিত হইলেন এবং রূপের নাট্যনৈপুণ্যের অতীব প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। তখন রথযাত্রার সময় বলিয়া পুরীধামে বহু গৌরভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। মহাপ্রভু স্বয়ং ভক্তবৃন্দের সহিত রূপকে পরিচিত করিয়া দেন। রায় রামানন্দ প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানবিদ্ ভক্তবৃন্দ রূপের নাট্যপ্রতিভা-দর্শনে বিমুগ্ধ হন। মহাপ্রভু তাঁহাকে পুনরায় বৃন্দাবনে যাইয়া নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করেন।

এই সময়ে হরিদাসের আশ্রমে মণি-কাঞ্চন-সংযোগ হইল। সনাতনও

বৃন্দাবন হইতে গৌর-দর্শনাশায় নীলাচলে আসিয়া হরিদাসের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। হরিদাস যথোচিত সমাদরপূর্ব্বক তাঁহার সেবা ও সৎকার করিলেন। কিন্তু সনাতনের আর এক বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে খোস, পাঁচড়া, চুলকনা হইয়াছিল। তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথের রথচক্রের তলদেশে পড়িয়া জীবনলীলা শেষ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। হরিদাস তাহা জানিতে পারিয়া বলিলেন, "ভাই হে! যদি প্রাণত্যাগ করিলেই শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমি অনেকদিন পূর্ব্বেই জীবন-ত্যাগ করিতাম। জীবন রাখিয়া সাধনা ও ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে।" হরিদাসের আশ্রমেই শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত সনাতনের সাক্ষাৎকার হইল। সনাতনকে মহাপ্রভু যখন গাঢ় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিতে যাইতেছিলেন, তখন সনাতন বলিলেন, "আমি অতিহীন, নীচ, আমার সর্ব্বাঙ্গে খোস, পাঁচড়া, আমাকে স্পর্শ করিবেন না।" কিন্তু আচণ্ডালে প্রেমদাতা শ্রীগৌরাঙ্গ কি কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারেন? তিনি সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সনাতনের অঙ্গের সমস্ত কণ্ডূয়ন মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় লুকাইয়া গেল! তিনি কিছুকাল নীলাচলে অবস্থান করিয়া মহাপ্রভুর নির্দ্দেশমত ভক্তিশাস্ত্র রচনার মানসে পুনরায় বৃন্দাবনে চলিয়া আসিলেন। বৃন্দাবনে আসিয়া তাঁহারা বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেন, সেগুলির উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

রূপ ও সনাতন দুই ভ্রাতা জীবনের শেষদশা পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে থাকিয়া ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মকে তথায় স্থায়ী করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের তিরোধানের পর তাঁহাদের কনিষ্ঠ সহোদর বল্লভের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতৃপদ গ্রহণ

করিয়াছিলেন। জীব গোস্বামীও ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কতকাল হইল, রূপ-সনাতন ও জীব গোস্বামী তিরোহিত হইয়াছেন; কিন্তু বৃন্দাবনের প্রতি তরুলতা তাঁহাদের নাম আজিও বায়ু-হিল্লোলে কীর্ত্তন করিতেছে। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব কখনও বৃন্দাবনে যান নাই, তবুও বৃন্দাবন যে বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পীঠস্থানরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহার হেতু রূপ-সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামী।

——:০:——

হরিদাস

শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণের মধ্যে যেমন নিত্যানন্দ অগ্রগণ্য, তেমনি হরিদাসও তদপেক্ষা বড় ন্যূন নহেন। হরিদাসের জীবনের ও সাধনের বিশেষত্ব এই যে, তিনি জাতিতে মুসলমান হইলেও হিন্দুর আরাধ্য দেবতা শ্রীহরিতেই মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। সাধকের দৃষ্টিতে ভগবান এক বৈ দ্বিতীয় নহে! যে যেভাবেই তাঁহাকে প্রাণমন দিয়া ডাকুক না কেন, তিনি তাঁহার সে আকুল প্রার্থনা শ্রবণ করেন, ইহা প্রহ্লাদ, ধ্রুব হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগের রামপ্রসাদ হইতে রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহা সাধকগণ প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। ভগবানকে গড, খোদা, আল্লা, হরি, জিহোভা, জোভ, তারা—তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা বলিয়া ডাক না কেন, যদি সে ডাক প্রকৃত হয়, তাহা হইলে ভগবানের কর্ণে তাহা পৌঁছিবেই পৌঁছিবে। এই জন্য ভক্তিশাস্ত্র বলেন, ভক্তিরাজ্যে জাতিভেদ নাই, ভগবানকে ভক্ত যেভাবে ইচ্ছা ডাকিতে পারে, পূজা করিতে পারে। মানুষ এই সহজ সত্যটুকু বুঝে না বলিয়াই আমার ধর্ম্ম বড়, তোমার ধর্ম্ম ছোট, আমার ধর্ম্মশাস্ত্র মান, তবে ভগবানকে পাইবে, নতুবা পাইবে না, ইত্যাকার নানা প্রকার সঙ্কীর্ণতামূলক কথা বলিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত সাধকের কথা তাহা নহে।

হরিদাস জাতিতে যবন ছিলেন। যবনের পক্ষে হরিনাম কীর্ত্তন এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার বলিলেই হয়; কিন্তু সাধক হরিদাস এই অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সমাজে তিনি যে অপ্রতিদ্বন্দ্ব কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর।

সে ১৩৭১ শকাব্দের কথা। জেলা যশোহরের অন্তঃপাতী "বুড়েন" নামক গ্রামে হরিদাস জন্মগ্রহণ করেন। যে সময়ে হরিদাসের জন্ম হয়, তখন বাঙ্গালীর ধর্ম্মজগতের ইতিহাস অতিশয় মসীময় ছিল। তান্ত্রিক, বামাচারী ও কাপালিকগণ বৈদিক ধর্ম্মের নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া মদ্যপান, নরবলি, শ্মশান-সাধনা প্রভৃতিকে ধর্ম্মের প্রকৃত সাধন মনে করিয়াছিল। বৈষ্ণবধর্ম্ম ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের এই সংঘর্ষের দিনে ভক্ত হরিদাস জন্মপরিগ্রহ করেন। যাঁহার প্রাণে হরিনামের বীজ একবার উপ্ত হয়, হরিনাম গান করিয়া কৈবল্যলাভ যাঁহার জীবনের মুখ্য মন্ত্র হয়, সংসারের কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া বৃথা পার্থিব ধনৈশ্বর্য্যের মোহ-মদিরায় ডুবিয়া থাকিতে কি তাঁহার প্রাণ চাহে? তাই হরিদাসের মনে যেদিন হইতেই এই প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, সংসারে হরিনামই একমাত্র সার, আর সকলই অসার, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনগ্রামের নিকট বেনাপোলের এক নিভৃত অরণ্যে একটী পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া হরিনামামৃত-পানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেকে বলেন, যাহারা দুর্ব্বলচিত্ত, তাহারা সংসারের কোলাহলে ভীত হইয়া নির্জ্জন স্থানে গিয়া উপাসনা আরম্ভ করেন; কিন্তু ইহা সত্য নহে। সাধনের প্রথম অবস্থায় চিত্তের একাগ্রতা-সাধনের জন্য এইভাবে নির্জ্জন স্থানে গিয়া ধ্যান-ধারণা করা আবশ্যক। তার পর চিত্তের একাগ্রতা আসিলে কানের নিকট ঢক্কা-নিনাদ করিলেও তাহার চিন্তা অন্যদিকে আকৃষ্ট হয় না। তবে হরিদাসের সাধনার একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। হরিদাস নির্জ্জন কুটীরে অবস্থান করিলেও কখনও মনে মনে হরিনাম জপ করিতেন না। শাণ্ডিল্য-সূত্র বলেন—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

অর্থাৎ সাধনার প্রাথমিক অবস্থায় ভক্তকে ভগবানের নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, তাঁহার পূজা, অর্চ্চনা, বন্দনা করিতে হয়। তাহা হইতে ক্রমে দাস্যাসক্তি, সখ্যাসক্তি আসিয়া ভক্ত আত্মনিবেদনাসক্তি বা রাগাত্মিকা ভক্তির চরম সীমায় উপস্থিত হয়।

কিন্তু সুগন্ধি পুষ্প গহন বিপিনে প্রস্ফুটিত হইলেও কি তাহার গন্ধ কখনও সেই বিপিনেই আবদ্ধ থাকে? তাহা কি মৃদুমন্দ পবন-হিল্লোলে গ্রাম-জনপদে বিস্তৃত হইয়া গন্ধলোলুপ মানবের মনপ্রাণ শীতল করে না? কিংবা তাহা কি মধুমত্ত অলিকুলকে আকৃষ্ট করে না? সূর্য্য কতক্ষণ আপনার প্রভা চাপিয়া রাখিতে পারে? বেনাপোলের গহন অরণ্যে এক সাধুর আবির্ভাব হইয়াছে, সে সাধু দিবানিশি হরিনাম করে, হরিনাম ভিন্ন সে সাধু অন্য কিছু জানে না, এ সংবাদ ক্রমে ক্রমে সকলের কর্ণে পৌঁছিতে লাগিল। ফলে বহু লোক তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া তাঁহার কুটীর-সন্নিধানে উপস্থিত হইতে লাগিল। হরিদাস স্বভাবতই অল্প কথা বলিতেন, কাজেই যাঁহারা তাঁহার নিকট ভক্তি-সম্বন্ধীয় বহু কথা শুনিবার জন্য যাইতেন, তাঁহাদিগকে বিফলমনোরথ হইয়া আসিতে হইত। তিনি কেবল বলিতেন, "তোমরা হরিনাম কর"। কিন্তু এই একটী বাক্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের প্রাণে এমনই ভাবে বদ্ধমূল হইত যে, তাঁহারা আর সে নাম ভুলিতে পারিতেন না। সকলে হরিনামই সার করিতেন। হরিদাস সন্ন্যাসী ছিলেন, তাই তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া এক বেলা প্রসাদ পাইতেন মাত্র। তাঁহার গুণমুগ্ধগণ যে সমস্ত ফলমূল তাঁহাকে উপহার দিত, তিনি সে সমস্ত বালক-বালিকাগণের মধ্যে বিতরণ করিতেন।

সেই সময় বনগ্রামে রামচন্দ্র খাঁ নামে এক মহা অত্যাচারী জমিদার বাস করিত। তাহার অত্যাচারে বনগ্রামের আপামর-সাধারণ

যৎপরোনাস্তি উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হরিদাসকে লোকে এত শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, আর তাহার নাম স্মরণ করিয়া লোকে ঘৃণায় নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করে, এই চিন্তা রামচন্দ্রের নিকট দুর্ব্বিষহ বলিয়া অনুমিত হইল। সে হরিদাসকে জব্দ করিবার ও লোকসমাজে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে স্থির করিল, বারাঙ্গনা পাঠাইয়া হরিদাসের ধ্যান-ধারণা ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে কামুক লম্পট প্রতিপন্ন করিতে পারিলে আর কেহ তাঁহার নিকট যাইবে না, সকলে তাঁহাকে "ভণ্ড" "জুয়াচোর" বলিয়া মাথা মুড়াইয়া গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। রামচন্দ্রের যাহা কল্পনা, কার্য্যও তাহাই। সে চর পাঠাইয়া কয়েকজন রূপসী পণ্যাঙ্গনা স্থির করিল। তন্মধ্যে এক দিব্যাভরণা, ষোড়শী, রূপসী বারাঙ্গনা বলিল যে, সে নিশ্চয়ই হরিদাসের মন টলাইতে পারিবে; তাহা যদি না পারে, তবে বৃথা তার রূপ-যৌবন, বৃথা তার রূপের বড়াই।

একদিন গোধূলি-সময়ে দিনমণি অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইয়াছেন। দিবাশ্রান্ত বিহগকুল পক্ষ মেলিয়া আপনাপন কুলায়াভিমুখে প্রস্থান করিতেছে, বাপীতটে আসন্ন রজনীর ধূসর ছায়া অশ্বত্থ বটবৃক্ষের উপর পড়িয়া ভাবী ভীষণতার পরিচয় দিতেছে। গৃহে গৃহে পুরাঙ্গনাগণ মঙ্গল-শঙ্খ বাজাইয়া সন্ধ্যাদেবীর আবাহন করিতেছেন, মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা-কাঁসরের শব্দ পল্লীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। এমন সময় সেই "দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী" নানারূপ অলঙ্কার ও বিবিধ কারুকার্য্য-খচিত বসনে বিভূষিত হইয়া বেনাপোলের সেই নির্জ্জন কুটীরে গিয়া হাসিতে হাসিতে উপস্থিত হইল। হরিদাস তখন হরিনাম-জপে বিভোর। তিনি লক্ষ জপ না করিয়া কখনও জলগ্রহণ করিতেন না। হরিদাস একে সুপুরুষ, তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় তাঁহার দেহের বর্ণ।

তদুপরি কঠোর সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে এতদূর পবিত্র ও মধুময় করিয়াছে যে, যে কেহ তাঁহার দিকে তাকায় সে কিছুক্ষণ অনিমেষনেত্রে সে দিকে না তাকাইয়া থাকিয়া কিছুতেই মুখ ফিরাইতে পারে না। এ হেন হরিদাসের সম্মুখে গিয়া সেই বার-বনিতা একেবারে বিভোর হইয়া গেল। সে আর আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া স্পষ্ট করিয়া হরিদাসের নিকট মনের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। হরিদাস যুবতীর কথা শুনিয়া বলিলেন, "তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি নামজপ ব্রত গ্রহণ করিয়াছি; নাম-জপ সমাধা হইলেই আমি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব।" যুবতী ভাবিল, সত্যই বুঝি হরিদাস তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবে। আহা! এই কার্ত্তিকের মত পুরুষ-রতনের সহিত দৈহিক সংযোগ করিতে পারিলে না জানি তাহার কি সুখই হইবে! সে এই আশাতেই কুটীরদ্বারে চুপ করিয়া থাকিল। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া এক প্রহর রাত্রি হইল। চারিদণ্ডের অন্ধকার হইতে মুখ অপসারিত করিয়া চন্দ্রদেব গগন-মণ্ডলে প্রকাশিত হইলেন। অসংখ্য তারকারাজি তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ঝিকিমিকি করিতে লাগিল। হরিদাসের নির্জ্জন কুটীরের মধ্যে সেই স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণ পড়িয়া তাঁহার স্বভাব-সুন্দর মুখমণ্ডলকে আরও জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিল। যুবতী আর কতক্ষণ আত্মসংযম করিতে পারে? সে পুনরায় মুখ ফুটিয়া বলিল, "কৈ ঠাকুর! আমার মনস্কামনা কি পূর্ণ করিবে না?" হরিদাস বলিলেন, "আমার এখনও নামজপ শেষ হয় নাই, নামজপ শেষ হইলেই তোমার আশা পূর্ণ করিব।" ক্রমে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল। হরিদাসের কোন দিকেই দৃক্‌পাত নাই, একমনে শুধু নামজপই করিতেছেন। এদিকে কিন্তু সেই সুন্দরী বাণ-বিদ্ধা কুরঙ্গিণীর মত কামাহতা হইয়া ছট্‌ ফট্‌ করিতে লাগিল। দ্বিপ্রহর

রজনী, দিবসের শ্রান্ত ক্লান্ত নরনারী এখন গভীর সুষুপ্তির ক্রোড়ে শায়িত। মধ্যে মধ্যে কোথাও কোন সারমেয়ের "ঘেউ" "ঘেউ" শব্দ মাত্র প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। সুশীতল বসন্ত সমীরণ আসিয়া কুটীরের অভ্যন্তরে অমিয়ধারা বর্ষণ করিতেছে। এমন নৈসর্গিক নিস্তব্ধতার সময়ে দেহজীবা পণ্যাঙ্গনা আর কতক্ষণ হৃদয়ে বল ধরিয়া তৃষিতা চাতকীর ন্যায় উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিতে পারে? সে পুনরায় হরিদাসের নিকট আপন অসৎ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। হরিদাস এবারও ইঙ্গিতে তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া নামজপে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে যামিনীর অবশিষ্ট যামসমূহ অতিবাহিত হইল। মৃদুমন্দ প্রাভাতিক সমীরণ আসন্ন উষার শুভ আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিল। কাননে কাননে বিহঙ্গমকুল কাকলী করিয়া সুপ্ত জগৎকে গাত্রোত্থান করিবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিল। ক্রমে প্রাচী ললাটে বাল ভানুর অস্পষ্ট ক্ষীণালোক দেখা দিল। বারাঙ্গনা দেখিল, হরিদাস তখনও নামজপে সমাধিস্থ। নিরাশার অঙ্কুশে আহতা হইয়া এবং আপন রূপ-যৌবনকে শতবার ধিক্কার দিয়া সে রামচন্দ্র খাঁয়ের নিকট গিয়া রাত্রিকার সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। রামচন্দ্র শুনিয়া বিস্মিত হইল, কিন্তু সঙ্কল্পে শিথিল হইল না।

পরদিন আবার সন্ধ্যা সমাগমে সেই পণ্যাঙ্গনা দিব্যাভরণা হইয়া রূপের গর্ব্বে পদভরে মেদিনী বিকম্পিত করিয়া হরিদাসের কুটীরে উপস্থিত হইল। যাইয়া দেখে প্রভু হরিদাস পূর্ব্বদিনের ন্যায় নামজপে নিমগ্ন। যুবতী বলিল, "ঠাকুর! গত কল্য আমি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছি, আজ আর আমায় নিরাশ করিও না।" হরিদাস বলিলেন, "কখনই না, তুমি বস, আমি নামজপ শেষ করিয়াই তোমার আশা চরিতার্থ করিব।" ক্রমে পূর্ব্ব রাত্রের ন্যায় একপ্রহর দ্বিপ্রহর করিয়া

যামিনী প্রভাতা হইল, হরিদাসের নামজপ শেষ হইল না। বারাঙ্গনা এদিনও হতাশ হইয়া চলিয়া গেল। রামচন্দ্র খাঁয়ের নিকট অতঃপর সে সকল ঘটনা বিবৃত করিল। রামচন্দ্র অবাক্ হইল, কিন্তু তবু সঙ্কল্প-চ্যুত হইল না।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যাতেও সেই বারাঙ্গনা নানাবিধ অলঙ্কারে সুশোভিত হইয়া হরিদাসের কুটীরে সমুপস্থিত হইল। যাইয়া দেখে হরিদাস ধীরে ধীরে নাম সংকীর্ত্তন করিতেছে। আজ আর বারাঙ্গনার সে উদ্দাম পশুভাব নাই। আজ সে হরিদাসের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে নাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল। তাহার নয়নদ্বয় দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, আমি কি পাপীয়সী, ঘোর নরকেও বুঝি স্থান হইবে না। যে ব্যক্তি এত জিতেন্দ্রিয়, মহাপুরুষ, হরিনাম ছাড়া যে জীবনে আর কিছুই জানে না, আমি কুলটা হইয়া তাহার পবিত্র জীবনে কালিমা লেপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম! হায়! হায়! এই দেহ যদি বৃথা ক্ষণিক ভোগ ও তৃপ্তির জন্য অতিবাহিত না করিয়া ভগবানের জন্য সমর্পণ করি, তাহা হইলে না জানি কত সুখ কত আরাম পাইব! ইত্যাকার নানারূপ ভাবিতে ভাবিতে সেই যুবতী হরিদাসের পাদপদ্মে ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় পতিত হইল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "আমি অতি পাতকী, আমার উদ্ধারের উপায় বলিয়া দাও ঠাকুর!"

হরিদাস বলিলেন, "দেখ আমি তোমার পরিত্রাণের জন্যই আজ তিন দিন এখানে অপেক্ষা করিতেছি। এখন তুমি পরিবর্ত্তিত হইয়াছ, তোমার জীবনের ময়লা কাটিয়া গিয়াছে, আর তুমি লোকালয়ে গিয়া পাপবৃত্তি অবলম্বন করিও না। নিশিদিন হরিনামে অতিবাহিত কর, শ্রীহরি তোমার মুক্তির পথ প্রদর্শন করিবেন।" এই বলিয়া হরিদাস

সে কুটীর ত্যাগ করিলেন, আর সেই কুটীর-দ্বারে বসিয়া সেই রমণী আত্মহারা হইয়া হরিনাম জপ করিতে লাগিল। একদিন যাহার মুখারবিন্দের দিকে তাকাইলে লোকের প্রাণ মদনের তাড়নায় মথিত হইয়া উঠিত, আজ সেই রমণীর মুখের দিকে তাকাইবা মাত্র সকলের শির আপনা হইতে তাহার পদতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

"কীর্ত্তন করিতে ঐছে রাত্রি শেষ হৈল।
ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি গেল॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুর চরণে।
রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে॥
বেশ্যা হঞা মুঞি পাপ করেছি অপার।
কৃপা করি কর মো অধমের নিস্তার॥
ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ সেই তারে দুঃখ নাহি মানি॥
সেই দিন যাইতাম এস্থান ছাড়িয়া।
তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া॥

* * * *

তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহ বৃত্তি যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল॥
মাথা মুড়ি এক বস্ত্রে রহিল সে ঘরে।
রাত্রে দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে॥"

—চৈতন্যচরিতামৃতম, অন্ত্যখণ্ড।

সংসারে দুর্ব্বৃত্ত ও অত্যাচারী যে সে পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিফলে দু' দিনের জন্য প্রভাব-প্রতিপত্তি ভোগ করিলেও, ইহজন্মের কৃতকর্ম্মের

ফল তাহাকে সদা সদাই ভোগ করিতে হয়। শাস্ত্রে আছে, তিনবর্ষে হউক, তিন মাসে হউক অথবা তিন দিনেই হউক মানুষ উৎকট পাপের ফল এই সংসারেই ভোগ করিয়া থাকে। দুর্ব্বৃত্ত রামচন্দ্র অপ্রতিহত প্রভাবে বনগ্রামে জমিদারী করিতেছিল, হয়, হস্তী প্রভৃতি রাজকীয় বিলাস-সম্ভারও তাহার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু নির্দ্দোষ, নিরপরাধ, সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি এরূপ অনাচার অন্তর্য্যামী ভগবানের নিকট কি অবিদিত থাকে? তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইলেও, তাঁহার এমনই বিধান যে, মানুষকে আপনাপন কৃতকর্ম্মের ফল আপনা হইতেই ভোগ করিতে হইবে। দুর্ব্বৃত্ত রামচন্দ্র ভাবিয়াছিল যে, এইরূপ অত্যাচার অবিচারের মধ্য দিয়াই সে তাহার পাপরাজ্য চালাইতে পারিবে, কিন্তু তাহার পাপের বোঝা যে, দিন দিন ভারী হইয়া আসিতেছিল, ইহা সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবে নাই। সে সামান্য জমিদারীর মালিক হইয়া শুধু যে কেবল প্রজাবর্গকে তৃণবৎ মনে করিত তাহা নহে, যে নবাবের অধীনে সে জমিদারী ভোগ করিত সেই নবাব-সরকারেও রীতিমত বার্ষিক রাজস্ব প্রদান করিত না। ফলে নবাব তাহাকে বন্দী করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নবাবের সৈন্যগণ রামচন্দ্রের বাটীতে পড়িয়া তাহার বাটী লুটপাট করিল, নিষিদ্ধ গো-মাংসাদি রন্ধন করিয়া তাহার বাটীর বিশুদ্ধতা বিনষ্ট করিল, তার পর আর কি—সপরিবার রামচন্দ্রকে বন্দী করিয়া নবাবের নিকট লইয়া গেল।

এদিকে হরিদাস সাধু সেই বারাঙ্গনাকে মুক্তি-বেদীতে উপবিষ্ট করাইয়া শান্তিপুরে গমন করিলেন। তখনও ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গ দেহপরিগ্রহ করিয়া নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন নাই। শান্তিপুরে অদ্বৈত মহাপ্রভু মাত্র প্রভুর আগমনের অপেক্ষা করিতেছেন। এমন সময়

"হরেকৃষ্ণ" বলিতে বলিতে হরিদাস বাবাজী অদ্বৈতের আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্তের মহিমা ভক্তে জানে, জহুরী যে সেই খাঁটি হীরা, চুনি, মণি, মুক্তা চিনিতে পারে। অদ্বৈতাচার্য্য হরিদাসকে দেখিয়াই বুঝিলেন, এইবার একজন খাঁটি ভক্ত শান্তিপুরে আগমন করিয়াছেন। অথবা ইহাও বুঝিলেন, রাজা যেমন প্রজার বাটীতে যাইবার প্রাক্কালে পূর্ব্বাহ্নে ভোজ্যসম্ভারাদি প্রেরণ করেন, তেমনি মহাপ্রভু আবির্ভাবের পূর্ব্বে বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিবার জন্য হরিদাস-প্রমুখ ভক্তদিগকে প্রেরণ করিতেছেন। হরিদাসের জন্য অদ্বৈতাচার্য্য একটি স্বতন্ত্র গোফা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। রাত্রিতে হরিদাস সেই গোফায় থাকিতেন, আর পূর্ব্বাহ্নে বসিয়া আচার্য্যের বাটীতেই হরিদাসের মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাপ্ত হইত। হরিদাস এই গোফায় বসিয়া যে কেবল আপন মনে মধুর হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন তাহা নহে; পথ চলিবার সময়ও তিনি দুই হাত তুলিয়া প্রাণ ভরিয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে যাইতেন।

শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ফুলিয়া গ্রামে হরিদাসের গোফা। এই ফুলিয়া গ্রামে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। হরিদাস জাতিতে যবন হইলেও এই গোফাতে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেন। গ্রামের মধ্য দিয়া হরিনাম করিতে করিতে যাইতেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে দেখিয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন, কখনও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিতেন না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সময় গৌড়ে মুসলমান রাজত্বের সময়। হিন্দু রাজত্বের গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছে, মোগল পাঠানের প্রভাব-রবি সমুজ্জ্বল হইয়া দর্শন দিয়াছে। হিন্দুদের আর সে প্রভাব নাই, সে প্রতিপত্তি নাই, সে শৌর্য্য নাই, সে বীর্য্য নাই, তাহারা অতি ভয়ে ভয়ে, অতি সন্তর্পণে হিন্দুর ক্রিয়া-কর্ম্ম, যাগ-যজ্ঞ, উপাসনা করে। তাহারা

এরূপ হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী যে নিষিদ্ধ মাংস নিক্ষেপ করিয়া হিন্দুর দেবমন্দির কলুষিত করিতে ইতস্ততঃ করে না—হিন্দু পুরনারীগণ তাহাদের ভয়ে প্রদোষে গৃহের বাহির হয় না—হিন্দু বালিকাগণকে আট দশ বৎসর বয়সে অর্থাৎ যৌবন আরম্ভ হওয়ার বহু পূর্ব্বে পাত্রান্তরে দিয়া পিতা নিশ্চিন্ত হয়; এমন কি পাছে হিন্দুকুলকামিনীগণের মুখ দর্শন করিয়া তৎপ্রতি দুর্ব্বৃত্তদের পাপদৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এই ভয়ে অবগুণ্ঠনের দ্বারা তাঁহাদের মুখশ্রী আবৃত করিয়া রাখা হয়। "কাফের" ভিন্ন অন্য কোন অভিধায় তাহারা হিন্দুজাতিকে সম্বোধন করে না। হিন্দু ধর্ম্মের ও হিন্দু জাতির এবম্বিধ লাঞ্ছনার সময়ে সাধক হরিদাসের আবির্ভাব। সুতরাং যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া হরিদাস হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, মুসলমান যে হরির নাম গ্রহণ করিতে পাপ বোধ করে সেই হরির নাম প্রতিদিন তিন লক্ষবার জপ করেন, এ চিন্তা কি মুসলমান কাজির সহ্য হয়? কাজির নাম গোরাই, তাহার ধারণা জগতে মুসলমান ধর্ম্ম ছাড়া আর ধর্ম্ম নাই, আল্লা ছাড়া আর ঈশ্বর নাই, আর অনাচারমূলক মুসলমানী রীতিনীতি ছাড়া উৎকৃষ্টতর রীতি নাই। এই ধারণা লইয়া গোরাই কাজি বিচারাসন সুশোভিত করিতেছিল। আপন দোষে তখন হিন্দুজাতিকে এইরূপ কাজির বিচার অবনতমস্তকে মানিয়া লইতে হইতেছিল। গোরাই কাজি সরাসরি মুলুক-পতির নিকট গিয়া বলিল, "জাহাপনা ইস্‌লাম ধর্ম্মের ইজ্জৎ ত আর থাকে না। মুসলমান হইয়া হরিদাস হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। উহাকে শাস্তি না দিলে যে ইস্‌লামের মানমর্য্যাদা যায়! আপনি ধর্ম্মাবতার, এখনই হরিদাসকে ধরিয়া আনিয়া সমুচিত প্রতীকার করুন।"

মুলুক-পতির আদেশে সাধক হরিদাস ধৃত এবং মুলুক-পতির নিকট

নীত ও উপস্থাপিত হইলেন। বন্দী হইলেন বটে, কিন্তু হরিনাম ভুলিলেন না। সংসারে যাহার মন স্বাধীন, তাহাকে কে বন্দী করিয়া রাখিতে পারে? মানুষের নির্ম্মিত লৌহশৃঙ্খল মানুষের দেহকে অষ্টবন্ধনে বাঁধিতে পারে সত্য; কিন্তু যাঁহার মন স্বাধীন তিনি সেই বাহ্যিক বন্ধনাবস্থাতেও মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত চিন্তা-রাজ্যে উড়িয়া বেড়ান। সাধক হরিদাসও তাহাই। মুলুক-পতি হরিদাসকে সরাসরি কারাগারে প্রেরণ করিলেন। কারাগারে আরও অনেক বন্দী ছিল, তাহারা হরিদাসের নাম পূর্ব্বাহ্ণেই শুনিয়াছিল। তাহারা আসিয়া হরিদাসকে অভিবাদন জানাইল। হরিদাস তাহাদিগকে "আনন্দে রহো" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহারা প্রথমে হরিদাসের আশীর্ব্বাদের মর্ম্ম না বুঝিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছিল, তার পর যখন বুঝিল হরিদাস তাহাদিগকে মনের আনন্দে থাকিবার জন্য আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তখন তাহারা আশ্বস্ত হইল। ব্রাহ্মণাদি সকল সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সম্মানিত সাধক হরিদাস আজ হিন্দুদ্বেষী মুলুক-পতির বিচারে দস্যু-তস্করের সম-পর্য্যায়ভুক্ত হইলেন। ক্রমে হরিদাসের বিচারের দিন সমুপস্থিত হইল। ভক্ত হরিদাসের প্রতি কি শাস্তি বিহিত হয় তাহা দেখিবার জন্য বিচার-গৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। মুলুক-পতি বিচারাসনে বসিয়া লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হরিদাসকে আপন সকাশে আনিতে আদেশ করিলেন। হরিদাস আনীত হইলেন। মুলুক-পতি তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বসিবার আসন প্রদান করিলেন। হরিদাস উপবেশন করিলেন। অতঃপর যথোচিত বিনয়ের সহিত মুলুকপতি হরিদাসকে বলিলেন, "অতি ভাগ্যবলে তুমি মুসলমান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, পৃথিবীতে যদি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কিছু থাকে, তবে তাহা মুসলমান ধর্ম্ম। তুমি এমন সুমহান্ ধর্ম্ম ছাড়িয়া কেন হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ? ইহাতে যে মুসলমান সমাজের মুখ

ছোট হয়। তোমার উপর ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন ঈর্ষ্যা বা বিদ্বেষ নাই, কেবল অনুরোধ এই, আজই হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় মুসলমান হও, নতুবা বিচারে তোমাকে কঠোর শাস্তি পাইতে হইবে।"

মুলুক-পতির কথা শুনিয়া হরিদাস বলিলেন, "শুন বাপ! একই ভগবানকে হিন্দু এক নামে, আর মুসলমান অন্য নামে আবাহন করে। ভগবানকে যে যেভাবেই ডাকুক তাহাতে ভগবৎ-সত্তার বিন্দুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। বেদে ও কোরাণে পার্থক্য নাই। ধর্ম্ম হৃদয়ের জিনিষ, যাহার যে ধর্ম্মে প্রাণ নিবিষ্ট হয়, তাহাকে সেই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিতে দেওয়া ধীমান্ পুরুষের কর্ত্তব্য। কোন হিন্দু যদি মুসলমান হয়, তবে হিন্দুরা তাহাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করে না, কেবল মুসলমানের বেলায় এরূপ সঙ্কীর্ণতা দেখিতে পাই। হিন্দুধর্ম্মের এত উদারতা আছে বলিয়াই তোমাদের এত অত্যাচার সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম্ম এখনও স্থাণুর ন্যায় অচল ও অটল।"

"বলিতে লাগিলা তারে মধুর উত্তর।
শুন বাপ! সভারই একই ঈশ্বর॥
নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥
এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হই বৈসে সভার হৃদয়॥
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন।
সেই মত কর্ম্ম করে সকল ভুবন॥
সে প্রভুর নাম-গুণ সকল জগতে।
বোলেন সকল মাত্র নিজ শাস্ত্রমতে॥

যে ঈশ্বর সেহুঁনি সভার ভার লয়।
হিংসা করিলেও সে তাহান হিংসা হয়॥
এতেক আমাকে সে ঈশ্বর যে হেন।
লওয়াইছেন চিত্তে করি আমি তেন॥
হিন্দুকুলে কেহো যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনেই গিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥
হিন্দু বা কি করে তারে যার যেই কর্ম্ম।
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম্ম॥
মহাশয়! তুমি এবে করহ বিচার।
যদি দোষ থাকে শাস্তি করহ আমার॥"

—শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত।

উপস্থিত যবনেরা হরিদাসের সত্য কথা শুনিয়া প্রীত হইল বটে, কিন্তু কাজি সন্তুষ্ট হইল না। কাজি মুলুক-পতিকে বলিতে লাগিল, "এই দুষ্টপ্রকৃতি লোক যদি শায়েস্তা না হয়, তাহা হইলে এই দুষ্ট আরও অনেক লোককে দুষ্ট করিয়া ফেলিবে।" মুলুক-পতি বলিলেন, "হরিদাস তুমি যদি হরিনাম না ছাড়, তাহা হইলে তোমার কঠোর শাস্তি হইবে।" হরিদাস বলিলেন—

"খণ্ড খণ্ড করি দেহ যদি যায় প্রাণ।
তভো আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"

মুলুক-পতি হরিদাসের দৃঢ় বাক্য শ্রবণ করিয়া কাজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অতঃপর ইহার কি ব্যবস্থা করা যাইবে?" কাজি বলিল, "ইহাকে বাইশ বাজারে লইয়া গিয়া ইহার প্রাণদণ্ড করাই সমুচিত।" তখন মুলুক-পতি পাইকসকলকে ডাকিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,

"এখনই এই দুষ্ট দুর্ম্মতিকে লইয়া বাইশ বাজারে ঘুরাইয়া এমন ভাবে প্রহার করিবে যে, কিছুতেই যেন ইহার প্রাণ না থাকে।" মুলুক-পতির আজ্ঞামত পাইকেরা হরিদাসকে লইয়া বাইশ বাজার ঘুরাইয়া অতি নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিতে লাগিল। যাহারা দয়াদ্রহৃদয়, তাহারা এইরূপ নির্ম্মম ও নৃশংস প্রহার দেখিয়া শোকে ও দুঃখে জর্জ্জরিত হইল। আর যাহারা দুর্জ্জন, পরের দুঃখেই যাহাদের আনন্দ হয়, তাহারা হরিদাসের প্রহারে বরং আনন্দই অনুভব করিতে লাগিল। হরিদাসের শরীর প্রহারে জর্জ্জরিত হইল, দরবিগলিত ধারায় রুধির-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু তথাচ হরিদাসের প্রাণে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা নাই, তিনি কেবল শ্রীহরিকে ডাকিতেছেন, আর যুক্তকরে প্রহারকারীদের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছেন।

"এসব জীবেরে কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ সভার অপরাধ॥"

পাইকেরা প্রাণপণ শক্তিতে হরিদাসকে প্রহার করিতেছে, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় ভক্ত হরিদাস তবুও মরেন না; দেখিয়া পাইকেরা প্রমাদ গণিল। তাহারা হরিদাসকে মুহুমুহু বলিতে লাগিল, "আপনাকে একেবারে প্রাণে মারিয়া ফেলাই মুলুক-পতির আদেশ; আমরা যদি আপনাকে মারিতে না পারি, তাহা হইলে মুলুক-পতি আমাদের উপরই কঠোর দণ্ডের বিধান করিবেন। কিন্তু আপনার দেহ কি কঠিন, এত বেত্রাঘাতের উপর বেত্রাঘাত করিতেছি, তথাপি আপনার দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইতেছে না।" পাইকগণের কথা শুনিয়া হরিদাসের হৃদয় দ্রবীভুত হইল। সত্যই ত, যদি তাঁহার জন্য দরিদ্র পাইকগণের চাকুরী যায়, তাহা হইলে তাহারা যে অন্নাভাবে অনশনে প্রাণত্যাগ করিবে। আবার না জানি দুষ্ট মুলুক-পতিই বা তাহাদের উপর কি শাস্তির বিধান

করিবে! দরিদ্র পাইকগণের অবস্থা স্মরণ করিয়া হরিদাসের প্রাণ করুণায় ভরিয়া উঠিল। তিনি পাইকগণকে বলিলেন, "তোমরা আশ্বস্ত হও, আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিতেছি।" এই বলিয়া হরিদাস যোগবলে দেহ ত্যাগ করিয়া ভূমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। বাহ্য দৃষ্টিতে তাঁহার দেহ মৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার অবিনাশী আত্মা ততক্ষণে লোকলোচনের অন্তরালে এক মহানন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। যাঁহারা জীবন্মুক্ত পুরুষ তাঁহারা এইভাবে ইচ্ছামত দেহত্যাগ করিয়া আবার স্বদেহে ফিরিয়া আসিতে পারেন। হরিদাসকে মৃত মনে করিয়া পাইকেরা তাঁহাকে মুলুক-পতির নিকট লইয়া গেল, মুলুক-পতি হরিদাসের দেহ পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, সত্য সত্যই হরিদাস মরিয়াছেন। তিনি হরিদাসকে মুসলমানী প্রথানুসারে সমাধি দিবার জন্য আদেশ করিলেন; কিন্তু গোরাই কাজি তাহাতে আপত্তি জানাইয়া বলিল, "তাহা কি হয়? এ ব্যক্তি মুসলমান হইয়া কাফেরের ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিল, সমাধি দিলে এ যে একেবারে স্বর্গলাভের অধিকারী হইবে! তদপেক্ষা ইহাকে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করা হউক, যাহাতে এ ব্যক্তি অনন্ত নরক ভোগ করে।"

গোরাই কাজির প্রস্তাবই টিকিল। হরিদাসকে ধরিয়া পাইকেরা বীচিমালা-বিক্ষোভিত গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিল। জাহ্নবী-সৈকতে দাঁড়াইয়া হরিদাসের ভক্ত ও অনুরক্তগণ হায় হায় করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল, ভগবান মুলুক-পতিকে এই অত্যাচারের প্রতিফল দিবেন, বেটার জমিদারী, তেজারতী যথাসর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইবে। হরিদাস ভাসিতে লাগিলেন, শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড যেমন নদীর তরঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া ভাসিতে থাকে সেইরূপ ভাসিতে লাগিলেন। এতক্ষণ তিনি সংজ্ঞা লোপ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আবার লুপ্ত সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিলেন। তরঙ্গের

তালে তালে নাচিতে নাচিতে হরিদাসের দেহ তটে আসিয়া লাগিল। হরিদাস "হরি" "হরি" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, তীরে যত লোক ছিল, তাহারা দেখে হরিদাস সজীব। সেই বার্ত্তা তৎক্ষণাৎ মুলুক-পতির নিকট পৌছিল, তিনি নদীতটে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে হরিদাসের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর! আমি এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি, আপনি সামান্য লোক নন। ভগবানে বিশ্বাসও আপনার সামান্য নহে। আপনি সিদ্ধ, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, আপনার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যান, আপনি স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়ান, কেহই তাহাতে বাধা দিবে না।"

মুলুক-পতির নিকট বিদায় লইয়া হরিদাস গান করিতে করিতে ফুলিয়া গ্রামে আপন গোফায় চলিয়া গেলেন। সারা গৌড়বাসী বুঝিল, হরিদাস যথার্থই ভক্ত—যথার্থই সাধক।

"চৈতন্য পাইয়া হরিদাস মহাশয়।
তীরে আসি উঠিলেন পরানন্দময়॥
সেইমতে আইলেন ফুলিয়া নগরে।
কৃষ্ণনাম বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে॥"

—শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত।

ফুলিয়া গ্রামের ব্রাহ্মণগণ হরিদাসের অপূর্ব্ব ঐশীশক্তি দেখিয়া ইতিপূর্ব্বেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবার আবার মুলুক-পতির নির্য্যাতনে শ্রীকৃষ্ণে হরিদাসের অদম্য নিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহারা আরও বিমুগ্ধ হইলেন। হরিদাস ফুলিয়া গ্রামে উপস্থিত হইবামাত্র ব্রাহ্মণগণ সকলে সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রাণ ভরিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনান্তে হরিদাস গঙ্গাতীরে

আপন গোফায় তিনলক্ষ নাম জপে মনোনিবেশ করিলেন। ফুলিয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে বহু ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য শ্রেণীর ভক্তগণ তাঁহার দর্শনাভিলাষে প্রায়ই গোফায় আসিতেন, কিন্তু কেহই অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিতেন না। কিছুক্ষণ বসিয়া সকলেই ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে চলিয়া যাইতেন। কেহই কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেন না; অবশেষে কয়েকজন ওঝা অনেক গণিয়া পড়িয়া বলিল যে, ঐ গোফাটির নিম্নে একটি বৃহদাকার বিষধর সর্প আছে, সর্পটির বিষের তীব্রতা এত অধিক যে, উহাতে গোফার সমস্ত বায়ু একেবারে দূষিত হইয়া গিয়াছে। বিপ্রগণ ওঝাগণের মতানুসারে ঐ গোফা ছাড়িবার জন্য হরিদাসকে অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু হরিদাস কিছুতেই সম্মত হইলেন না; অবশেষে একদিন যখন তিনি গোফায় দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন বিবিধ বিচিত্র বর্ণ-সমন্বিত একটি বৃহদাকার সর্প গোফা হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। সকলে বুঝিল, ইহাও হরিদাসের ঐশীশক্তির অন্যতম মাহাত্ম্য।

একদিন ফুলিয়া গ্রামের এক বড় লোকের বাড়ীতে এক ডঙ্ক মৃদঙ্গ, মন্দিরা প্রভৃতি লইয়া নাচিতেছিল। ডঙ্করা এইরূপ বাড়ী বাড়ী নৃত্য করিয়া থাকে। দৈবক্রমে সেখানে হরিদাস আসিলেন। ডঙ্ক নানারূপ নৃত্যাদি করিয়া কালীয়-দমনের গীত গাহিতেছিল। হরিদাস কিছুক্ষণ সে সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে ভাবে মাতোয়ারা হইলেন। তিনি সেই ডঙ্কের সহিত "হরি" "হরি" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। হরিদাসের হরিনামে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রেম-বিগলিত অশ্রুধারা-দর্শনে ডঙ্ক একেবারে মোহিত হইয়া গেল। সে করজোড়ে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হরিদাসের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল। তখন এক ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত ছিল। সে ব্রাহ্মণ মনে মনে

ভাবিল, আমিও যদি হরিদাসের মত নৃত্য করি, তাহা হইলে লোক আমাকেও শ্রদ্ধাভক্তি করিবে। কিন্তু ব্রাহ্মণের ভাগ্যে ভক্তের শ্রদ্ধা-ভক্তিলাভ ত দূরের কথা, ডঙ্ক বরং ব্রাহ্মণকে প্রহার করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে উপস্থিত সকলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি হরিদাসের নৃত্য দেখিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিলে, আর এই ব্রাহ্মণের বেলায় তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলে কেন?" ডঙ্ক তচ্ছু বলে বলিল, "এ ব্রাহ্মণ ধূর্ত্ত, কপট, কৃত্রিম, এ ব্যক্তি সকলের শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিবার জন্য নানা অঙ্গভঙ্গীসহকারে নৃত্য করিতেছে।"

"তোমরা যে জিজ্ঞাসিলা এ বড় রহস্য।
যদ্যপি অকথ্য তভো কহিব অবশ্য ॥
হরিদাস ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।
তোমরা যে ভক্তি বড় করিলা বিশেষ ॥
তাহা দেখি ও ব্রাহ্মণ আহার্য্য করিয়া।
পড়িলা মাৎসর্য্য বুদ্ধে আছাড় খাইয়া ॥"

— শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

হরিনদী গ্রামে এক দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ ছিল, সে একদিন হরিদাসকে ডাকিয়া বলিল, "ওহে হরিদাস! হরিনাম করিতে হয়, মনে মনে করিলেই পার, তুমি যে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া করিয়া নাম কীর্ত্তন কর, এ তোমার কেমন বিসদৃশ ব্যবহার!" ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া হরিদাস বলিলেন, "উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন করিলে যে কোন প্রকার পাপ হয়, কোন শাস্ত্রে এরূপ বিধান নাই। আমি আপন মনে যদি হরিনাম করি, তাহা হইলে কি অপরের কি কল্যাণ হইবে? আমি সর্ব্বসাধারণের উপকারের জন্যই এইভাবে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম শুনাইয়া যদি একটি লোককেও হরিনামে আসক্ত করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার শ্রম

সার্থক হইবে। এই বিবেচনাতেই আমি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া থাকি

"শুন বিপ্র! সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশুপক্ষী কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥"

শ্রীশ্রীনারদীয় পুরাণে প্রহ্লাদ বলিয়াছেন,—

"জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জ্জপন্ শ্রোতৄন্ পুনাতি চ॥"

অর্থাৎ হরিনাম-জপপরায়ণ ব্যক্তি অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-জপকারী যে শতগুণে প্রধান, ইহা যুক্তিযুক্ত। কারণ, কেবল জপকারী আপনাকেই পবিত্র করেন, আর উচ্চৈঃস্বরে জপকারী আপনাকে এবং শ্রোতৃবর্গকে—সকলকেই পবিত্র করেন।

ব্রাহ্মণ হরিদাসের কথা শুনিয়া আর প্রত্যুত্তর না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

ইহার কিছুদিন পরে ১৪০৭ শকে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। শান্তিপুরে শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য এতদিন ভগবান শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন; চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়াছেন শুনিয়া একদিকে অদ্বৈতাচার্য্য যেমন আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন, হরিদাসও তদ্রূপ অদ্বৈতের সহিত মিলিত হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।

তারপর শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে যখন হরিনাম সংকীর্ত্তনে পাপী-তাপী-বিষয়ীর প্রাণে মধুর অমিয়-ধারা বর্ষণ করিতেছিলেন, তখন হরিদাস গিয়া নবদ্বীপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। হরিদাস জাতিতে যবন হইলেও শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে মহাভক্ত বলিয়া চিনিতে পারেন এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে আপন পার্শ্বে স্থান দান করেন। হরিদাস ও নিত্যা-

নন্দের উপর শ্রীচৈতন্য নগর-সঙ্কীর্ত্তনের ভার দিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। হরিদাসকে শ্রীচৈতন্য যে কতদূর মহৎ বলিয়া মনে করিতেন, তাহা একটি ঘটনা হইতেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। মহাপ্রভু একদিন শ্রীবাসের বাটীতে কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাবে সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। সেই সময়ে তিনি তাঁহার শিষ্যবর্গকে আপনাপন অভীষ্ট বর লইবার জন্য আদেশ করেন। হরিদাস যবন বলিয়া সর্ব্বদা দূরে দূরে থাকিতেন। একে একে সমস্ত শিষ্য ঈপ্সিত বর লইলে মহাপ্রভু হরিদাসের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, হরিদাস সকলের পশ্চাতে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার আদেশে হরিদাসকে মহাপ্রভুর সম্মুখে আনা হইল। মহাপ্রভু বলিলেন, "হরিদাস তুমি জাতিতে যাহাই হও না কেন, তুমি আমার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি বাজারের মধ্যে বেত্রাহত হইয়াও আঘাতকারীদের কল্যাণ প্রার্থনা করিতে পারে, সে ব্যক্তি যে কত উচ্চ, কত মহান্ তাহা সাধারণ মানুষে কল্পনা করিতে পারে না। তোমার ন্যায় অকপট ভক্তের সংসর্গ যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও লাভ করিতে পারে, সে আমারই সঙ্গ লাভ করে। বাপ হরিদাস! আমি নিত্য তোমাতেই বিরাজমান। তোমার দেহে ও আমার দেহে কোন প্রভেদ নাই।"

শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে এই প্রকার প্রশংসাবাদ শুনিয়া হরিদাস মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়েন। মহাপ্রভু তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু অতঃপর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবন, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে পুরুষোত্তমে আসিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ, জগদানন্দ ও কৃষ্ণদাস সে সংবাদ প্রচার করিলেন। শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যও এ সংবাদ শ্রবণ করিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য পুরীধামে

যাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। কালবিলম্ব না করিয়া সকলে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের বাটীতে আসিয়া সমবেত হইলেন। তার পর হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে পুরীধামাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস, বসুদেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত, গঙ্গাদাস, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি প্রায় দুইশতাধিক শিষ্য প্রস্থান করিলেন। হরিদাসও তাঁহাদের সমভিব্যাহারী হইলেন। আর সমভিব্যাহারী হইলেন প্রভু নিত্যানন্দ। প্রভু নিত্যানন্দের উপর যদিও গৌড়ে থাকিয়া প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের ভার ছিল, যদিও মহাপ্রভু তাঁহাকে সেইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, তথাচ তিনি প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ভক্তবৃন্দের সহযাত্রী হইলেন। প্রেমের এমনই লক্ষণ যে, প্রেম কাহারও বাধা-নিষেধ মানে না। বৃন্দাবনে গোপীগণের প্রাণে প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ বারম্বার তাহাদিগকে গৃহে ফিরিবার আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমের এমনই আকর্ষণ যে, শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া তাহারা কুল-মান লাজ-সকলই বিসর্জ্জন দিয়া রজনীতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া রাসলীলা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু যে যে বস্তু খাইতে ভালবাসেন, এক একজন ভক্ত মহাপ্রভুর জন্য তাহা লইলেন।—

> "ধনিয়া মৌরী তণ্ডুল গুণ্ডি করিয়া।
> নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া॥
> শুণ্ঠিখণ্ড নাড়ু আর আমপিত্তহর।
> পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি বস্ত্রের কথুলী ভিতর॥
> কোলি শুণ্ঠী কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর।
> কত নাম লব আর যত প্রকার আচার॥"

* * * * * *

মহাপ্রভুর প্রিয় এই সকল আহার্য্য-সামগ্রী লইয়া ভক্তগণ সকলে মহাপ্রভু-সন্দর্শনে প্রস্থান করিলেন। ভক্ত-বৃন্দ বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া পুরীধামে উপস্থিত হইলে রাজা প্রতাপ রুদ্র, সার্ব্বভৌমাচার্য্য প্রভৃতি সকলে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। সেদিন প্রভুর জলক্রীড়া বলিয়া মহাপ্রভু স্বয়ং আসিয়াছিলেন। এখন ভক্তগণকে পাইয়া তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া মহাকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, অতঃপর ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ দিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু কৈ! ভক্তগণের মধ্যে ত তাঁহার প্রাণসম প্রিয়তম হরিদাস নাই! তিনি ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভক্তগণ বলিলেন, হরিদাস জাতিতে যবন বলিয়া পুরুষোত্তমে প্রবেশ করিতে সাহস না করিয়া পথিপার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য আর মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া যাইয়া দেখেন, সত্য সত্যই হরিদাস পথিপার্শ্বে পড়িয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতেছেন। প্রভু তাঁহাকে হাতে ধরিয়া পুরুষোত্তমে লইয়া আসিলেন। অতঃপর মহাপ্রভু উৎকলরাজের পুরোহিত কাশী মিশ্রের কুসুমোদ্যানে হরিদাসের জন্য একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ভক্ত হরিদাস সেই কুটীরেই বাস করিতে লাগিলেন। একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র-স্নানান্তে হরিদাসের কুটীরে আসিয়া দেখেন, হরিদাস অতি নির্জীব অবস্থায় পড়িয়া ধীরে ধীরে নাম সংকীর্ত্তন করিতেছেন প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিদাস তোমার কি কোন অসুখ বিসুখ করিয়াছে?" হরিদাস বলিলেন, "না প্রভু আমার কোন অসুখ নাই, তবে বার্দ্ধক্যহেতু ক্ষীণদেহ হইয়াছি, এখন আর পূর্ব্বের মত নামজপ করিতে পারি না, ইহই আমার দুঃখ।"

"প্রভু কহে বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্প কর।
সিদ্ধদেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেনে ধর॥"

হরিদাস বলিলেন, "প্রভু, আমি হীন জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তবে তোমার কৃপায় ব্রাহ্মণেও আমার সহিত একত্র ভোজন করিয়াছেন। কিন্তু প্রভু আমার সর্ব্বদা এই আশঙ্কা তুমি আমার পুর্ব্বে লীলা সংবরণ করিবে। আমি তাহা ত দর্শন করিতে পারিব না। অতএব প্রভু তুমি আমার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিয়া আমাকে তোমার লীলা-সম্বরণের পুর্ব্বেই মানবলীলা সম্বরণ করিতে দেও।

"আপনার আগে মোর শরীর পড়িবা।
হৃদয়ে ধরিবা তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ বদন।
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ।

পরদিন ভক্তগণসহ মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য যাইলেন। হরিদাসের কুটীরের অঙ্গনে মহাপ্রভু ভক্তগণ সহ মহা-নৃত্য আরম্ভ করিলেন। হরিদাস প্রভুর ও ভক্তবৃন্দের পদধূলি লইয়া "কৃষ্ণচৈতন্য" বলিতে বলিতে দেহত্যাগ করিলেন। তখন প্রভু হরি-দাসের দেহ লইয়া প্রাণ ভরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অতঃপর হরিদাসের দেহ সমুদ্রে লইয়া গিয়া তাঁহার দেহ সমুদ্রে স্নান করাইলেন। ভক্তগণ সকলে হরিদাসের পাদোদক পান করিতে লাগিলেন। হরিদাসের দেহ অতঃপর চন্দনে অনুলিপ্ত করিয়া মহাপ্রভু তাহা বালুকার মধ্যে প্রোথিত করিলেন। অতঃপর জগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বারে আসিয়া মহাপ্রভু হরিদাসের মহোৎসবের জন্য ভিক্ষা চাহিলেন। সকলে ভিক্ষা দিল। হরিদাসের দেবলীলা এই ভাবে পরিসমাপ্ত হইল।

রামানন্দ রায়.

মানুষ ধন ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়াও যে ভগবানে ঐকান্তিক নিষ্ঠা দেখাইতে পারে এবং ভগবান যে দরিদ্রের কুটীরের ন্যায় ধনীর প্রাসাদেও পদক্ষেপ করিয়া থাকেন, ভক্তপ্রবর রামানন্দ রায় তাহার দৃষ্টান্তস্থল। যীশু খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, যেমন একটি সূচের ভিতর দিয়া একটি উষ্ট্রের প্রবেশ অসম্ভব, তদ্রূপ ধনী লোকের পক্ষেও স্বর্গে গমন অসম্ভব। কিন্তু রামানন্দ-চরিত পাঠ করিলে বুঝা যায়, যীশু খ্রীষ্টের এই প্রকার উক্তি একেবারে সঙ্কীর্ণতামূলক। হিন্দুধর্ম্ম কখনও সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে, হিন্দুধর্ম্ম ধনী ও দরিদ্রের জন্য ধর্ম্মসাধনের স্বতন্ত্র পথ প্রস্তুত করে নাই। প্রাসাদবাসী ধনীও যেমন ভগবানকে ডাকিলে পায়, কুটীরবাসী দরিদ্রও তদ্রূপ পায়—হিন্দুর ভগবান সার্ব্ব-জনীন। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে ভক্ত ও সাধকের তালিকায় রাজর্ষি জনক, রূপ-সনাতন অথবা রায় রামানন্দের নাম কখনও স্থান পাইত না। রায় রামানন্দ ত নিতান্ত যে সে লোক ছিলেন না; তিনি ছিলেন গোদাবরীর শাসনকর্ত্তা।

মহাপ্রভু যখন নীলাচল হইতে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের জন্য যাত্রা করেন, তখন সার্ব্বভৌম তাঁহাকে রামানন্দ রায়ের আকার-প্রকার ও বৈষ্ণব-ভক্তি সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু গোদাবরীতট দিয়া যাইতে যাইতে বনরাজীর নীলশোভা-সন্দর্শনে পুলকিত হইয়া বৃন্দাবন-ভ্রমে নৃত্য করিতেছিলেন। ভক্তেরা তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইয়া নৃত্য করিতেছিল। এমন সময় দেখেন, এক ব্যক্তি দোলায় চড়িয়া গোদাবরীতে স্নান করিতে যাইতেছেন। তাঁহার সঙ্গে বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ,

এবং বাদ্যকরেরা বাজনা বাজাইয়া যাইতেছে। তিনি স্নানান্তে উপরে উঠিলেই মহাপ্রভু তাঁহাকে রামানন্দ রায় বলিয়া চিনিতে পারিলেন। দেখিলেন, রামানন্দের যেরূপ পরিচয় সার্ব্বভৌম বলিয়া দিয়াছেন সেই পরিচয়ের সঙ্গে রামানন্দের অঙ্গসৌষ্ঠবাদির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। এদিকে রামানন্দ রায়ও "সূর্য্য শত সম অরুণবসন" এক সন্ন্যাসীকে হরিনাম করিতে দেখিয়া তাঁহার নিকট আসিলেন। আসিয়াই মহাপ্রভুর চরণে প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আমি সার্ব্বভৌমের নিকট যে ভক্তপ্রবর রামানন্দ রায়ের নাম শুনিয়াছি, আপনি কি সেই রামানন্দ রায়?" রামানন্দ বলিলেন, "হাঁ আমিই সেই অধম রামানন্দ" তখন মহাপ্রভু বলিলেন—

"সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণে।
তোমারে মিলিতে মোরে করেছে যতনে॥
তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন।
ভাল হৈল অনায়াসে পাইনু দরশন॥"

রামানন্দ বলিলেন, "আমি রাজসেবক, শূদ্রেরও অধম। তুমি আমাকে স্পর্শ করিতে বিন্দুমাত্র ঘৃণা বোধ করিলে না!" অতঃপর পরস্পরে নানা কথা বলিতেছেন, এমন সময় একজন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রভুকে তাঁহার বাটীতে ভিক্ষাগ্রহণ করিতে বলিল। প্রভু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যাকালে রামানন্দ রায় সেই বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের বাটীতে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা দুইজনে অতঃপর ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। সে আলোচনা প্রভুর নিজের ভাষাতেই দিতেছি—

"প্রভু কহে কহো কিছু সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥

* * * * *

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণকর্ম্মার্পণ সর্ব্বসাধ্য সার॥

* * * * *

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ ভক্তিসাধ্য সার॥

* * * * *

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহে আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তিসাধ্য সার॥

* * * * *

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্য সার॥"

* * * * *

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥

* * * * *

প্রভু কহে এহো হয় কিছু আগে আর।
রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥

* * * * *

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥

* * * * *

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তভাব প্রেমসাধ্য সার॥

* * * * *

প্রভু কহে সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
রায় কহে ইহার আগে পুছেছেন জনে।
এতদিনে নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥

* * * * *

রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের নাহিক উপমা॥
প্রভু কহে যে লাগি আছিলাম তোমাস্থানে।
সেই সব তত্ত্ববস্তু হৈল মোর জ্ঞানে॥
এবে সে জানিল সেব্য সাধন নির্ণয়।"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্।

অতএব তুমি আরও কিছু বল। কৃষ্ণ এবং রাধার স্বরূপ কি তাহা বল, রস কোন্ তত্ত্ব এবং প্রেম কোন্ তত্ত্বরূপ তাহাও বল। তুমি দয়া করিয়া এই সব তত্ত্ব আমাকে বল, তুমি ভিন্ন এ তত্ত্ব আর কেহ শিখাইতে পারে না।

রায় রামানন্দ কহিলেন, আপনি যে সমস্ত বিষয় বলিলেন; আমি সে সমস্তের কিছুই জানি না। তুমিই ত সাক্ষাৎ ঈশ্বর সকলই জান, অতএব বৃথা কেন আমার সহিত ছলনা কর।

"প্রভু কহে মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি॥"

আমি সার্ব্বভৌমের কাছে কিছু কৃষ্ণতত্ত্ব জানিতে চাহিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন যে, তিনি কৃষ্ণকথা জানেন না, জানেন রায় রামানন্দ। সেইজন্য আমি তোমার নিকট আসিলাম, আর তুমি কি না সন্ন্যাসী বলিয়া আমার স্তুতি করিতেছ ?

প্রভুর কথা শুনিয়া রায় রামানন্দ বলিতে লাগিলেন, প্রভু যখন তুমি শুনিবেই তখন শুন। আমি যন্ত্রমাত্র, তুমি আমার রসনায় অধিষ্ঠিত হইয়া যেমন বলাইবে, আমি সেইরূপই বলিব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত মদনমোহন, কামগায়ত্রী ও কামবীজে তাঁহার উপাসনা হয়, তিনি পুরুষযোষিত কিংবা স্থাবর-জঙ্গমের চিত্তাকর্ষক এবং সাক্ষাৎ মদনমোহনস্বরূপ। তিনি আপন মাধুর্য্যে আপনি মুগ্ধ হইয়া আপনাকেই আলিঙ্গন করিতে চান। কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি বটে, কিন্তু তাঁহাতে তিনটি শক্তি প্রধান :—চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা, তন্মধ্যে অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সকলের উপরে।

"সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী॥
চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি।
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে বাম আহ্লাদিনী
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥

হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেমনাম।
আনন্দ চিন্ময় রূপ রসের আখ্যান।
প্রেমের পরম ভাব মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমের ভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তার কার্য্যবূ্যহরূপ।"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্।

প্রভু কহিলেন, আজ তোমার প্রসাদে সাধ্যবস্তুর সন্ধান পাইলাম। সাধ্যবস্তু কেহ সাধন ব্যতীত পায় না। অতএব কেমন করিয়া সেই সাধনা লাভ করা যায় তাহা আমাকে বল।

রায় রামানন্দ বলিলেন, প্রভু তোমার লীলা বুঝা ভার! তুমি নিজেই আমার মুখে বক্তারূপে অধিষ্ঠিত হইয়া নিজেই শ্রোতারূপে তাহা শুনিতেছ। রাধাকৃষ্ণলীলা অতি গূঢ় লীলা, দাস্যবাৎসল্যাদি ভাবে এই লীলা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। সখী না হইলে এই লীলা কখনই পরিপুষ্ট হয় না। যে সখীভাবে তাঁহাকে পূজা করে, সেই রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ-সেবা রূপ সাধ্য পায়, এ সাধ্য পাইতে সখীভাব ছাড়া আর অন্য উপায় নাই। যে কৃষ্ণের সহিত রাধিকার লীলা করায়, সে নিজের সুখ হইতেও কোটীগুণ সুখ পায়।

পরদিন রায় রামানন্দ আবার মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন, তিনি আসিতেই মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—

"প্রভু কহে কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার।
রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥"

এইভাবে কৃষ্ণকথার মধ্যে তাঁহারা দুইজনে সারারাত্রি যাপন করিলেন। সকালে রায় রামানন্দ চলিয়া গিয়া পুনরায় সন্ধ্যাকালে আসিয়া প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এদিনও কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রাসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব প্রভৃতি নানা তত্ত্ব লইয়া কথাবার্ত্তা হইল। তার পর রামানন্দের নিকট হইতে বিদায় লইয়া মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিদ্যাপুরের অধিবাসিবৃন্দ সকলে গৌরাঙ্গ-বিচ্ছেদশোকে জর্জ্জরিত হইল। রামানন্দও গৌরাঙ্গ-বিহনে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

একদিন প্রদ্যুম্ন মিশ্র মহাপ্রভুর চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "প্রভু কৃষ্ণকথা শুনিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হয়।" প্রভু তাহা শুনিয়া বলিলেন, "আমি কৃষ্ণকথা জানি না; যদি তোমার কৃষ্ণকথা শুনিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে রায় রামানন্দের নিকট গমন কর।" প্রদ্যুম্ন মিশ্র মহাপ্রভুর কথানুযায়ী রামানন্দের বাটীতে গিয়া শুনিলেন, তিনি উদ্যানের মধ্যে দুইটি সুন্দরী কিশোরীকে স্বরচিত নাটক শিখাইতেছেন এবং তাহাদের গাত্রমার্জ্জনা পর্য্যন্ত করিয়া দেন। মিশ্রের আগমন-সংবাদ শুনিয়া রায় রামানন্দ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন এবং বলিলেন—

"বহুক্ষণ আইলা মোরে কেহ না বলিল।
তোমার চরণে মোর অপরাধ হৈল॥
তোমার আগমনে মোর পবিত্র হইল ঘর।
আজ্ঞা কর কাহা করোঁ তোমার কিঙ্কর।"

মিশ্র বলিলেন, "তোমাকে দেখিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি।" রামানন্দ বলিলেন, "সে আমার সৌভাগ্য।" তখন অধিক বেলা হইয়াছে দেখিয়া প্রদ্যুম্ন মিশ্র নিজালয়ে চলিয়া গেলেন এবং একদিন মহাপ্রভুর

নিকট গিয়া বলিলেন, "রামানন্দের নিকট গিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া মনোক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। তিনি সুন্দরী কিশোরী লইয়া উদ্যানমধ্যে গানবাজনা ও নর্ত্তন শিক্ষা দেন এবং নিজে তাহাদিগকে স্নান করাইয়া দেন।"

"শুনি মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা।
আমি ত সন্ন্যাসী আপনা বিরক্ত করি মানি॥
দর্শন দূরে প্রকৃতির নাম যদি শুনি॥
তবহি বিকার পায় মোর তনু মন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন॥
রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্ব্বজন।
কহিবার কথা নহে আশ্চর্য্য কথন।
একে দেবদাসী আর সুন্দরী তরুণী।
তার সব অঙ্গসেবা করেন আপনি॥
স্নানাদি করায় পরায় বাস বিভূষণ।
* * অঙ্গের হয় তার দর্শন স্পর্শন॥
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানা ভাবোদ্গম তার করায় শিক্ষণ॥
তাঁহার মনের ভাব তিঁহ জানে মাত্র।
তাহা জানিবার দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম।

মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া রামানন্দের প্রতি প্রদ্যুম্ন মিশ্রের যে বিরুদ্ধ ধারণা জন্মিয়াছিল তাহা বিদূরিত হইল। এবার রামানন্দের নিকট গিয়া মিশ্র মহাশয় স্বাভিমত প্রকাশ করিলেন। রামানন্দ তাঁহাকে আনন্দের সহিত মধুর কৃষ্ণকথা শুনাইলেন এবং বলিলেন, "এসব কথা

আমি কোথায় পাইব, স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য আমার রসনায় বক্তার আসন গ্রহণ করিয়া যেমন বলিতেছেন, আমি তেমনি বলিতেছি।"

রামানন্দের এই স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের কথা প্রদ্যুম্ন মিশ্র শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকটে গিয়া বলিয়াছিলেন। ভোগের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকিয়াও যে মানব ভক্তি সাধন করিতে পারে, রায় রামানন্দ তাহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন।

——:•:——

রাজা প্রতাপচন্দ্র রুদ্র রায়

ভগবানের অবতারস্বরূপে ভক্তিপ্রবাহে ধরাকে প্লাবিত করিবার জন্য যে সমস্ত দেবতা নররূপে অবতীর্ণ হন, তাঁহাদের এমনই মোহিনী শক্তি যে, অম্বরচুম্বী প্রাসাদবাসী রাজা পর্য্যন্ত তাঁহাদের বিলাস-বিভব পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসেন। পুরীর রাজা প্রতাপ-রুদ্র রায় এই শ্রেণীর ধনী ছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নীলাচলে গিয়া কৃষ্ণনামের বন্যায় চতুর্দ্দিক মাতাইয়া তুলিয়াছেন, রাজা প্রতাপরুদ্র কি সেই মোহিনী ধ্বনি শুনিয়া নীরব থাকিতে পারেন? সকলে মহাপ্রভুর সহিত মহানন্দে নৃত্য করে, রাজা প্রতাপরুদ্র রায় কি এ অবস্থায় প্রাসাদ-কক্ষে আবদ্ধ থাকিতে পারেন? একদিন, দুইদিন, তিনদিন করিয়া কতদিন কাটিল, রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর চরণ-দর্শনাশায় উৎকণ্ঠিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরিশেষে একদিন আর না থাকিতে পারিয়া সার্ব্বভৌমের নিকট নিজ অভিমত ব্যক্ত করিলেন। সার্ব্বভৌম আসিয়া সে কথা মহাপ্রভুকে বলিলেন। মহাপ্রভু শুনিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসীর পক্ষে যেমন স্ত্রী দর্শন করিতে নাই, তদ্রূপ রাজদর্শনও করিতে নাই।"

"আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথা মহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি॥"

—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

"ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
কহ যদি তবে আমায় এথা না দেখিবে॥"

সার্ব্বভৌম প্রভুর কথা শুনিয়া মহা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

রামানন্দ রায়ও মহাপ্রভুর নিকট গিয়া বলিলেন, "রাজা প্রতাপরুদ্র আপনাকে অত্যন্ত ভক্তি করেন, তিনি বিষয়াদি সমস্ত পরিবর্জ্জন করিয়াছেন। আপনার নাম যে কেহ করে, রাজা আসন হইতে উঠিয়া অমনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন।" কিন্তু রায় রামানন্দও মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া নিরাশ হইলেন।

এদিকে সার্ব্বভৌম রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট গিয়া বলিলেন, "রাজন! আমি আপনার জন্য মহাপ্রভুকে অনেক বলিয়াছি, তথাপি তিনি রাজদর্শনে সম্মত হন নাই। তিনি স্পষ্টই আমাকে বলিয়াছেন, যদি এরূপ প্রস্তাব দ্বিতীয়বার করা হয়, তাহা হইলে তিনি জগন্নাথক্ষেত্র হইতে চলিয়া যাইবেন। রাজা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন—

"পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
জগাই মাধাই করিয়াছেন উদ্ধার॥
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিব জগত নিস্তার।
এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন অবতার॥
তাঁর প্রতিজ্ঞা মোর না করিবে দরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁ বিনা ছাড়িব জীবন॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্।

মহাপ্রভুর প্রতি রাজার প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন, "নিশ্চয়ই আপনার প্রতি মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইবেন। আমি আপনাকে একটা উপায় বলিয়া দিই, সেই উপায়ে নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর দর্শন মিলিবে। স্নানযাত্রার দিন মহাপ্রভু ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া

প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিবেন। প্রেমাবেশে তিনি পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিবেন। সেই সময় আপনি রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া সেই পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া প্রভুর চরণ ধরিবেন। প্রভু তখন কৃষ্ণকথায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য থাকিবেন, সুতরাং আপনাকে নিশ্চয়ই প্রেমাবেশে আলিঙ্গন করিয়া বসিবেন। রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর নিকট আপনার অনেক গুণগান করিয়াছেন, তাহাতে প্রভুর মন যে একটু বিগলিত না হইয়াছে, এমন নহে।"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "স্নানযাত্রা কবে?" সার্ব্বভৌম বলিলেন, "স্নানযাত্রার আর তিন দিন মাত্র বিলম্ব আছে।" রাজা সেই স্নানযাত্রার দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অতঃপর স্নানযাত্রার দিন উপস্থিত হইল, মহাপ্রভু গোপীভাবে উন্মত্ত হইয়া মহানৃত্য করিতে লাগিলেন।

এস্থলে গোপীভাব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

গোপীভাব জগতের শ্রেষ্ঠতম ভাব। সৃষ্টি দুই ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। এক পিতৃশক্তি অপর মাতৃশক্তি। পুরুষে পিতৃশক্তি এবং স্ত্রীতে মাতৃ-শক্তি বিদ্যমান। যেখানে পিতৃশক্তি সেইখানেই জ্ঞানের এবং যেখানে মাতৃশক্তি সেইখানে হ্লাদিনীর বিকাশ। পুরুষের ভিতর জ্ঞানাধিক্যবশতঃ সে কাহারও উপর নির্ভরশীল নহে। স্ত্রী কিন্তু তাহা নহে—সে তাহার পতির উপর নির্ভরশীলা। এমন কি তাহার অশন-বসন, সুখ ও দুঃখ, প্রতিদিনের হাসি-কান্নাটির জন্য পর্য্যন্ত পতির উপর নির্ভর করিতে হয়। এই একান্ত নির্ভরতার ফল কি হয়? ঘাত প্রতিঘাত জগতের নিয়ম। পতির ভালবাসাই হইতেছে একান্ত নির্ভরতারূপ মানসিক বৃত্তির প্রতিঘাত। যাহার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নাই, সেই একমাত্র নির্ভরশীল হইতে পারে। নির্ভরতায় নিজের দায়িত্ব

অপসৃত হয়, অবশিষ্ট থাকে শুধু আনন্দ। স্ত্রীগণের হৃদয় তাই আনন্দ-প্রাচুর্য্যে ভরপূর।

সর্ব্বচিত্তাকর্ষক বলিয়া যাঁহাকে কৃষ্ণনামে অভিহিত করা হয়, তিনি বিশ্বের যাবতীয় চেতন অচেতন পদার্থকে অল্পবিস্তর আকর্ষণ করিতেছেন। তিনিই একমাত্র পুরুষস্থানীয় বলিয়া হ্লাদিনীর আধিক্যযুক্ত জীবকে বা স্ত্রীলোককে আত্যন্তিক আকর্ষণে আকৃষ্ট করিতেছেন। প্রাকৃত জগতেও দেখিতে পাই, আত্মপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিতে পুরুষের বিকাশাধিক্য দৃষ্ট হয়। তাদৃশ পুরুষ নারীকে সহজে আকৃষ্ট করিতে পারেন। যেখানেই পৌরুষের বিকাশাধিক্য, সেইখানেই হ্লাদিনীবহুল নারী অভিভূত হইয়া পড়ে। ইহাই অপ্রাকৃত ব্রজধামের ব্রজগোপীর আদর্শ।

চৈতন্য ও আনন্দের আত্যন্তিক মিলন যে অবশ্যম্ভাবী, ইহা বৈজ্ঞানিক যুক্তিতেও প্রমাণিত হইতে পারে। তাই সেই পরমপুরুষকে পাইতে হইলে কোন সম্প্রদায় যে বলেন, সাধকের মেয়েদের ভাবে ভাবিতে হইবে, ইহা অযৌক্তিক নহে। এই শ্রেণীর সাধকের মন হইতে পুরুষ-ভাব মুছিয়া গিয়া হৃদয় শিশুর হৃদয়ের ন্যায় সরল ও সরস হয়। শুধু তাহা নহে, পুং দেহের অস্তিত্ব সত্ত্বেও তাহার সে জ্ঞান বিলুপ্ত হয়—মেয়ে ভাবে ভরপূর হইয়া পতিহারা পত্নীর ন্যায়, মণিহারা ফণীর ন্যায় তাঁহার চিন্তায় দিবানিশি অতিবাহিত করে। স্ত্রীভাবে স্ব-সুখ-বাঞ্ছা থাকে, গোপীভাবে নিজ সুখের ইচ্ছা নাই—তাহার সমস্ত সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসিত। এই গোপীভাব সাধ্য নহে। মন্ত্রে তন্ত্রে এ প্রেম আয়ত্ত করা যায় না। নিত্যসিদ্ধ যাঁহারা তাঁহারাই শুধু এ প্রেমের অধিকারী। কৃষ্ণ—নন্দনন্দন কৃষ্ণ চিরদিনই সত্যবস্তু। আনন্দেই এই কৃষ্ণের জন্ম হয়। এই নন্দনন্দন কৃষ্ণের জন্যই সমস্ত জগত উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। যেখানেই আনন্দের উৎস সেখানেই শ্রীকৃষ্ণের অভিব্যক্তি। এই

আনন্দ অশ্রুতে মিশান। গৌরাঙ্গদেব ছিলেন অশ্রুর খনি। জমাট অশ্রুতে তাঁহার তনু রচিত। তাই তিনিই শুধু কৃষ্ণ আস্বাদন করিয়াছিলেন, কৃষ্ণসাধনার যে চরম পরিণতি তাহা একমাত্র তাঁহাতেই ফুটিয়াছিল। গৌরাঙ্গের ভাবে ভগবানকে ভালবাসার নাম গোপীভাব।

এই গোপীভাবে উন্মত্ত হইয়া মহাপ্রভু সকল ভক্তকে রাখিয়া একাকী আলালনাথে গেলেন।

"অর্দ্ধ বাহ্যদশা প্রভু প্রেমানন্দে ভাসে।
অল্পে অল্পে রাজা গিয়া দাণ্ডাইলা পাশে॥
রাসপঞ্চাধ্যায়ের এক শ্লোক পাঠ করি।
উচ্চ করি গায় তাহা শুনি গৌরহরি॥
প্রেমানন্দ-সুখে কহে কে তুমি হে বন্ধু।
কর্ণেতে ঢালিলে মোর সুধারসসিন্ধু॥
এত কহি প্রেমাবেশে উঠিয়া রাজারে।
গাঢ় আলিঙ্গন করি দু'নয়ান ঝুরে॥
দোঁহে ভূমে গড়ি কান্দে দৃঢ় আলিঙ্গনে।
আনন্দেতে জয় জয় করে ভক্তগণে॥"

তখন রাজা প্রতাপরুদ্রের বাসনা সিদ্ধ হইল। মহাপ্রভুর চরণ লাভ করিয়া তিনি কৃতার্থ হইলেন।

শ্রীশ্রীঈশ্বর পুরী

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের নামের সহিত শ্রীশ্রীঈশ্বর পুরীর নাম ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত। ঈশ্বরপুরী মহাপ্রভুর দীক্ষাদাতা ছিলেন, ঈশ্বরপুরী ব্রাহ্মণকুলে কুমারহট্টে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন নিমাই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের প্রভায় নবদ্বীপ উদ্ভাসিত, পণ্ডিতমণ্ডলী স্তম্ভিত, তখন ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আগমন করেন।

"হেন কালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বর পুরী।
আইলেন অতি অলক্ষিত বেশ ধরি॥
কৃষ্ণরসে পরম বিহ্বল মহাশয়।
একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি দয়াময়॥
তাঁর বেশে কেহ তাঁরে চিনিতে না পারে।
দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈত মন্দিরে॥"

—শ্রীচৈতন্যভাগবত।

* * * * *

"অদ্বৈত বলেন বাপ তুমি কোন্ জন।
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তুমি হেন লয় মন॥
বলেন ঈশ্বর পুরী অমি ক্ষুদ্রাধম।
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ॥"

—শ্রীচৈতন্যভাগবত।

ঈশ্বর পুরী এইভাবেই অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট পরিচয় দিয়াছিলেন

একদিন পথিমধ্যে ঈশ্বর পুরীর সহিত নিমাই পণ্ডিতের সাক্ষাৎকার হইল। নিমাই পণ্ডিত তখন চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণকে পড়াইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। ঈশ্বর পুরীর সন্ন্যাসীর ন্যায় বেশভূষা ও আকার-দর্শনে নিমাই তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ঈশ্বর পুরী দেখিলেন, এক অনিন্দ্যসুন্দর, তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ যুবক তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে। বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা, ভক্তি, প্রেম যেন একত্রীভূত হইয়া যুবকে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। তিনি ইতিপূর্বে দেশপ্রসিদ্ধ নিমাই পণ্ডিতের নাম শুনিয়াছিলেন, এখন চাক্ষুষ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া মনে মনে ভাবিলেন, নিশ্চয়ই এই তরুণ যুবক নিমাই পণ্ডিত হইবেন। তিনি প্রকাশ্যতঃ জিজ্ঞাসিলেন, "পণ্ডিত তোমার নাম কি ?" নিমাই হাসিয়া বলিলেন, "দাসের নাম নিমাই।" ঈশ্বর পুরী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "অহো! তুমি সেই বিখ্যাত নিমাই পণ্ডিত!" নিমাই ঈশ্বর পুরীকে সেদিন আপন গৃহে ভিক্ষা (নিমন্ত্রণ) গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন—ঈশ্বর পুরীও নিমাইয়ের আমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া তাঁহার গৃহে গেলেন।

ইহাই গৌরাঙ্গের সহিত ঈশ্বর পুরীর প্রথম সাক্ষাৎ। তৎপর নবদ্বীপে গোপীনাথ আচার্য্যের গৃহে কয়েক মাস ঈশ্বর পুরী অবস্থান করিয়াছিলেন। তথায় অবস্থান করিয়া তিনি "কৃষ্ণলীলামৃত" নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য প্রণয়ন করেন। নিমাইয়ের বন্ধু গদাধরকে তিনি সেই কাব্যখানি পড়িয়া শুনাইতেন। এ সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকর বলেন—

"শ্রীঈশ্বর পুরী কিছুদিন এথা ছিলা।
কৃষ্ণলীলামৃত গ্রন্থ এথাই রচিলা॥
গদাধর পণ্ডিতে পরম স্নেহ করে।
তার প্রেম চেষ্টা দেখি পড়াইলা তারে॥"

ঈশ্বর পুরী সেই কাব্যখানি সংশোধন করিয়া দিবার জন্য প্রায়ই নিমাইকে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু মহাপ্রভু আপনার স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সহিত বলিতেন, ভক্তের বর্ণনায় কখনই ভুল থাকিতে পারে না।

"প্রভু বলে ভক্তবাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দোষ দেখে সেই পাপী জন॥
ভক্তের কবিত্ব যে তে মত কেনে নয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীতি তাহাতে নিশ্চয়॥
অতএব তোমার সে কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে দোষিবে কোন্ সাহসিক জন॥"

—শ্রীচৈতন্যভাগবত।

নিমাই পণ্ডিতের ন্যায় ঈশ্বর পুরীও মহাপণ্ডিত ছিলেন। একদিন অনেক অনুরোধ উপরোধ ত্যাগ না করিতে পারিয়া নিমাই পণ্ডিত পুরীমহোদয়ের কাব্যগ্রন্থখানি লইয়া আত্মনেপদীর উল্লেখ দেখিয়া বলিলেন, "এস্থানে আত্মনেপদী না বসিয়া পরস্মৈপদী বসিবে।" পরদিন নিমাই আসিলে ঈশ্বর পুরী বলিলেন, "তাই ত পণ্ডিত তুমি যেস্থানে পরস্মৈপদীর উল্লেখ করিয়াছ, সেস্থানে আত্মনেপদই থাকিবে।" এই বলিয়া ঈশ্বর পুরী নিজের পক্ষের যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। নিমাই মনে মনে ঈশ্বর পুরীর ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলেও তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ছিলেন, ভক্তের প্রাণে বাধা দেওয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। তিনি ভক্তকেই সর্ব্বদা প্রাধান্য দিতেন, ভক্তের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া ভক্তের মহিমা বৃদ্ধি করিতেন।

ইহার পর ঈশ্বর পুরী নবদ্বীপ পরিত্যাগ করেন। ইহার প্রায় দুই তিন বৎসর পরে গয়াধামে নিমাইয়ের সহিত ঈশ্বর পুরীর সাক্ষাৎকার

হয়। নিমাই পণ্ডিত গয়াধামে ৺বিষ্ণুপাদদর্শন করিতে গিয়াছেন। যে পদ দর্শন করিবার জন্য যোগী, ঋষি ও মুনি সকলে পাগল, নিমাই সেই পদ দর্শন করিতে গিয়াছেন। দেখিয়া তাঁহার সমস্ত দেহ এক অভূতপূর্ব্ব ভক্তিরসে আপ্লুত হইল, দু'নয়ন দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। নবদ্বীপের উদ্ধত নিমাই পণ্ডিতের ভিতর এতদিন যে প্রচ্ছন্নভাবে এত ভক্তি, এত প্রেম, এত বিশ্বাস ছিল, তাহা এতদিন কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। পাণ্ডারা এই নবীন পণ্ডিতের অসাধারণ ভগবন্নিষ্ঠা-দর্শনে অতিমাত্র বিস্মিত হইল। নিমাই একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। ঈশ্বর পুরী তখন সেই মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নিমাইয়ের লুপ্ত সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। ঈশ্বর পুরীর সহিত নিমাইয়ের পুনরায় মিলন হইল।

> "তবে কিছুদিন পরে শ্রীশচীনন্দন।
> পিতৃকার্য্যে গয়াধামে করিলা গমন॥
> ভক্তি করি গদাধরের পদে পিণ্ড দিলা।
> তাঁই শ্রীঈশ্বর পুরীর সাক্ষাৎ পাইলা॥
> পুরীরাজে দেখি নিমাই দণ্ডবত কৈলা।
> তাঁহা সসম্ভ্রমে গৌরচন্দ্রে আলিঙ্গিলা॥

—শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ :

গয়াধামে অবস্থানকালে মহাপ্রভু স্বহস্তে রন্ধন করিতেন। একদিন তিনি আপনার মত চাউল রন্ধন করিয়া সেবায় বসিবেন, এমন সময় তথায় ঈশ্বর পুরী উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে সে বেলা তাঁহার ভিক্ষা (আমন্ত্রণ) গ্রহণ করিতে বলিলেন। ঈশ্বর পুরী বলিলেন, "তাও কি হয়, তুমি নিজের মত দুটী রন্ধন করিয়া আহারে বসিবার উপক্রম করিয়াছ, আর আমি কি তাহা গ্রহণ করিতে পারি ?" মহাপ্রভু বলিলেন,

"সেজন্য তোমার ভাবিতে হইবে না,আমি পুনরায় রন্ধন করিয়া লইব।" ঈশ্বর পুরী বলিলেন, "না, তাহা হইবে না, যদি নিতান্তই না ছাড় তবে এস যে অন্ন রাঁধিয়াছ তাহা দুইজনে সমানে ভাগ করিয়া লই।" মহাপ্রভু কিন্তু তাহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি ঈশ্বর পুরীকে সেই অন্ন দিয়া পুনরায় নিজে অন্ন রন্ধন করিয়া লইলেন।

"প্রভু বলে যবে হৈল ভাগ্যের উদয়।
এই অন্ন ভিক্ষা আজি কর মহাশয়॥
হাসিয়া বলেন পুরী তুমি কি খাইবে।
প্রভু বলে আমি অন্ন রান্ধিবাঙ এবে॥
পুরী বলে কি কার্য্যে করিবে আর পাক।
যে অন্ন আছয়ে তাহা কর দুইভাগ॥"

এই ঘটনার পরদিবস নিমাই গয়াধামে বসিয়াই ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

ঈশ্বর পুরীকে প্রণাম করিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, "আজ আমাকে উদ্ধার করিয়া বড় কৃপার পরিচয় দিলে।"

"পুরী কহে তত্ত্ব জানি না কারহ দৈন্য।
জীব শিক্ষাইতে ধরায় হৈলা অবতীর্ণ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুহুঁ চিদানন্দময়।
তব মায়ানাট কার ভ্রম নাহি হয়॥"

কিন্তু নিমাই ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি ঈশ্বর পুরীকে গুরু বলিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন, পুরী দেখিলেন এক মহাবিপদ! ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি দেবতাগণ যাঁহার চরণ-দর্শনাশায় সর্ব্বদা উন্মত্ত, যোগী ঋষি মুনিগণ যাঁহার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষায় নিভৃত তপোবনের এক প্রান্তে বসিয়া নিশিদিন যোগারাধনা করেন—সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে

প্রতিদিন পায়ের ধূলি দিবেন কিরূপে! অন্য লোকে না জানুক, না চিনুক, ঈশ্বর পুরী চিনিতে পারিয়াছিলেন যে, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের অবতার, সুতরাং স্বয়ং নারায়ণকে পদধূলি দেওয়া ত কম পাপের কার্য্য নহে অথচ নিমাইকে নিষেধ করিলেও তিনি শুনেন না। তিনি অগত্যা নিমাইয়ের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য গয়াধাম ছাড়িয়া পলাইবার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল।

নিমাই আরও কয়েক দিন গয়াধামে অবস্থান করিয়া অবশেষে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথিমধ্যে কুমারহট্টে অবস্থান করিয়া গুরুদেব ঈশ্বর পুরীর জন্মস্থান দর্শন করিয়া আসিলেন।

এদিকে ঈশ্বর পুরী গয়াধাম হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন। সেই নিবিড় তমালতালিরাজিবেষ্টিত বৃন্দাবন। যে বৃন্দাবনের কদম্বমূলে মোহনবংশীধারী মুরলীমোহন শ্রীহরি মধুর বাঁশীর তানে গোপীজনের মন-প্রাণ হরণ করিত—যাঁহার বাঁশীর স্বরে বৃন্দাবনের পাদমূল-প্রক্ষালনকারী যমুনা উজান বহিত—শিখিগণ কেকাধ্বনি বিস্মৃত হইয়া উৎকর্ণ হইয়া থাকিত, ঈশ্বর সেই বৃন্দাবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে নিত্যানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। নিত্যানন্দ যমুনাতটে বৃক্ষতলে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতেছেন, এমন সময় ঈশ্বর পুরী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর! এখানে বসিয়া কাহার অন্বেষণ করিতেছ? তুমি যাহার অন্বেষণ করিতেছ, তিনি নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" ঈশ্বর পুরীর কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আগমন করেন। অতঃপর ঈশ্বর পুরী বৃন্দাবন হইতে নানা তীর্থ পর্য্যটন করেন। কত তীর্থ করিলেন, কিন্তু মন হইতে ভগবানকে লাভ করিবার প্রবল পিপাসা কিছুতেই দূরীভূত হইল না।

তিনি বেদাদি অনুশীলন অপেক্ষা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ ও স্মরণকেই ভক্তির শ্রেষ্ঠ মার্গ মনে করিতেন। তাঁহার কৃত একটি শ্লোকেই এ কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতেছে।

"যোগশ্রুত্যুপপত্তি নির্জ্জন বন ধ্যানাধ্বংস ভাবিতাঃ
স্বারাজ্যং প্রতিপদ্য নির্ভয় মণামুক্তা ভবন্তু দ্বিজাঃ।
অস্মাকন্তু কদম্বকুঞ্জকুহর প্রোন্নীলদিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামল ধাম-নাম জুষতাং জন্মাস্তু লক্ষাবধি॥"

অর্থাৎ দ্বিজাতিগণ যোগ, বেদানুশীলন, নির্জ্জন বনে ধ্যান ও তীর্থ-ভ্রমণাদি দ্বারা নির্ভয় রূপ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে মুক্ত হন হউন, আমরা কিন্তু কদম্বকুঞ্জে বিদ্যমান ইন্দীবরনিন্দী শ্যাম-সুন্দরের নামসেবক; আমাদের জন্মের ভয় নাই

অতঃপর পণ্ডারপুর নামক তীর্থক্ষেত্রে গমন করিয়া ঈশ্বর পুরী দেহত্যাগ করেন।

ইহার কিছুদিন পরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলা-চলে গমন করেন। কিছুদিন অবস্থান করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে বহির্গত হন। কিছুদিন দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিয়া মহাপ্রভু পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে গোবিন্দদাস নামক এক ভক্ত শ্রীচৈতন্যচরণে প্রণাম করিয়া কহিল, "আমার গুরু ঈশ্বর পুরী দেহত্যাগকালে নীলাচলে আসিয়া আপনার পাদপদ্ম সেবা করিবার জন্য আদেশ করিয়া গিয়াছেন। আমার অন্যতম গুরুভাই কাশীশ্বর শীঘ্র আপনার চরণ-সকাশে উপনীত হইবেন।"

"ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য গোবিন্দ মোর নাম।
পুরী গোসাঞির আজ্ঞায় আইনু তব স্থান॥

সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে গোসাঞি আজ্ঞা কৈল মোরে।
কৃষ্ণচৈতন্য নিকট রহি সেব যাই তারে॥
কাশীশ্বর আসিবেন তীর্থ দেখিয়া।
প্রভু আজ্ঞায় তোমার পদে আইনু ধাইঞা॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

গোবিন্দদাস যখন মহাপ্রভুর নিকট আগমন করেন, তখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার নিকট ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুরী গোঁসাই হইয়া কিরূপে শূদ্র সেবক রাখিতেন?"

"প্রভু কহে ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতন্ত্র॥
ঈশ্বরের কৃপা জাতিকুলাদি না মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে॥"

যাহার উপর দিনবন্ধুর কৃপাবারি বর্ষিত হইয়াছে, তাহার আবার জাতিকুল কি? বিদুর জাতিতে কি ছিলেন? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাটীতে অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু গোবিন্দদাসকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। কিন্তু গুরুর সেবক যে নিজেরও গুরু, তাঁহাকে কিরূপে আপন সেবাকার্য্যে লাগাইবেন? তাই সংশয়াকুলচিত্তে সার্ব্বভৌমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বল দেখি এখন কি উপায় করি? গোবিন্দদাস গুরুর সেবক, অতএব আমারও গুরু, ইঁহাকে কিরূপে আপন সেবায় নিযুক্ত করি?"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "যখন গুরুদেব ইঁহাকে আপনার সেবায় লাগাইবার জন্য পাঠাইয়াছেন, তখন সেবায় লাগাইতে দোষ নাই; কারণ গুরুর আজ্ঞা সর্ব্বথা পালনীয়।"

গোবিন্দ তদবধি মহাপ্রভুর নিকট রহিয়া গেলেন। তিনি মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের সেবা করিতেন। অতঃপর কাশীশ্বর গোস্বামী আসিয়াও গোবিন্দের সহিত মিলিত হন। মহাপ্রভু যখনই জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহ দেখিবার জন্য মন্দিরে যাইতেন, কাশীশ্বর তখন সম্মুখে থাকিয়া পথ আগুলিয়া লইয়া যাইত।

কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বর পুরী শূদ্র ছিলেন, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। ঈশ্বর পুরী যদি শূদ্র হইবেন, তবে সার্ব্বভৌম কেন মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, পুরী গোসাঞি কি প্রকারে শূদ্র সেবক রাখিলেন। ঈশ্বর পুরী নবদ্বীপে আসিয়া অদ্বৈতের নিকট পরিচয় দিবার সময় বলিয়াছিলেন—

"বোলেন ঈশ্বর পুরী আমি ক্ষুদ্রাধম।
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ॥"

এই "ক্ষুদ্রাধম" কথাটি বিকৃত করিয়া "শূদ্রাধম" বলিয়া অনেকে কল্পনা করেন এবং পুরী গোসাঞিকে বৃথা শূদ্র বলেন।

লোকনাথ গোস্বামী

জেলা যশোহর অধুনা নানাপ্রকার আধি-ব্যাধি-দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্য-মহামারীর নিত্যলীলাভূমি হইলেও এক সময়ে ইহা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যসম্পদে ও বহু সিদ্ধ মহাত্মার আবির্ভাবে সম্পদবান্ ছিল। মহাপ্রভুর আবির্ভাব-সময়ে এই যশোহরে এক মহাযোগীর আবির্ভাব হয়, তাঁহার নাম মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পূত নামের সহিত ওতঃ-প্রোতভাবে বিজড়িত। তাঁহার নাম লোকনাথ; তিনি নীরব সাধক ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজকে 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' আপন নামপ্রকাশে নিষেধ করিয়া যান বলিয়া তাঁহার অলৌকিক জীবনী সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই।

জেলা যশোহরের অন্তঃপাতী তালখড়ির নিকট জাগলি গ্রামে লোকনাথ গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী অতি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। লোকনাথ পিতার একমাত্র পুত্র। পদ্মনাভ অদ্বৈতপ্রভুর শিষ্য ছিলেন। কাজেই শৈশব হইতেই কৃষ্ণ-কথায় আসক্তি লোকনাথের জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। লোকনাথ অতি অল্প বয়সে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সহিত কৃষ্ণপ্রেমে তাঁহার মনপ্রাণ ক্রমশঃ নিমগ্ন হইতে লাগিল। একদিন তিনি শুনিতে পাইলেন যে, নবদ্বীপে শ্রীশ্রীশচীমাতার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আর কি রক্ষা আছে? যে কৃষ্ণের দর্শন-লালসায় লোকনাথ অহোরাত্র তপস্যা করিতেছেন সেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাটীর নিকটে মাত্র দুই দিবসের দূরবর্ত্তী গ্রামে বাস করিতেছেন, অথচ তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারিতেছেন না, এ কৃষ্ণ-

ব্যথা লোকনাথ কি আর সহ্য করিতে পারেন? তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, আর বিলম্ব না করিয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শনাশায় বাহির হইতেই হইবে। সঙ্কল্পের সহিত তাঁহার সংসারের প্রতি আবাল্য-পোষিত ঔদাসীন্য দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইল। মাতা সীতাদেবী ও পিতা পদ্মনাভ পুত্রের এই তরুণ বয়সেই বিষয়-সম্পত্তিতে অনাসক্তি এবং ঔদাস্য-দর্শনে তাঁহাকে পরিণয়-পাশে আবদ্ধ করিয়া সংসারী করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন।

লোকনাথ লোক-পরম্পরায় মাতা পিতার সঙ্কল্পের কথা শুনিলেন শুনিয়া তাঁহার পূর্ব্ব সঙ্কল্প আরও দৃঢ়ীভূত হইল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার প্রবল বাসনা যাঁহার মনে জাগরিত হইয়াছে, সংসারের এমন কি আকর্ষণী শক্তি আছে যে, তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে? লোকনাথ অগ্রহায়ণ মাসের একরাত্রিতে জনক-জননীর পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরদিন রাত্রিতে অবিশ্রান্ত ভ্রমণের পর তিনি পুণ্যধাম নবদ্বীপে আসিয়া উপনীত হইলেন।

তখন মহাপ্রভু ঘরের মধ্যে শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দকে লইয়া বসিয়া আছেন। লোকনাথ উঠানে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে প্রভুর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। মহাপ্রভুকে কত কথা বলিবেন বলিয়া তিনি পথে পথে ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছেন, কিন্তু প্রভুর দিকে তাকাইতেই তিনি সে সমস্ত কথা ভুলিয়া গেলেন। এদিকে মহাপ্রভু লোকনাথকে দেখিবামাত্র তীরবেগে উঠানে আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিলেন। লোকনাথের গলা জড়াইয়া ধরিয়া মহাপ্রভু বলিলেন "লোকনাথ তুমি কেমন করিয়া এতদিন আমাকে ভুলিয়া ছিলে?" লোকনাথ সে কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, তিনি মহাপ্রভুর ক্রোড়েই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পাঁচদিন যাবৎ লোকনাথ মহাপ্রভুর আলয়ে মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া

রহিলেন। পাঁচ দিন পরে তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "লোকনাথ! তুমি বৃন্দাবনে যাও, যাইয়া সেই তীর্থের সংস্কার ও উন্নতি সাধন করিও। আমিও আর বেশীদিন এই সংসারাশ্রমে থাকিব না, শীঘ্রই দণ্ডকমণ্ডলু লইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিব। তুমি বৃন্দাবনে গেলে বৃন্দাবনের লুপ্তমাহাত্ম্য আবার ফুটিয়া উঠিবে এবং তোমার অনুসরণ করিয়া অনেক ভক্ত বৃন্দাবনে গমন করিবে।"

লোকনাথ বলিলেন, "প্রভু তোমাকে ছাড়িয়া আমি কোন্ প্রাণে সুদূর বৃন্দাবনে যাইব? আমার মন-প্রাণ যে ঐ রাঙ্গা চরণে বাঁধা।"

মহাপ্রভু তখন লোকনাথকে বৃন্দাবন-গমনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। সে যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া বৃন্দাবনে যাইতে লোকনাথের মনে আর কোন দ্বিধা থাকিল না। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন "বৃন্দাবনে চিরঘাটে যে কদম্ব-তমাল-বকুলবৃক্ষ-সুশোভিত কুঞ্জ রহিয়াছে সেই কুঞ্জ তোমার জন্য নির্দ্দিষ্ট; তুমি সেই কুঞ্জে গিয়া অধিষ্ঠিত হও।"

পরদিন প্রভাতে মহাপ্রভুর চরণে বিদায় গ্রহণ করিয়া লোকনাথ সজলনয়নে প্রভুর নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রভুর অন্যতম ব্রাহ্মণ শিষ্য ভূধরও গমন করিলেন। লোকনাথ ও ভূধর বহুস্থান ঘুরিয়া বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া দেখিলেন, সে স্থান নানাবিধ হিংস্র জন্তুতে সমাচ্ছন্ন ও বহু জঙ্গলাকীর্ণ। বৃন্দাবনবাসীর কেহই বলিতে পারেন না, কোথায় বংশীবট, কোথায় নিধুবন, কোথায় শ্যামকুণ্ড, কোথায় রাধাকুণ্ড, তাঁহারা দুই ভক্ত কেবল নিশিদিন বনে বনে পরিভ্রমণ করেন আর কোথায় রাধাকৃষ্ণ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বেড়ান। ব্রজবাসিগণ এই দুই নবীন ব্রহ্মচারীর অপূর্ব্ব কৃষ্ণভক্তি-দর্শনে দলে দলে আসিয়া তাঁহাদের চরণে নিপতিত হইলেন। তাঁহারা

তাঁহাদিগকে আপনাপন গৃহে লইয়া বাস করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু ভোগবিলাসকে তাঁহারা বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া কোন মতেই তাঁহাদের প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। তাঁহারা প্রভুর আজ্ঞামত চিরঘাটে বাস করিবার জন্য সেই ঘাট অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথায় সেই চিরঘাট? অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহারা অবশেষে চিরঘাটের সন্ধান পাইলেন। সেখানে এক বৃক্ষতলে বসিয়া তাঁহারা হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া দিবারাত্রি কৃষ্ণ উপাসনা করিতে লাগিলেন!

"আর না দেখিব গোরা তোমার চরণ।
রহিলাম আজ্ঞামাত্র করিয়া ধারণ॥
ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু যে করিলে লীলা।
বঞ্চিত করিয়া মোরে একা পাঠাইলা॥"

—প্রেমবিলাস।

লোকনাথ ও ভূধর যে সময়ে বৃন্দাবনের লুপ্ত মহিমা উদ্ধার করিবার জন্য বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, তখনও রূপ-সনাতন নবাব সরকারে চাকুরী করিতেছেন, সুবুদ্ধি মিশ্র তখনও বৃন্দাবনে আগমন করেন নাই। রঘুনাথ ভট্ট, জীব গোস্বামী প্রভৃতি তখনও বালক। সুতরাং বৃন্দাবনে বৈষ্ণববাদ প্রচার এবং বৃন্দাবনের লুপ্তমহিমা-উদ্ধার-বিষয়ে লোকনাথ ও ভূধরকেই অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। অনুমান ১৪৩২ শকে ইঁহারা বৃন্দাবনে গমন করেন।

ইহার কিছুদিন পরে মহাপ্রভু সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপ ত্যাগ করেন এবং সরাসরি নীলাচলে চলিয়া যান। তথায় কিছুদিন থাকিয়া মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ও বৃন্দাবন-ভ্রমণে বহির্গত হন। কিন্তু বৃন্দাবনে আসিবার পথ হইতেই প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া যান। ভূধর ও লোক-

নাথ লোকমুখে এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ত্বরিতপদে দক্ষিণ দেশে গমন করেন, তথায় গিয়া শুনিলেন যে, প্রভু বৃন্দাবনে গিয়াছেন, কিন্তু বৃন্দাবনে আসিয়া শুনিতে পাইলেন যে, প্রভু পথ হইতে নীলাচলে ফিরিয়া গিয়াছেন। এইভাবে প্রভুকে দেখিবার জন্য লোকনাথ আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেও মহাপ্রভু কখনও তাঁহাকে দর্শন দেন নাই। প্রকাশ, লোকনাথকে মহাপ্রভু দীনহীন কাঙ্গালের বেশ দেখাইবেন না বলিয়াই এইরূপে আত্মগোপন করিয়া বেড়াইয়া ছিলেন। লোকনাথও তদবধি প্রভুর মনের অভিলাষ বুঝিতে পারিয়া আর তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রদর্শন করেন নাই। যে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিবার জন্য এবং যে তীর্থের মাহাত্ম্য-উদ্ধারের জন্য তাঁহারা দুইজনে বৃন্দাবনে আসিয়াছেন সেই তীর্থমাহাত্ম্য উদ্ধারের জন্য তাঁহারা আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতীও হইল। বৃন্দাবনের লুপ্ত কুঞ্জসমূহ আবার লোকচক্ষুর সমক্ষে জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিল। তাঁহাদের সঙ্গে সুবুদ্ধি রায়, রূপ-সনাতনপ্রমুখ মহাপ্রভুর ভক্তগণ আসিয়া সম্মিলিত হইলেন। ভক্তগণের মধুর সঙ্গীতে নীরব বৃন্দাবনের সর্ব্বত্র আবার মুখরিত হইয়া উঠিল।

শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ভক্তিমার্গের যাঁহারা বিরোধী ছিলেন, মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাঁহাদের অন্যতম। কিন্তু মহাপ্রভুর এমনই শক্তি যে, এই প্রকাশানন্দ পরে জ্ঞানমার্গ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মহাপ্রভুর একজন প্রিয়তম শিষ্য হন। প্রকাশানন্দ পরিশেষে "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত" নামে একখানি ভক্তিমূলক গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার নাম হইয়াছিল প্রবোধানন্দ সরস্বতী।

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে পুণ্যতীর্থ ৺বারাণসীধামে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর একটী মঠ ছিল। মায়াবাদী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নেতা স্বামী শঙ্করাচার্য্যের তিনি ভক্ত ছিলেন এবং ভক্তিবাদে আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। প্রকাশানন্দ বেদান্ত, তর্ক, সাঙ্খ্য, বৈশেষিক, জ্ঞান, মীমাংসা, আগম, নিগম, মহাপুরাণ, ইতিহাস, পঞ্চরাত্র, অলঙ্কার, কাব্য, নাটক প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, কাশীস্থ ছাত্রমণ্ডলী তাঁহার অধ্যাপনায় নানাবিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিল। শ্রীশ্রীভক্তমালগ্রন্থে প্রকাশানন্দ সরস্বতী সম্বন্ধে নিম্নরূপ বর্ণনা আছে :—

"প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাশীপুরে বাস।
জ্ঞানযোগমার্গে স্থিতি চিন্তয়ে আকাশ॥
বেদান্ত পণ্ডিত যে শাঙ্করিক ভাষ্যমতে।
শ্রীবিগ্রহ নাহি মানে দুই নাশে যাতে॥
যতেক দণ্ডীর গুরু কাশীতে প্রামাণ্য।
আপনারে মানে ইষ্টদেবেতে অভিন্ন॥"

বস্তুতঃ কাশীবাসী তদানীন্তন সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে প্রকাশানন্দ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন—পরিব্রাজক বলিয়া তাঁহার অশেষ খ্যাতি ছিল।

কাবেরী নদীর তীরে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে প্রকাশানন্দের বাড়ী ছিল। তাঁহারা তিন ভ্রাতা ছিলেন, জ্যেষ্ঠ বেঙ্কট ভট্ট, মধ্যম ত্রিমল্ল ভট্ট আর কনিষ্ঠ স্বয়ং তিনি। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল ভট্ট জ্ঞান-মার্গ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিপথ অবলম্বন করেন। প্রকাশানন্দ যখন শুনিতে পাইলেন যে, নীলাচলবাসী একজন ভাবুক সন্ন্যাসীর প্রভাবে গোপাল ভট্ট ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, তখন সেই সন্ন্যাসীর নাম অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, সেই সন্ন্যাসী নবদ্বীপবাসী একজন ব্রাহ্মণ, নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

প্রকাশানন্দ এই সন্ন্যাসীর উপরে হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন। তিনি নীলাচল-গামী একজন যাত্রীর নিকট নিম্নলিখিত শ্লোকটী লিখিয়া শ্রীচৈতন্যকে তাহা দিবার আদেশ করিলেন—

> "যত্রাস্তে মণিকর্ণিকা, মলহরা স্বর্দীর্ঘিকা।
> রত্নন্তারক মোক্ষদং তনুমৃতে শম্ভুঃ স্বয়ং যচ্ছতি॥
> এতস্মদ্ভুত ধামতঃ সুরপুরো নির্ব্বাণমার্গস্থিতং
> মূঢ়োহন্যত্র মরীচিকাসু পশুবৎ প্রত্যাশয়া ধাবতি॥"

অর্থাৎ যেস্থানে মণিকর্ণিকা ও পাপনাশিনী মন্দাকিনী দীর্ঘিকা ও যে স্থানে স্বয়ং মহাদেব তারক মোক্ষপ্রদ দেবগণের অগ্রবর্ত্তী নির্ব্বাণ পথস্থিত রত্ন প্রদান করেন, মূঢ়গণ সেই প্রকৃত রত্ন ত্যাগ করিয়া পশুরা যেরূপ মৃগতৃষ্ণিকাতে ধাবিত হয় তদ্রূপ প্রত্যাশায় অন্য দিকে ধাবিত হয়।

ইহার ভাবার্থ এই যে, প্রকাশানন্দ গৌরাঙ্গদেবকে পাইয়া বলিতেছেন "রে মূঢ়! এই কাশীনগরীতে স্বয়ং মহাদেব মুক্তি দিয়া থাকেন। তুমি এখান ছাড়িয়া অন্য কোথায় মুক্তির সন্ধান করিতেছ?"

মহাপ্রভুও উক্ত শ্লোকের একটি প্রত্যুত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন। তাহার ভাবার্থ এই যে, মণিকর্ণিকা ভগবানের ঘর্ম্মজল, ভাগীরথী ভগবানের চরণবারি ও কাশীপতি স্বয়ং বিশ্বনাথ যাহাতে বিলীন হইয়া ভজনা করিতেছেন এবং বারাণসী নগরে যাঁহার নাম নিস্তারক তারক, অতএব হে সখে! সেই শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বাণপ্রদ যে চরণকমল তাহাকে ভজনা কর।

প্রকাশানন্দ এই শ্লোক পাইয়া দেখিলেন যে, মহাপ্রভুকে তিনি আপন দলে ভিড়াইতে পারিলেন না। কাজেই তিনি আবার মহাপ্রভুকে গালি পারিয়া আর একটী শ্লোক লিখিয়া পাঠাইলেন। মহাপ্রভু তাহা পাঠ করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন. মহাপ্রভু মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন, প্রকাশানন্দ ইহাতেও টিট্‌কারী কাটিয়া মহাপ্রভুকে কত প্রকার শ্লেষ করিয়া পত্র পাঠাইলেন। প্রকাশানন্দের ব্যবহারে তাঁহার প্রতি মহাপ্রভুর বিন্দুমাত্র ঘৃণা হইল না বটে, কিন্তু প্রকাশানন্দ কাশীতে থাকিয়া মহাপ্রভুর নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। কাশীতে প্রকাশানন্দ যেমন প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, নীলাচলে সার্ব্বভৌমও তদ্রূপ প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। সার্ব্বভৌম প্রকাশানন্দের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, তিনি কাশীতে যাইয়া প্রকাশানন্দকে ভক্তির পথে আনয়ন করিবেন। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের সঙ্কল্প শুনিয়া বলিলেন,"দেখ সার্ব্বভৌম! এই মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা নিতান্ত কোমলপ্রাণ লোক নহেন, তাঁহারা তোমার কথাতে কখনই দ্রবীভূত হইবেন না।"

সার্ব্বভৌম কিন্তু মহাপ্রভুর কথা না শুনিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া বারাণসী যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও হরিদাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সার্ব্বভৌম প্রথমোক্ত দুইজনকে প্রণাম করিয়া হরিদাসকে প্রণাম করিতে গেলে হরিদাস ছুটিয়া পলাইলেন। সার্ব্বভৌম কিন্তু হরিদাসকে ধরিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া ছাড়িলেন এবং বলিলেন, ভগবান শ্রীচৈতন্যের ভক্তদের নিকট জাতিবিচার নাই। সার্ব্বভৌম কাশীতে গিয়া প্রকাশানন্দকে কত বুঝাইলেন, কিন্তু প্রকাশানন্দের মন পূর্ব্বেও যেমন দৃঢ় ছিল, তখনও সেইরূপ দৃঢ় থাকিল।

প্রকাশানন্দ অতঃপর মহাপ্রভুকে কাশীতে আহ্বান করিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু গেলেন না। পরে কিন্তু বৃন্দাবন-যাত্রার পথে তাঁহাকে কাশীতে ভক্ত চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। মহাপ্রভুর এমনই প্রভাব ছিল যে, তিনি অতি সংগোপনে কোথাও গেলে তাহা তৎক্ষণাৎ রাষ্ট্র হইয়া পড়িত। তিনি যে কাশীধামে আসিয়াছেন, ইহা প্রকাশানন্দ অচিরাৎ শুনিতে পাইলেন, কিন্তু আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। পরন্তু যে সমস্ত লোক মহাপ্রভুর নিকট যাইতে উৎসুক হইতেন, প্রকাশানন্দ তাঁহাদিগকে এই বলিয়া নিবৃত্ত করিতেন যে, ঐ ভণ্ড ঐন্দ্রজালিকের নিকট তোমরা যাইও না। এইভাবে কিছুদিন কাটিল, প্রভুও প্রকাশানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করেন না, সন্ন্যাসীরাও তাঁহার নিকট আসেন না। পরিশেষে বিশ্বেশ্বরের ক্ষৌর-দিবস সম্মুখে আগতপ্রায় হইল। মহাপ্রভু দেখিলেন, ক্ষৌরদিবসে কাশীধামে থাকিলে সন্ন্যাসীদিগের সহিত তাঁহার দেখা-সাক্ষাৎ করিতেই হইবে। কাজেই তিনি ক্ষৌরদিবসের চারিদিন বাকী থাকিতে কাশী-ধাম ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। প্রকাশানন্দ প্রচার করিতে

লাগিলেন যে, গৌরচন্দ্র নিতান্ত ভণ্ড, তাই তিনি ক্ষৌরদিবসের প্রারম্ভেই কাশীধাম হইতে পলায়ন করিয়াছেন।

বৃন্দাবনে প্রায় দুইমাসকাল অবস্থান করিয়া মহাপ্রভু পুনরায় কাশীধামে প্রত্যাগমন করিলেন। এবারও তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য চন্দ্রশেখরের বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। গৌড়ের বাদশাহের মন্ত্রী সনাতন আসিয়া এই সময় মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সনাতনকে বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারশিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু দুইমাস কাল কাশীধামে অবস্থান করিলেন।

প্রভু কাশীতে আসিয়াছেন, প্রকাশানন্দের কর্ণে এ সংবাদ পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। তিনি প্রভুকে উদ্দেশ করিয়া অনেক প্রকার শ্লেষ করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীদের মধ্যে যদিও কেহ কেহ মহাপ্রভুর অবতারত্বে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন, তথাপি প্রকাশানন্দের ভয়ে কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহসী হইলেন না। একদিন এক মহারাষ্ট্র দেশীয় পণ্ডিত প্রকাশানন্দকে বলিলেন যে, গৌরাঙ্গ সত্য সত্যই শ্রীকৃষ্ণের অবতার, আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবেন। প্রকাশানন্দ মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতের কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তোমাদের সে ভণ্ডকে বলিও, প্রকাশানন্দ জীবিত থাকিতে কাশীধামে তাঁহার কোন ভণ্ডামীর প্রশ্রয় হইবে না।" মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর নিকট গিয়া প্রকাশানন্দের কথা বলিবামাত্র প্রভু হো হো করিয়া সমস্ত হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

প্রভু তপনের বাড়ীতে ভিক্ষা করেন, চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে বাস করেন, গঙ্গাস্নানান্তর বিন্দুমাধব হরিকে দর্শন করিয়া গৃহাভ্যন্তরে গমন করেন। গৃহে বসিয়া সনাতনধর্ম্ম শিক্ষা দেন। প্রভু যখন গঙ্গাস্নান করিতে যান এবং বিন্দুমাধব হরি দর্শন করেন, তখন বাহিরের

লোকে মাত্র তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে। প্রভু যখন যে পথ দিয়া গমন করেন, সেই পথেই কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া প্রভুর সন্দর্শনলাভ করে।

একদিন পূর্ব্বোক্ত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ আসিয়া মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসীদিগকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছি; সুতরাং আমার কুটীরে আপনার সহিত সন্ন্যাসীদেরও সাক্ষাৎকার হইবে।" প্রভু মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন।

নিমন্ত্রণের দিন প্রকাশানন্দ যথারীতি শিষ্যমণ্ডলী-সমভিব্যাহারে আগেই গিয়া সভা জাঁকাইয়া বসিলেন। "আজ যদি নবদ্বীপের ভণ্ড বৈরাগীটা বিশেষ বাড়াবাড়ি করে, তাহা হইলে তাহাকে একবারে সভামধ্যেই অপদস্থ করিয়া দিব"—প্রকাশানন্দ এই প্রতিজ্ঞা লইয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভুও "হরে কৃষ্ণ" "হরে কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে চারি-জন শিষ্য সমভিব্যাহারে সভায় গিয়া উপস্থিত। দূর হইতে সন্ন্যাসিগণ মহাপ্রভুকে দেখিয়াই ঐ "চৈতন্য আসিতেছেন" বলিয়া তুমুল ধ্বনি তুলিলেন। সকলে উঁকি মারিয়া দেখিল যে, কমনীয় মুখমণ্ডল ও উন্নত-ললাটবিশিষ্ট এক তপ্তকাঞ্চন যুবাপুরুষ ধীরমন্থরগতিতে নতশিরে আসিতেছেন। প্রভু সভামধ্যে আসিয়াই যুক্তকরে সকলকে প্রণাম করিলেন। বাহিরে পাদ-প্রক্ষালনের জল ছিল, প্রভু পাদ প্রক্ষালন করিয়া সেইখানেই উপবেশন করিলেন।

সন্ন্যাসিগণ একদৃষ্টে তাঁহার দিকে তাকাইয়া দেখেন, প্রভুর মুখে কোন প্রকার ঔদ্ধত্যের ভাব নাই, অতি নিরীহ কোমল ও প্রফুল্ল মুখখানি। বয়স যদিও একত্রিশ বৎসর তথাচ যেন বালক। প্রভুর মুখের দিকে তাকাইতেই প্রকাশানন্দের মন হইতে সকল প্রকার বৈর ভাব তিরোহিত হইল।

প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুকে অপবিত্র স্থানে বসিতে দেখিয়া প্রভুর দীনভাবে একবারে বিমুগ্ধ হইলেন এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহাপ্রভুকে সভামধ্যে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সহস্রাধিক সন্ন্যাসীও উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহাপ্রভুকে সভাক্ষেত্রে আহ্বান করিলেন।

মহাপ্রভু করজোড়ে অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "আমার সম্প্রদায় অতি নীচ, আপনার সম্প্রদায় অতি উচ্চ; আপনাদের সভায় বসিবার আমরা উপযুক্ত পাত্র নহি।" প্রকাশানন্দ এই কথা শুনিয়া প্রভুর হাত ধরিয়া সভামধ্যে লইয়া বসাইলেন। প্রকাশানন্দের মন হইতে তখন মহাপ্রভুর প্রতি বিদ্বেষভাব দূর হইয়াছে, সেইস্থানে শ্রদ্ধা-ভাবের উদয় হইয়াছে। তিনি এখন বুঝিতে পারিয়াছেন, প্রভুর প্রতি তিনি ক্রোধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি প্রভুর বিন্দুমাত্র ক্রোধ নাই। কিন্তু হঠাৎ যদি মহাপ্রভুর নিকট নিজের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে শিষ্যমণ্ডলীর নিকট তাঁহাকে হীনমতি প্রতিপন্ন হইতে হইবে, এই আশঙ্কায় প্রকাশানন্দ বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনি আমাদের একই সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী হইয়া আমাদের সহিত মিশেন না কেন? আপনি বেদ পাঠ করেন না, সন্ন্যাসীর পক্ষে দোষাবহ যে নৃত্যগীত তাহাতেই আপনি নিমগ্ন থাকেন।"

মহাপ্রভুর উত্তর শুনিবার জন্য সকলেই উৎকর্ণ হইয়া থাকিলেন। কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ! গুরুর আশ্রমে থাকাকালীন আমার মূর্খতা দর্শনে গুরুদেব আমাকে দুরূহ বেদ অধ্যয়ন করিতে না দিয়া সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া এই শ্লোকটি কণ্ঠস্থ করিতে বলেন :—

"হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

তদবধি আমি এই নাম জপই করিয়া আসিতেছি। একদিন গুরুদেবকে বলিয়াছিলাম "গুরো! আপনি যে নামমন্ত্র আমাকে শিখাইয়াছেন সে নাম করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে, আমি পাগলের মত হাসি, নাচি, গান করি—লোকে আমায় পাগল বলে।"

গুরুদেব আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, "ভালই হইয়াছে। তোমার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে। কৃষ্ণনামের ঐরূপই শক্তি।"

"কলিতে বেদপাঠের যে প্রয়োজনীয়তা আছে, আমি এরূপ মনে করি না; একমাত্র হরিনামই সার পদার্থ। আমি যে ইচ্ছা করিয়া নাচি গাই তাহা নহে, হরিনাম করিতে করিতে আমার যে ভাবোন্মত্ততা আইসে সেই ভাবোন্মত্ততাই আমাকে নাচায়।"

প্রকাশানন্দ প্রভুর সরল কথায় যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন হইতে তখনও অভিমান যায় নাই। তিনি ভাবিলেন, এই নবীন সন্ন্যাসী সিদ্ধপুরুষ বটে, কিন্তু বেদপাঠে ইহার রুচি জন্মাইতে হইবে। এই সব ভাবিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, "শ্রীপাদ! হরিনাম করুন, তাহাতে কোনই আপত্তি নাই, কিন্তু আপনি বেদ পাঠ করুন।"

প্রভু বলিলেন, "দেখুন বেদ ঈশ্বরের বচন, বেদে কখনও ভ্রমপ্রমাদ সম্ভবে না। বেদের যাহা মুখ্য অর্থ তাহা অবশ্য মানিব, কিন্তু শঙ্কর বেদের যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহা ঈশ্বরের বাক্য নহে, শঙ্করের নিজস্ব বাক্য। বেদের অর্থ ত অতি পরিষ্কাররূপে সূত্রে লিখিত রহিয়াছে, তাহার আবার ভাষ্য কিসের? শঙ্করাচার্য্য বেদের ভাষ্য করিয়া বেদের অর্থকে আরও দুরূহ করিয়াই তুলিয়াছেন।"

মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া সন্ন্যাসীরা তাঁহার উপর অতিমাত্রায় বিরক্ত

হইয়া উঠিলেন। প্রকাশানন্দ বলিলেন, "শঙ্করাচার্য্য জগতের গুরু. তাঁহাকে এত বড় কথা বলিবার আপনার কি অধিকার আছে?"

তখন মহাপ্রভু শঙ্করভাষ্যের বিশ্লেষণ করিয়া তাহার নানাপ্রকার দোষ ও ত্রুটি দেখাইতে লাগিলেন আর সেই বিরাট সন্ন্যাসিসঙ্ঘ চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় মহাপ্রভুর ভাব ও যুক্তিময়ী বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন।

প্রকাশানন্দ বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনি যে অগাধ পণ্ডিত তাহার পরিচয় পাওয়া গেল, শঙ্কর-ভাষ্যেরও যে সমুদয় দোষত্রুটি আপনি দেখাইয়াছেন, তাহাও অতি সত্য; এখন বেদের মুখ্য অর্থ করিয়া আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করুন।"

মহাপ্রভু বেদের এক একটি সূত্র ধরিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিলেন। তাহার সারমর্ম্ম এই যে, ভগবান ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ—সচ্চিদানন্দময়। ভগবানে প্রেমই জীবের পরমপুরুষার্থ।

সন্ন্যাসিগণের এবার আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, মহাপ্রভু শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষাও বড়। তখন প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুকে বলিলেন, "শ্রীপাদ! এতদিন আপনার নিন্দা করিয়া আসিয়াছি। আজ বুঝিলাম আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ ও বেদ। বেদের যথার্থ ব্যাখ্যা আজ আপনার মুখেই শুনিতে পাইলাম। আজ আমার দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, আজ আমি সত্যই বুঝিতে পারিলাম যে, ভক্তিই ভগবানকে লাভ করিবার একমাত্র সোপান। আজ হইতে আপনি আমার গুরু—আমি আপনার অধম শিষ্য। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর যে কোন সত্যবস্তু সংসারে নাই, আজ ইহা উপলব্ধি হইল।" তখন প্রকাশানন্দের অসংখ্য শিষ্যগণ "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

মহাপ্রভুকে সন্ন্যাসিগণ মহাসমাদরে ভোজনে বসাইলেন। ভোজনান্তে মহাপ্রভু বাসায় চলিয়া গেলে সন্ন্যাসীদের মধ্যে মহাপ্রভু সম্বন্ধে নানা তর্ক-

বিতর্ক আরম্ভ হইল। প্রকাশানন্দ বলিলেন, "এতদিন শঙ্করের অদ্বৈত মত প্রতিপালন করিয়া নিজ অন্তরাত্মাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছি। মুখে বলিয়াছি বটে, এক ভগবান্ ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ নাই, কিন্তু মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা করিতে পারি নাই।" প্রকাশানন্দের কথা শুনিয়া যাবতীয় সন্ন্যাসী তাঁহার মতের পোষকতা করিলেন। শ্রীচৈতন্য-বিরোধী প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া দলে দলে নানা সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতেরা আসিয়া মহাপ্রভুকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। যে বারাণসীধামে কৃষ্ণকথা কচিৎ শুনা যাইত, সেই বারাণসীধাম কৃষ্ণনামের কল কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল, মহাপ্রভুর স্নান ও ভোজনের পর্য্যন্ত অবকাশ থাকিল না —দলে দলে লোক আসিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে লাগিল।

প্রভু এতদিন নিজের প্রেমভাব গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন দেখিলেন যে, তাঁহার সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে এবং সকলে হরিনামে উন্মত্ত হইয়াছে। তখন হইতে প্রভুও বিন্দুমাধব-দর্শনান্তে কীর্ত্তন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। একদিন প্রভু বাহ্যজ্ঞানশূন্য-হইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, প্রকাশানন্দ দাঁড়াইয়া শুনিতেছেন। চারিপার্শে প্রভুকে ঘেরিয়া বহুলোক। প্রভু ইহার কিছুই জানেন না। লোকজনের কলরবে প্রভুর চৈতন্যোদয় হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রকাশানন্দ। প্রভু প্রকাশানন্দের হাত ধরিয়া তুলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, "আপনি জগদ্‌গুরু, আমি আপনার শিষ্যেরও উপযুক্ত নহি।" প্রকাশানন্দ জিভ কাটিয়া বলিলেন, "প্রভু বলেন কি? আপনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের অবতার, আমি আপনার দাসানুদাস, আপনার কৃপা লাভ করিলে আমি কৃতার্থ হইব।"

এইভাবে মহাপ্রভু ও প্রকাশানন্দে অনেক কথা হইলে মহাপ্রভু

বাসায় চলিয়া গেলেন। প্রকাশানন্দও ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়া যাইলেন। বাসায় যাইবার পর প্রকাশানন্দের মতি-গতির পরিবর্তন হইল। যে প্রকাশানন্দ মায়াবাদী তেজস্বী সন্ন্যাসী ছিলেন, তিনি এখন প্রেম-ভিখারিণী অবলার ন্যায় হইলেন। রাধাভাবে ভজনা করিয়া ভগবানকে লাভ করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইলেন। এতদিন তিনি যাহাদিগের সহিত মিশিয়া মায়াবাদী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিয়াছেন, তাহাদিগকে "নরপশু" আখ্যায় আখ্যায়িত করিলেন। কাশীনগরীতে পর্য্যন্ত তাঁহার বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইল। তিনি মহাপ্রভুর ন্যায় দিনরাত আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি যেদিকে তাকান সেইদিকে যেন সোনার গৌরাঙ্গ দণ্ডায়মান। বেদপাঠে তাঁহার অরুচি জন্মিল, তাঁহার জপ, তপ, প্রাণায়াম দূরে গেল—নৃত্যগীতই একমাত্র সার হইল। একদিন রাত্রিকালে প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর নিকট যাইয়া তাহার চরণে পতিত হইতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহার গলা ধরিয়া অচেতন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। প্রকাশানন্দ প্রভুকে ছাড়িয়া কিছুতেই কাশীতে থাকিতে সম্মত হইলেন না, প্রভু তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "বৃন্দাবনে তুমি আমার সাক্ষাৎ লাভ করিবে। তুমি যখনই আমাকে স্মরণ করিবে, তখনই আমাকে দেখিতে পাইবে।" অতঃপর প্রকাশানন্দের আনন্দ দেখিয়া প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "আজ তোমার যে আনন্দ দেখিতেছি, এই আনন্দ তোমার দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকুক ; আজ হইতে তোমার নাম "প্রবোধানন্দ" হইল।"

অতঃপর প্রভু একপথে নীলাচলে চলিয়া আসিলেন, প্রকাশানন্দও অন্যপথে বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। যে প্রকাশানন্দের পাছে সতত দশ সহস্র শিষ্য ঘুরিত ফিরিত এবং নানা দিগ্দেশ হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী আসিয়া যাঁহার সহিত তর্ক-বিতর্ক করিত, আজ সেই প্রকাশানন্দ

বৃন্দাবনের নন্দকূপে নিভৃতে একাকী বাস করিতে লাগিলেন। যে ভক্তি ও প্রেম প্রকাশানন্দের নিকট পূর্ব্বে কাপুরুষের ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল, সেই ভক্তি ও প্রেম এক্ষণে তাঁহার একমাত্র আরাধনার উপাদান হইল।

প্রকাশানন্দকে অতঃপর আমরা প্রবোধানন্দ নামেই অভিহিত করিব। প্রবোধানন্দ যে সময়ে বৃন্দাবনে গিয়াছেন, তখন রূপ-সনাতন বৃন্দাবনে গমন করেন নাই, তবে লোকনাথ, ভূগর্ভ ও সুবুদ্ধি রায় গিয়াছেন। ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল ভট্টের উপর যে ক্রোধ ছিল তাহা দূর হইয়াছে। কয়েক বৎসর পরে গোপাল ভট্ট আসিয়া প্রবোধানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। ইহার পর রূপ-সনাতনও বৃন্দাবনে আসিলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় বনজঙ্গলাকীর্ণ বৃন্দাবন—যাহার নাম কেবল গ্রন্থমাত্রে দৃষ্ট হইত তাহা সত্যই "বৃন্দাবনে" পরিণত হইল।

মহাপ্রভু গোপালকে আপন ডোর, কৌপীন ও আসন আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। গোপাল ভট্ট "রাধারমণ" বিগ্রহ স্থাপন করেন। গোপাল "হরিভক্তিবিলাস" নামক বৈষ্ণবস্মৃতি রচনা করিয়াছিলেন।

চাপাল গোপাল

যাঁহারা মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রেম লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চাপাল গোপাল অন্যতম। মহাপ্রভু যখন কীর্ত্তনানন্দে নবদ্বীপকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, শ্রীবাসের বাটী যখন কীর্ত্তনের ধ্বনিতে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল, তখন চাপাল গোপাল নামে এক ব্রাহ্মণের তাহাতে ঈর্ষ্যানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। চাপাল কীর্ত্তনীয়াদিগকে যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করিতেন। বিশেষতঃ শ্রীবাসের বাটীই কীর্ত্তনের কেন্দ্রস্থল ছিল বলিয়া চাপাল গোপালের ক্রোধটা পূর্ণমাত্রায় পড়িয়াছিল সেই শ্রীবাসের উপর। কি করিয়া লোকসমাজে শ্রীবাসকে ঘৃণিত করিবেন, গোপাল চাপালের ইহাই ছিল লক্ষ্য। একদিন যখন মহাপ্রভু ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবাসের বাটীতে কীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা, তখন এই গোপাল চাপাল যাইয়া শ্রীবাসের বহির্ব্বাটীতে মদ্যপায়ী তান্ত্রিকেরা যেভাবে পূজার সাজ-সজ্জা ও আয়োজনাদি করে সেইরূপ করিল, একভাণ্ড মদ্যও সেইখানে রাখিয়া দিয়া আসিল। পরদিন প্রাতে শ্রীবাস বহির্ব্বাটীতে আসিয়া এই কাণ্ড দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, উহা চাপাল গোপালের কার্য্য ছাড়া আর কাহারও নহে। তিনি প্রতিবেশীদিগকে ডাকিয়া সেই দৃশ্য দেখাইলেন এবং সেইস্থান লেপিয়া পরিষ্কৃত করিলেন।

এদিকে দুইদিন যাইতে না যাইতে চাপাল গোপালের অঙ্গে কুষ্ঠব্যাধি দেখা দিল। চাপাল গোপাল টোলে ছাত্রদিগকে পড়াইতেন। ছাত্রেরা প্রথমে চাপালের এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া বলিল, "আপনার যে

কুষ্ঠব্যাধি হইবার উপক্রম হইয়াছে।" চাপাল শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "সে কি কথা, আমি নিষ্ঠাবান শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, নিত্য শিব পূজা করি, আমার কেন কুষ্ঠব্যাধি হইবে?" কিন্তু কুষ্ঠব্যাধি চাপালের চপলতায় স্থির থাকিল না। তাঁহার সমস্ত অঙ্গ খসিয়া পড়িতে লাগিল—দুর্গন্ধে কেহ তাঁহার নিকটে যাইতে পারিত না। তাঁহার স্ত্রীপুত্রেরা একেই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিল না; কেন না, চাপাল গোপাল যত শাস্ত্রই পড়ুন, তিনি তাঁহার স্ত্রীপুত্রের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিতেন। তাহারা বাড়ীর বাহিরে একখানা চালা বাঁধিয়া দিল, চাপাল তাহারই মধ্যে বাস করিতেন, তাঁহার স্ত্রী নাকে কাপড় দিয়া তাঁহাকে দুবেলা দুমুঠি ভাত দিয়া আসিত। চাপাল প্রতিদিন অপরাহ্নে লাঠিতে ভর দিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া বসিতেন এবং আপন ভাগ্যের কথা ভাবিতেন। একদিন নিমাইকে দেখিয়া চাপাল গলদশ্রুনয়নে তাঁহাকে বলিলেন, "ওহে নিমাই পণ্ডিত, আমি শুনিয়াছি তুমি নাকি বড় বড় ব্যাধি ভাল করিতে পার, তা আমাকে নিরাময় করিয়া দেও না কেন?" নিমাই দেখিলেন, কৃতকর্ম্মের জন্য চাপাল গোপালের তখনও বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হয় নাই, সেই জন্য সেই আত্মম্ভরিতা তখনও চাপালের মনে সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই তিনি তাঁহার দম্ভনাশের জন্য বলিলেন, "দেখ, তুমি ভক্তের অপমান করিয়াছ, তোমাকে আরও কষ্ট ভোগ করিতে হইবে।" এই বলিয়া নিমাই পণ্ডিত চলিয়া গেলেন। এদিকে চাপাল গোপালের কুষ্ঠব্যাধি দিন দিন বিস্তৃত হইতে বিস্তৃততর হইতে লাগিল। চাপাল আর নবদ্বীপে না থাকিতে পারিয়া মুক্তিক্ষেত্র বারাণসীধামে যাইয়া বিশ্বেশ্বরের নিকট হত্যা দিলেন। রাত্রিকালে চাপাল স্বপ্নযোগে দেখিলেন, বিশ্বেশ্বর তাঁহাকে বলিতেছেন যে, নবদ্বীপে যিনি শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন তিনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার

চরণ ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে পারিলে তুই সর্ব্বরোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবি।"

বিশ্বেশ্বরের আদেশ পাইয়া চাপাল বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীচৈতন্যের সন্ধান করিতে লাগিলেন। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে ফুলিয়া গ্রামে চাপালের ভাগ্যে মহাপ্রভুর দর্শন লাভ হইল। চাপাল তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন," প্রভু আর কত দিন আমাকে এইভাবে কষ্ট দিবে?" প্রভু বলিলেন, "দেখ আমার নিকট তুমি কোন অপরাধ কর নাই, শ্রীবাসের নিকটই তুমি অপরাধী। শ্রীবাসের নিকট ক্ষমা চাও, শ্রীবাস ক্ষমা করিলেই তোমার দেহ ব্যাধিমুক্ত হইবে।" চাপাল আর কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীবাসের বাটীতে গিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পরম দয়াল শ্রীবাস তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। চাপাল গোপালের কুষ্ঠব্যাধি সেই দিন হইতে নিরাময় হইয়া গেল। চাপাল তদবধি মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত হইয়া উঠিলেন, আর তিনি বৈষ্ণব দেখিয়া কখনও ঘৃণা বা ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ করিতেন না। ভগবানাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও চাপাল গোপালের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে কোল দিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শত্রু মিত্র সকলের প্রতি সমদর্শী ছিলেন।

রামচন্দ্র খাঁ

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য শান্তিপুরে শচীমাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নীলাচলে যাইবার পথে প্রথমে ছত্রভোগে আসিয়া উপস্থিত হন। এই ছত্রভোগ ডায়মণ্ড হারবার মহকুমায় মথুরাপুর থানার অধীন খাড়ি গ্রামে অবস্থিত। এইস্থান জয়নগর মজিলপুর হইতে আন্দাজ তিন ক্রোশ ব্যবধান। তখন ঐ পথে গঙ্গা প্রবাহিত হইতেন। এই ছত্রভোগ শ্রীগঙ্গার তখনকার শেষ সীমা বলিয়া একটী লক্ষ্মীসম্পন্ন নগর ছিল। এখানে অম্বুলিঙ্গ ঘাটে জলময় শিব আছেন। প্রভু বরাবর গঙ্গার কূল ধরিয়া এইখানে উপস্থিত হন। কৌপীন পরিয়া সন্ন্যাসী হইবার পর প্রভু এই সর্ব্বপ্রথম একটি তীর্থস্থান দর্শন করেন। গঙ্গা সেখানে শতমুখী, তাই মহাপ্রভু যখন সেই আলিঙ্গ ঘাটে ঝাঁপ দিয়া স্নান করিলেন, তখন তাঁহার নয়ন দিয়াও শতধারা ঝরিতে লাগিল।

"পৃথিবীতে বহে একশতমুখী ধার।
প্রভুর নয়নে বহে শতমুখী আর" ॥

প্রভুর ভক্তগণ মহাশব্দ করিয়া হরিধ্বনি করিতেছে, তাহা শুনিয়া রামচন্দ্র খাঁ সেখানে আসিলেন। ছত্রভোগ গৌড়রাজ্যের শেষ সীমানা, তখন গৌড়রাজ্য হোসেন শাহের অধীন। রামচন্দ্র হোসেন শাহের অধীনে গৌড়ের দক্ষিণাংশ শাসন করিতেন। তিনি এ অঞ্চলের রাজা ছিলেন। ভক্তগণের কলরব শুনিয়া সেখানে আসিলেন। তিনি রাজা, রাজার মনে মনে ঐশ্বর্য্যের অভিমান যথেষ্টই ছিল, তাই তিনি দোলায় চড়িয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কি

আকর্ষণী শক্তি! তাঁহাকে দেখিলে কোটিপতিরও ঐশ্বর্য্যাভিমান মূহূর্ত্তে তিরোহিত হয়। প্রভুর দিকে চোখ পড়িতেই রামচন্দ্র দোলা হইতে অবতরণ করিয়া প্রভুর চরণে নিপতিত হইলেন। কিন্তু প্রভুর ত সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। প্রভু যে তখন শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দর্শনের আনন্দে আত্মহারা! তিনি তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কেবল হা হা জগন্নাথ বলিয়া ডাকিতেছেন, কাজেই রামচন্দ্রকে কিছুক্ষণ প্রভুর চরণতলেই থাকিতে হইল। প্রভুর নয়নে অবিরল বাষ্পরাশি দেখিয়া রামচন্দ্র খাঁও চোখের জল সংবরণ করিতে পারিলেন না, তাহারও নয়ন দিয়া প্রেমাশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

"দেখিয়া প্রভুর আর্ত্তি রামচন্দ্র খান।
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল সজ্জনের প্রাণ॥
কোন মতে এ আর্ত্তির হয় সম্বরণ।
কান্দে আর এই মতে চিন্তে মনে মন॥"

নিত্যানন্দ প্রভূকে বারংবার ডাকিয়া ডাকিয়া বলিলেন,"প্রভু আপনার পদতলে একটি ভদ্রলোক পড়িয়া, একবার ইঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন।" নিত্যানন্দের কথা শুনিয়া প্রভুর কথঞ্চিৎ সংজ্ঞা হইল, তিনি রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে হে?" রামচন্দ্র বলিলেন, "আমি আপনার দাসানুদাস।" নিত্যানন্দ বলিলেন, "ইনি এ দেশের অধিকারী"। প্রভু বলিলেন, "বেশ ভাল কথা! আচ্ছা অধিকারী মহাশয় আমি কাল এখান হইতে নীলাচলে যাইতে চাই, তুমি তাহার কোন ব্যবস্থা করিতে পার?" নীলাচলচন্দ্র বলিতে প্রভু একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। রামচন্দ্র বলিলেন, "যদিও এখন গৌড়রাজ ও উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রে ভয়ানক বিবাদ চলিতেছে, যদিও উভয় দেশের রাজাই

এখন উভয়ের রাজ্যসীমায় ত্রিশূল পুতিয়াছেন, যদিও এ রাজ্য হইতে উড়িষ্যারাজ্যে কাহাকেও প্রেরণ করা আমার সাধ্যাতীত, তথাচ প্রভু যখন যাইবেন, তখন যে ভাবে হউক, প্রভুকে আমি উড়িষ্যা যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।" রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া প্রভু তাঁহার প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিলেন—রামচন্দ্র কৃতার্থ হইলেন।

রামচন্দ্র ঘোর শাক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রভুর প্রসাদাৎ মহা বৈষ্ণব হইয়া উঠিলেন। প্রভুকে তিনি তাঁহার পঞ্চ গোষ্ঠী অর্থাৎ পঞ্চ সঙ্গী সহ ভিক্ষা গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ করিলেন। সারারাত্রি প্রভু শিষ্যগণসহ কীর্ত্তনে কাটাইলেন। প্রত্যূষে রামচন্দ্র প্রভুর জন্য অতি কষ্টে নৌকা ঠিক করিয়া দিলেন, প্রভু সেই নৌকায় উঠিয়া শিষ্যগণ সহ মহানন্দে কীর্ত্তন করিতে করিতে উড়িষ্যা যাত্রা করিলেন।

স্বরূপ দামোদর

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে স্বরূপ দামোদর অন্যতম। স্বরূপ দামোদরের পূর্ব্ব নাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য্য। তিনি নবদ্বীপধামে গোপনে বাস করিতেন। অন্তরঙ্গ সেবা করিতেন, হৈ-চৈয়ের মধ্যে কখনও যোগদান করিতেন না। এক মহাপ্রভু ছাড়া স্বরূপ দামোদরের মাহাত্ম্য আর কেহ বুঝিতে পারিতেন না। মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তখন পুরুষোত্তম প্রভুর উপর রাগ করিয়া যে বারাণসীধামে ভক্তির নামগন্ধ ছিল না সেইখানে চলিয়া যান এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর তাঁহার নাম হইল স্বরূপ দামোদর। তিনি প্রভুকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন, শুধু জানা নহে, তিনিই প্রভুর পূর্ণব্রহ্মত্ব স্বরচিত গ্রন্থে প্রথমে প্রকাশ করেন। শ্রীরাধা যেমন কৃষ্ণের উপর মান করিতেন,—কালমুখ আর দেখিবেন না বলিয়া অভিমান করিতেন, স্বরূপ দামোদরও সেইরূপ মহাপ্রভুর উপর মান করিয়াছিলেন। প্রভু যখন নীলাচলে যাইয়া বাস করিতে থাকেন, তখন স্বরূপ দামোদর নীলাচলে গিয়া প্রভুর সহিত বাস করিয়াছিলেন। স্বরূপ প্রভুকে দাসের ন্যায় সেবা করিতেন, সখারূপে তাঁহার সেবা করিতেন, মাতারূপে তাঁহাকে পালন করিতেন। প্রভুকে যত্নে রক্ষা করিতেন, প্রভুকে আহার করাইয়া নিজে আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেন। প্রভুকে তিনি অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত নামজপ করিতে দিতেন না। প্রভু নামজপ করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলে স্বরূপ প্রভুকে ধরিয়া

শয্যায় শয়ন করাইতেন। নবদ্বীপধামে শচীমাতা প্রভুকে যেভাবে পুত্রবাৎসল্যে স্নেহ করিতেন, স্বরূপও মহাপ্রভুকে সেইরূপ করিতেন। প্রভু যখন কৃষ্ণবিরহে রাই উন্মাদিনীভাবে ধাবিত হইতেন, স্বরূপ অমনি তাঁহার সম্মুখে ললিতারূপে উপস্থিত হইতেন। প্রভু স্বরূপকে ললিতা বলিয়া ডাকিতেন। প্রভু যখন রাধারূপে কৃষ্ণদর্শনে বৃন্দাবনে যাইতেন, স্বরূপ তখন ললিতারূপে তাঁহার অনুসঙ্গী হইতেন। প্রভু যখন কৃষ্ণবিরহে মূর্চ্ছিত হইতেন, স্বরূপ তখন তাঁহার কর্ণে কৃষ্ণ নাম দিতেন। তাহাতে প্রভুর চেতনা হইত। বস্তুতঃ প্রভুর চিত্ত ও স্বরূপের চিত্ত এক হইয়া গিয়াছিল। প্রভু যখন যেভাবে ভাবিত হইতেন, স্বরূপও ঠিক তখনই সেইভাবে ভাবিত হইতেন। চন্দ্রোদয় নাটকে স্বরূপের এইরূপ বর্ণনা আছে—

"অহো রস ফলবান কৃষ্ণ ভগবান।
তার রসাচার্য্য ভাব হইতে মূর্ত্তিমান॥
সন্ন্যাসীর বেশ বহু প্রকাশ করিয়া।
অবতীর্ণ হইল লোকে কৃপাযুক্ত হইয়া॥
সর্ব্বলোক দামোদর স্বরূপ বলেন।
প্রেম হইতে অপৃথক তাঁহারে মানেন॥

প্রভু যখন গদগদ হইয়া কৃষ্ণরূপ বর্ণনা করিতেন, স্বরূপ তখন উৎকর্ণ হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেন। মহাপ্রভুর যাহা কিছু ভাব তাহা সম্ভোগ করিবার যদি কেহ ছিল তবে সে স্বরূপ। প্রভু দ্বাদশবর্ষকাল নীলাচলে থাকিয়া যে ব্রজরস সম্ভোগ করিয়াছিলেন তাহা প্রভুর দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই শুকাইয়া যাইত, যদি স্বরূপ তাহা পুস্তকাকারে রক্ষা না করিতেন। বস্তুতঃ মহাপ্রভু ছিলেন মেঘ, আর স্বরূপ নীলাম্বুধি। মহাপ্রভুর নয়ন দিয়া যে প্রেমরস ঝরিয়া পড়িয়াছিল, স্বরূপ তাহা আধারে

রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। প্রভু স্বরূপের গলা ধরিয়া নিভৃতে নির্জ্জনে বসিয়া যে ব্রজরস আস্বাদন করিতেন, স্বরূপ তাহা কড়চা ও সঙ্গীতে জীবন্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আজ যে আমরা মহাপ্রভুর অমৃতোপম লীলা-কাহিনী সবিস্তারে জানিতে পারিতেছি, তাহা স্বরূপ দামোদরেরই অনুগ্রহে। স্বরূপ দামোদর না থাকিলে প্রভুর দ্বাদশবর্ষব্যাপী লীলা-কাহিনী এতদিন পরে আমাদের জানিবার ও শুনিবার সুযোগ হইত না।

প্রভুর উপর মান করিয়া স্বরূপ কাশীধামে গিয়া চৈতন্যানন্দ গুরুর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গুরু তাঁহাকে বেদ পড়িতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু স্বরূপ বেদ না পড়িয়া সর্ব্বদা গৌররূপ ধ্যান করিতেন। শেষে প্রভুর বিরহ-জ্বালা যখন তাহার নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিল, তখন স্বরূপ বারাণসী ত্যাগ করিয়া একেবারে নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। তখন প্রভু দক্ষিণভারত ভ্রমণ করিয়া সবেমাত্র নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়া কাশী মিশ্রের বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। প্রভু যখন শুনিলেন নবদ্বীপের পুরুষোত্তম আচার্য্য অবধূতবেশে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন, তখন প্রভুর আনন্দ আর দেখে কে! উভয়ের নয়নের উপর উভয়ের নয়ন পড়িল। স্বরূপ ভাবে আত্মজ্ঞানহারা। অতিকষ্টে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি প্রভুর পায়ে পড়িলেন—

"হে লোকোল্লিত খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
সাম্যচ্ছাস্ত্র বিবাদয়া রসদয়া চিত্রার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তি বিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদ মন্দোদয়া।"

—চন্দ্রোদয় নাটক

অর্থাৎ হে দয়ানিধি শ্রীচৈতন্য! আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

স্বরূপ প্রভুর চরণে পড়িতে গেলে প্রভু দুই বাহু দিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনে অচৈতন্য হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। কতক্ষণ পরে উভয়ের বাহ্যজ্ঞান হইল। প্রভু বলিলেন, "তুমি আসিয়া ভালই করিয়াছ, তুমি যে আসিবে আমি তাহা কাল স্বপ্নে দেখিতেছিলাম।"

স্বরূপ বলিলেন "প্রভু আমি কি আর স্বইচ্ছায় আসিয়াছি? তোমারই কৃপার আকর্ষণ আমাকে এখানে টানিয়া আনিয়াছে।" অতঃপর নিত্যানন্দ ও পরমানন্দ পুরীকে প্রণাম করিয়া স্বরূপ ভক্তগণের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি করিলেন। প্রভু স্বরূপকে থাকিবার জন্য একখানি ঘর ও সেবার জন্য একজন ভৃত্য দিলেন।

পরমানন্দ পুরী

পরমানন্দ পুরীর নিবাস ছিল ত্রিহুত জেলায়। ইনি মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন, ঈশ্বর পুরী ছিলেন ইঁহার ধর্ম্মভাই। পরমানন্দ দেখিতে পরম আনন্দদায়কই ছিলেন বটে! পূর্ব্বে প্রভুর সহিত তাঁহার কোন পরিচয় ছিল না, কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিয়াছিলেন। তখন হিন্দু-মুসলমানে চারিদিকে বিবাদ। রাজপথ বিঘ্নপরিপূর্ণ। কিন্তু পরমানন্দ মহাপ্রভুর দিকে এতটা আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে, তিনি পথের বাধাবিঘ্নের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিয়া আসিলেন। পথিমধ্যে শুনিতে পাইলেন, প্রভু দক্ষিণদেশে গিয়াছেন। তিনিও তীর্থভ্রমণের ছল করিয়া দক্ষিণদেশে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া শুনিতে পাইলেন, প্রভু উত্তর দেশে গিয়াছেন, অমনি পরমানন্দও উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। কিন্তু সেখানেও মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না! তখন পরমানন্দ স্থির করিলেন, মহাপ্রভু যেখানেই থাকুন, নবদ্বীপে গেলে নিশ্চয়ই তাঁহার সন্ধান পাওয়া যাইবে। ইহা স্থির করিয়া পরমানন্দ নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। নবদ্বীপে আসিয়াই একেবারে শচীমাতার গৃহে সমাগত হইলেন। শচীমাতার গৃহে তখন প্রায়ই সন্ন্যাসী আসিতেন, সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তিনি আর কোন ভয় করিতেন না। সন্ন্যাসী দেখিলেই তিনি তাঁহাকে আদর করিতেন, আর বলিতেন, "যদি নিমাইয়ের সহিত কখনও দেখা হয়, তাহা হইলে আমার সহিত তাহাকে একবার দেখা করিয়া যাইতে বলিস্।" পরমানন্দকে দেখিয়া শচীমাতার বোধ হইল,

যেন বিশ্বরূপ আসিয়াছেন। পুরা শচীমাতাকে নিমাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, শচীমাতা বলিতে পারিলেন না। তখন পরমানন্দের আশা নৈরাশ্যে পরিণত হইল। পরমানন্দ বিষন্নমুখে বসিয়া আছেন, এমন সময় নিত্যানন্দের প্রেরিত লোক নীলাচল হইতে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, প্রভু দক্ষিণাঞ্চল হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তখন নবদ্বীপের ভক্তগণের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল, সকলেই প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য নীলাচল-যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরমানন্দ পুরীর আর বিলম্ব সহিল না। তিনি কমলাকান্ত নামে প্রভুর একজন ভক্ত ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া নীলাচল যাত্রা করিলেন। শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া প্রথমে শ্রীজগন্নাথের মন্দির পরমানন্দের নয়নগোচর হইল। পরমানন্দ কিন্তু মন্দিরের দিকে ফিরিয়াও তাকাইলেন না। তিনি যে আসিয়াছেন মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য। তাই তিনি মন্দিরকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—

"আগে না দেখিয়ে প্রভু তোমার চরণ।
গৌরচন্দ্র দেখিবারে করি অন্বেষণ॥
ইথে মোর যদ্যপি হইল অপরাধ।
তাহা ক্ষমি জগন্নাথে করিবে প্রসাদ॥
তুমি সে সর্ব্বজ্ঞ জান সবার অন্তর।
মোর উৎকণ্ঠার কথা তোমার গোচর॥
উৎকণ্ঠাতে লয়ে যায় কি করিব আমি।
ইহা জানি মোর অপরাধ ক্ষম তুমি।"

পরমানন্দ মন্দিরের দিকে তাকাইয়া এই কথা বলিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, মন্দিরের সম্মুখে জনতা, আর সেই জনতার মধ্যে একজন দীর্ঘাকৃতি সন্ন্যাসী—এত দীর্ঘ যে সেই জনতা ভেদ করিয়া

তাঁহার মাথা দেখা যাইতেছে। সন্ন্যাসীর প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে তিনি তাকাইয়া দেখিলেন—যেন সমস্ত অঙ্গ দিয়া সোণার কণা ছড়াইয়া পড়িতেছে। সন্ন্যাসীর নিকটবর্ত্তী হইয়া পরমানন্দ দেখিতে পাইলেন যে, সন্ন্যাসীর বয়স অল্প। ইহা দেখিয়া পরমানন্দ ভাবিলেন, ইনিই তাঁহার হারানিধি গৌরচন্দ্র হইবেন। মহাপ্রভুর রূপ দেখিয়া পরমানন্দ গোঁসাইয়ের চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি প্রভুর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতেই কমলাকান্ত মহাপ্রভুকে বলিলেন, "ইনি পরমানন্দ পুরী, ইনি ভারতবিখ্যাত।" প্রভু এই কথা শুনিবামাত্র পুরী গোঁসাইয়ের চরণে প্রণাম করিলেন। পুরী আর কি করেন? প্রভুকে উঠাইয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিলেন। অতঃপর প্রভু তাঁহাকে নিজ বাসায় লইয়া গিয়া একখানি ঘর ও সেবা-পরিচর্য্যার নিমিত্ত একজন ভৃত্য দিলেন।

গোবিন্দ

ইহার পর শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর সেবক গোবিন্দ আসিয়া প্রভুর সমক্ষে দাঁড়াইলেন। গোবিন্দ বলিলেন, "গুরুদেব যখন দেহত্যাগ করেন, তখন আমাকে ও কাশীশ্বরকে আসিয়া আপনার সেবা করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। আর তিনি একথাও বলিয়া গিয়াছেন, তিনি যখন গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন, তখন আমি তাঁহার মধুর নটেন্দ্ররূপ দেখিয়াছি, দেখিয়া তাহা হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছি।" ঈশ্বর পুরী মহাপ্রভুর গুরু ছিলেন, পাছে মহাপ্রভু তাঁহাকে দেখিয়া গুরুভাবে ভক্তি ও প্রণাম করেন, সেই ভয়ে ঈশ্বর পুরী শেষ সময়ে প্রভুর নিকট নিজে না আসিয়া গোবিন্দ ও কাশীশ্বরকে পাঠাইয়া দিলেন। সার্ব্বভৌম গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কায়স্থ, ঈশ্বর পুরীর কি কি কাজ তুমি করিতে? গোবিন্দ বলিলেন, "কেন সব কাজই করিতাম—এমন কি তাঁহার জন্য রন্ধন পর্য্যন্ত করিতাম।" সার্ব্বভৌম একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "পুরী গোসাঞি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইয়া শূদ্র সেবক রাখিলেন কিরূপে?" প্রভু বলিলেন, "মহাপুরুষেরা লোকের বিচার করেন না, তাহার মাহাত্ম্যই দেখিয়া থাকেন।" তখন—

> "সার্ব্বভৌম বলে প্রভু এই সুনিশ্চয়।
> কৃষ্ণ বৈষ্ণবের চেষ্টা লৌকিক না হয়॥"
>
> —চন্দ্রোদয়।

মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা সর্ব্বভৌম! এখন আমি কি করি? গোবিন্দ আমার গুরুর সেবা করিয়াছেন অতএব

তিনি আমার পূজ্য। অথচ গুরু ইহাকে আমার সেবা করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। এখন আমি কি করি?" সার্ব্বভৌম বলিয়াছিলেন, "গুরুর আজ্ঞা পালন করাই উচিত।" তখন মহাপ্রভু উঠিয়া গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিলেন। তদবধি গোবিন্দ প্রভুকে সেবা করিতে লাগিল।

অগ্রে কাশীশ্বর, দক্ষিণে পুরী গোঁসাঞি, বামে ভারতী গোঁসাঞি, পশ্চাতে স্বরূপ ও গোবিন্দ, মধ্যস্থানে শ্রীগোবিন্দ এইরূপে প্রভু জগন্নাথ-দর্শনে যাইতেন।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যখন শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরে জগন্নাথের বিগ্রহ আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হন এবং যখন পাণ্ডার দল তাঁহাকে মারিবার জন্য উদ্যত হয়, তখন যে ব্যক্তি মহাপ্রভুকে পাণ্ডাদের হাত হইতে উদ্ধার করেন তাঁহার নাম বাসুদেব সার্ব্বভৌম। এই বাসুদেব সার্ব্বভৌম পূর্ব্বে নবদ্বীপে টোল করিতেন, উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের আহ্বানে তিনি পুরীধামে আসিয়া তাঁহার দ্বারপণ্ডিতত্ব স্বীকার করেন, এবং টোল স্থাপন করিয়া বহুসংখ্যক ছাত্রকে বেদান্ত শিক্ষা দিতে থাকেন। সার্ব্বভৌমের পিতা বিশারদ ও মহাপ্রভুর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী উভয়েই সহাধ্যায়ী ছিলেন। মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্র সার্ব্বভৌমের সহাধ্যায়ী ছিলেন। বাসুদেব মহাপ্রভুকে নিজ আলয়ে লইয়া আসিয়া বলিলেন, "তুমি আর কখনও মন্দিরাভ্যন্তরে যাইও না, তোমার যেরূপ ভাব কোন্ সময় যে জগন্নাথের বেদীতে উঠিয়া বসিবে, তাহার স্থিরতা নাই।" সার্ব্বভৌম ঐশ্বর্য্য কামনা করিতেন। ঐশ্বর্য্য ব্যতীত অন্য কোন মূল্যবান সঙ্গতি যে ত্রিজগতে আছে, ইহা তিনি জানিতেন না। তিনি আপনি বড় হইবেন, বড় হইয়া অন্যের উপর প্রভুত্ব করিবেন, ইহাই তাঁহার জীবনের আশা। তাই তিনি পরদিবস মহাপ্রভুকে ডাকিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পক্ষান্তরে মহাপ্রভু ছিলেন বিনয়ের অবতার। তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদাহরি॥

অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই শুধু হরি-কীর্ত্তনে অধিকার পায়, যে ব্যক্তি তৃণের ন্যায় দীন ভাব ধরিয়া আপনি অপমান লইয়া অন্যকে মান দেয়। সার্ব্বভৌমের সঙ্কল্প তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা উড়াইয়া দিবেন। অগাধ শাস্ত্রবিদ্যা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির তাঁহার অভাব ছিল না। প্রভু আসিলে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে লইয়া নিভৃতে বসিলেন। সার্ব্বভৌম প্রভুকে বলিলেন, "আচ্ছা চৈতন্য, তুমি এই অল্প বয়সে এই ভাবুকের ধর্ম্ম কেন গ্রহণ করিলে? সন্ন্যাসীর পক্ষে নর্ত্তন, গায়ন অতি দূষণীয় কার্য্য, কিন্তু সেই হইল তোমার ভজন সাধন। তোমার বয়স অল্প, ইন্দ্রিয় দমনে রাখিতে হইবে, জ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত নর্ত্তন ও গায়নে কিরূপে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযত হইবে?"

প্রভু বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন, "দেখুন আমি নিতান্ত অজ্ঞ; আমি ভাল মন্দ বুঝি না, বুঝি না বলিয়াই আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "তুমি সন্ন্যাসীর ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছ, উহা ভাবুকের ধর্ম্ম অপেক্ষাও অনেক বড়। আমি তোমাকে জ্ঞানমার্গে টানিয়া লইব, তুমি আমার নিকট বেদ শ্রবণ কর, বেদ শুনিতে শুনিতে তোমাতে জ্ঞান স্ফুরিত হইবে, জ্ঞান হইলেই ইন্দ্রিয়দমনশক্তি বৃদ্ধি পাইবে। তুমি আমার নিকট প্রত্যহ অপরাহ্ণে বেদপাঠ শ্রবণ কর।"

প্রভু বলিলেন, "বেশ তাহাই হইবে, আমি আপনার নিকট প্রতিদিন বেদপাঠ শ্রবণ করিব।" পরদিবস শ্রীমন্দিরে সার্ব্বভৌমের সহিত প্রভু মিলিত হইলেন, উভয়ে সার্ব্বভৌমের বাটীতে আসিলেন। সার্ব্বভৌম বেদ খুলিয়া বসিলেন, প্রভু একমনে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। প্রভু এক-মনে নিবিষ্টচিত্তে সার্ব্বভৌমের নিকট বেদের ব্যাখ্যা শুনিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম বেদের এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন, "জগৎ মায়া, শ্রীভগবান মায়া, ভগবান আর কোন পৃথক বস্তু নাই, তুমি ভগবান।" সার্ব্বভৌমের

এই কথায় ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্দাবন, গোপীগণ এবং ভগবানে ভক্তি পর্য্যন্ত সমস্ত চলিয়া গেল, প্রভু যত এ সমস্ত কথা শুনিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার সমস্ত শরীর আশীবিষে দংশন করিতে লাগিল। প্রভু অসাধারণ ধৈর্য্যবলে সমস্ত সহ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। দ্বিতীয় দিবসেও সার্বভৌম ঐরূপ বেদপাঠ করিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রভুর নীরবতা দেখিয়া তাঁহার মনের স্ফূর্ত্তি নষ্ট হইল—তিনি দুঃখিতমনে পাঠ বন্ধ করিলেন। এইভাবে সাতদিন যাবৎ বেদব্যাখ্যা করিয়াও সার্ব্বভৌম যখন মহাপ্রভুর মুখে হাঁ না কোন কিছু শুনিতে পাইলেন না, তখন তিনি ক্ষুণ্ণমনে ভাবিলেন, এ আবার কি জ্বালাতন! আমি এত করিয়া বেদ পাঠ করিতেছি, লোকটি একবারও আমার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিল না! যাহা হউক, কাল একবার ইহার কারণটা জানিয়া লইব, যদি দেখি আমার ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করিতেছে, তবেই ইহার নিকট বেদ ব্যাখ্যা করিব, নতুবা বেদপাঠ বন্ধ করিয়া দিব।

আট দিনের দিন সার্ব্বভৌম বলিলেন, "তোমাকে এই আট দিন যাবৎ যে বেদপাঠ করিয়া শুনাইতেছি, তুমি ইহাতে হাঁ-না কিছুই বলিতেছ না কেন?"

প্রভু বলিলেন, "আপনি আমাকে বেদপাঠ শ্রবণ করিতে আদেশ করিয়াছেন, আমি তাহাই করিতেছি।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "আমি ত শুধু পাঠ করিতেছি না, ব্যাখ্যাও করিতেছি।" প্রভু বলিলেন, "বেদের সূক্তগুলি আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আপনি যে ব্যাখ্যা করিতেছেন সেই ব্যাখ্যা আমি কোন মতে বুঝিতে পারিতেছি না। শাস্ত্রে দেখিতে পাই, শঙ্করাচার্য্য বেদের প্রকৃত অর্থ আচ্ছাদন করিয়া মনোকল্পিত অর্থ করেন। শঙ্করাচার্য্যের যে ব্যাখ্যা তাহা মনোকল্পিত, তাহা বেদের সূক্ত ও

তাঁহার ব্যাখ্যা পাঠমাত্র জানা যায়। সূত্রের এক রূপ অর্থ, আর শঙ্করাচার্য্য কল্পনা-বলে আর এক রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন. আপনার ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যার অনুরূপ।"

সার্ব্বভৌম ইহা শুনিয়া মনে মনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং প্রকাশ্যে বলিলেন, "তাই ত কাশী কাঞ্চী কত স্থানের লোক আমার নিকট বেদ শিখিয়া গেল, এখন এক বালকের নিকট আমার পরাজয় স্বীকার করিতে হইল, বেশ তবে তুমি এখন আমায় বেদ শিখাও।"

প্রভু সার্ব্বভৌমের কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "শঙ্করাচার্য্যের ইচ্ছা মায়াবাদ-স্থাপন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যে কোন প্রকারে হউক মনোকল্পিত অর্থ করিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া মহাপ্রভু বেদের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। প্রভুর মুখে নূতন নূতন কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম একেবারে অবাক হইলেন, সন্ন্যাসী যে কেমন মহাপণ্ডিত এ জ্ঞান তাঁহার এতক্ষণ ছিল না, এখন ক্রমে ক্রমে হইতে লাগিল। এখন প্রভুর উপর সার্ব্বভৌমের যে ঘৃণা ছিল, তাহা দূর হইল, প্রভুকে তিনি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তবুও তাঁহার মনের ভিতর হইতে পাণ্ডিত্যাভিমান গেল না, তিনি নৈয়ায়িকদের ন্যায় অন্যায় নানা তর্কে প্রভুকে পরাভূত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রভু একে একে সার্ব্বভৌমের যুক্তি-তর্কসমূহ খণ্ডন করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। পরিশেষে প্রভু বলিলেন, "দেখুন, ভট্টাচার্য্য! শ্রীভগবদ্ভক্তি জীবের পরম সাধন, যাঁহারা সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়াছেন তাঁহারাও ভগবদ্ভক্তি কামনা করিয়া থাকেন।" প্রভু এই কথা বলিয়া ভাগবতের এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন—

"আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থ অপ্যুরুক্রমে
কুর্ব্বন্ত্য হৈতুকীং ভক্তিমিত্থংভূতো গুণোহরিঃ।"

সার্ব্বভৌম এই শ্লোকের নয় রকম অর্থ করিলেন। প্রভু সার্ব্ব-ভৌমের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং প্রভু নিজে শ্লোকটির অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া সার্ব্বভৌমকে চমকিত করিলেন। এই অষ্টাদশ প্রকারের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্যার্থ হইল— ভগবদ্ভক্তিই সর্ব্বজীবের পরম পুরুষার্থ। প্রভু যে পূর্ব্ব হইতে ভাবিয়া চিন্তিয়া উক্ত শ্লোকের ঐ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি উপস্থিত মতই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ব্যাখ্যা শুনিয়া সার্ব্বভৌমের সকল অহঙ্কার দূর হইল। তিনি প্রভুর চরণে পড়িতে গিয়া দেখিলেন, সেই গৌরাঙ্গ ত তাহার সম্মুখে নাই, এক ষড়ভুজ মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে। তিনি সেই মূর্ত্তি দেখিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

"অপূর্ব্ব ষড়ভুজ কোটি সূর্য্যময়।
দেখি মূর্চ্ছা গেলা সার্ব্বভৌম মহাশয়॥"

সার্ব্বভৌম যে ষড়ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করেন, তাহা অদ্যাপি শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দিরে অঙ্কিত রহিয়াছে।

তার পর ভগবান শ্রীচৈতন্যের স্পর্শে সার্ব্বভৌম চেতনা লাভ করিলেন। তখন হইতে সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পরম ভক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি অঞ্জলি পাতিয়া প্রভুর প্রসাদান্ন গ্রহণ করিলেন; প্রসাদান্ন গ্রহণের সময় সার্ব্বভৌম দুই হাত জোড় করিয়া মন্ত্র পড়িলেন—

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতম্বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্ত মাত্রেন ভোক্তব্যং নাত্রকাল বিচারণা॥
ন দেশ নিয়মস্তত্র ন কাল নিয়মস্তথা
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈ র্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥

এবার সার্ব্বভৌম কুলধর্ম্ম ছাড়িলেন। প্রভুর মহাপ্রসাদ গ্রহণের পর হইতে সার্ব্বভৌমের মন প্রাণ তাঁহাতেই নিবদ্ধ হইল। তিনি ভূতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, প্রভু তাঁহার গায়ে পদ্মহস্ত বুলাইতে লাগিলেন। তার পর প্রভু তাঁহাকে বুকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। প্রভুর সহিত সার্ব্বভৌম নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য না করিলে সমাজ-বন্ধন ছেদন হইয়াছে, ইহা প্রমাণিত হয় না। সার্ব্বভৌম অতঃপর একটি সুদীর্ঘ শ্লোক রচনা করিয়া মহাপ্রভুর বন্দনা করিয়াছিলেন।

"সার্ব্বভৌম হইল প্রভুর ভক্ত একজন।
মহাপ্রভু সেবা বিনা নাহি অন্য মন।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম।"

জয়দেব গোস্বামী

মধ্যযুগের বাঙ্গালার ইতিহাসে হরিনামামৃতপানে উন্মত্ত যেসকল ভক্তের ইতিবৃত্ত আছে, তন্মধ্যে গীতগোবিন্দের রচয়িতা জয়দেবের স্থান যে সর্ব্ব উচ্চে একথা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গালায় যখন লক্ষ্মণ সেন রাজত্ব করিতেছিলেন জয়দেব তখনই আবির্ভূত হন এবং লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় যে তাঁহার বিশেষ সমাদর ও প্রতিপত্তি ছিল তাহাও জানা যায়। বুলার সাহেব কাশ্মীর দেশে একখানি পুঁথি পান, সেই পুঁথি পাঠে জানা যায়, রাজা লক্ষ্মণ সেন জয়দেবকে "কবিরাজ" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। জয়দেব সুকবি ছিলেন, সুতরাং জয়দেবকে "কবিরাজ" উপাধি দেওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সেখ শুভোদয়া পাঠেও জানা যায় যে, রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় জয়দেব ও তদীয় পত্নী পদ্মাবতীর বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। আমরা এস্থলে বনমালী দাস-রচিত জয়দেব-চরিত-অবলম্বনে জয়দেবের পবিত্র জীবনী রচনা করিলাম।

দক্ষিণ দেশে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সেই ব্রাহ্মণের কোন সন্তান-সন্ততি না হওয়ায় ব্রাহ্মণ দম্পতী পুরুষোত্তমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিকট হত্যা দিয়া বলিল, "প্রভু যদি তোমার কৃপায় আমার পুত্রসন্তান হয়, তাহা হইলে উহাকে তোমার দাস করিয়া দিব, আর যদি কন্যাসন্তান হয়, তাহা হইলে উহাকে তোমার দাসী করিয়া দিব।" এই সময় এক পাণ্ডা আসিয়া 'তথাস্তু' বলিয়া ব্রাহ্মণের গলায় মালা পরাইয়া দিল। ব্রাহ্মণ মহাহৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিছুদিন পরে যথাসময়ে ব্রাহ্মণী এক কন্যাসন্তান

প্রসব করিলেন। কন্যার রূপ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ, স্থিরসৌদামিনীর ন্যায়। ব্রাহ্মণ সাধ করিয়া কন্যার নাম 'পদ্মাবতী' রাখিলেন। ক্রমে পদ্মাবতী দ্বাদশ বর্ষে উপনীত হইল। বিবাহের বয়স হইয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ তাহার বিবাহের জন্য উৎসুক হইলেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন, "মনে আছে, ৺জগন্নাথের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলে, কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে তাঁহার মন্দিরে দাসী করিয়া দেওয়া হইবে?" স্মৃতিপথে সেই কথা উত্থিত হওয়ায় তাঁহারা আর কালবিলম্ব না করিয়া পুরুষোত্তমে আসিলেন। সেই পাণ্ডার গৃহে উভয়েই আতিথ্য স্বীকার করেন। রাত্রি-কালে উভয়ে স্বপ্ন দেখিলেন, স্বয়ং জগন্নাথদেব এক ব্রাহ্মণের মূর্ত্তিতে তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, "দেখ অজয়নদের তীরে কেন্দুবিল্ব নামে এক গ্রাম আছে। তথায় আমার অংশে জয়দেব নামে এক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার নবীন যৌবন, হরিনামে সে সর্ব্বদা উন্মত্ত, চক্ষে তাহার সর্ব্বদা অশ্রু ;—

"সিংহাদিভ আজানুলম্বিত দুই বাহু।
চন্দ্রিমা জিনিয়া মুখ ভ্রম পায় রাহু॥
নবমেঘ জিনি আদি শ্যামল শরীর।
উনমত হয়ে ফেরে সদাই অস্থির॥
আর এক চিহ্ন কহি দেখিবে তাহাতে।
রাধা কৃষ্ণ নাম লেখা সকল অঙ্গেতে॥
পদ্মাবতী কন্যা লয়ে তারে কর দান।"

প্রভু জগন্নাথের স্বপ্নাদেশ শুনিয়া ব্রাহ্মণ দম্পতী পরদিনই কেন্দুবিল্ব অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বিংশতি দিন পদব্রজে চলিবার পর তাঁহারা কেন্দুবিল্বে উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া এক ব্রাহ্মণের

গৃহে তাঁহারা আতিথ্য স্বীকার করিলেন। ব্রাহ্মণকে জয়দেব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "জয়দেব যে কার পুত্র, কোন্ গোত্র, তাহা কিছুই জানি না। অনেক দিবস হইতে সে এই গ্রামে আছে, ভিক্ষা মাগিয়া খায় এবং শিবের মন্দিরে থাকে।" তখন ব্রাহ্মণ দম্পতী সেই ব্রাহ্মণের নিকট নিজের স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন। গ্রামের অন্যান্য লোকেরা সকলে শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। সকলে মিলিয়া পদ্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া যেখানে অজয়নদের তীরে কদম্ববৃক্ষমূলে জয়দেব বসিয়া দুই চক্ষু মুদিত করিয়া কৃষ্ণ ধ্যান করিতেছেন সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ দেখিলেন, স্বপ্নে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব তাঁহাকে জয়দেবের যে যে লক্ষণ বলিয়া দিয়াছিলেন তাঁহাতে সেই সমস্ত লক্ষণই বিরাজমান। তখন জয়দেবকে স্তবস্তুতি করিয়া ব্রাহ্মণ স্বপ্নবৃত্তান্ত জয়দেবকে জানাইলেন। জয়দেব বলিলেন, "দেখ তোমার প্রতি জগন্নাথদেবের যেরূপ আদেশ হইয়াছে, যদি আমার প্রতি তোমার কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য তদ্রূপ আদেশ হয়, তাহা হইলে আমি তোমার কন্যাকে বিবাহ করিব।"

রাত্রিকালে জয়দেব স্বপ্নে দেখিলেন, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব তাঁহাকে বলিতেছেন, "দেখ তোমাতে আমাতে অভিন্ন দেহ, এই ব্রাহ্মণ আমাকে কন্যাদান করিতে আসিয়াছিল, আমি তোমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছি, তুমি ইহাকে বিবাহ করিও। আর দেখ তুমি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিও, সেই গ্রন্থে কৃষ্ণলীলাবিষয়ে এমন সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করিও যাহা সাধারণ লোকে না জানে। ঐ কেন্দুবিল্ব গ্রামে আমি পূর্ব্বে থাকিতাম, এখন উহা তোমার স্পর্শে আবার পবিত্র হইয়া উঠিবে। ঐ কদমখণ্ডির ঘাটে জলের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ দুই মূর্ত্তি আছে, তুমি তাহাতে হাত দিবা মাত্র তাহা পাইবে, সেই মূর্ত্তি লইয়া পূজা করিবে।" এই কথা বলিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব অন্তর্হিত হইলেন।

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া জয়দেব ব্রাহ্মণকে কহিলেন, "হাঁ জগন্নাথের আদেশ হইয়াছে, আমি তোমার কন্যাকে বিবাহ করিব।" জয়দেব অতঃপর গ্রামবাসিগণকে ডাকিয়া কহিলেন, "কদম্বখণ্ডির ঘাটে অজয়-গর্ভে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি আছে, সেই মূর্ত্তি আনিতে আমার উপর আদেশ হইয়াছে, তোমরা সকলে চল, সেই মূর্ত্তি লইয়া আসি।" তখন গ্রামের লোকেরা শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর ইত্যাদি লইয়া হরিনাম করিতে করিতে অজয়-তীরে উপস্থিত হইল। জয়দেব জলের মধ্যে হাত দিবা মাত্র রাধাকৃষ্ণের দুই বিগ্রহ উঠিল, সকলে বিগ্রহমূর্ত্তি আনিয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। বাঙ্গালার রাজা লক্ষ্মণসেন জয়দেবের এই মাহাত্ম্য শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, রাজা নিজব্যয়ে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, এবার জয়দেবের বিবাহের আয়োজন হইল। লক্ষ্মণ সেনের ব্যবস্থায় জয়দেবের বিবাহে কোনই অভাব থাকিল না, রাজোচিত আড়ম্বরে বিবাহকার্য সমাধা হইল।

জয়দেবের ন্যায় পদ্মাবতীও রাধাকৃষ্ণ-পূজায় আত্মোৎসর্গ করিলেন। জয়দেব ও পদ্মাবতী খুব প্রত্যূষে উঠিয়া মঙ্গল আরতি করেন, তার পর কুসুম চয়ন করেন, পদ্মাবতী সেই কুসুমে নানাপ্রকার ফুলহার গাঁথিয়া তাহা রাধাকৃষ্ণের চরণে অর্পণ করেন। অতঃপর বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করেন। নানাস্থান হইতে বহু ভক্ত আসিয়া সেই গীতগোবিন্দ শ্রবণ করেন। ইহার পর গঙ্গাস্নান করিয়া জয়দেব ঘরে ফিরিয়া রাধামাধবের সেবা করেন। এদিকে পদ্মাবতী স্বহস্তে রন্ধন করেন। রাধামাধবের ভোগের জন্য ক্ষীর, পুরী প্রভৃতি নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করেন। রাধামাধবের ভোজন-আরতির পর জয়দেব গৃহে ফিরিয়া পুনরায় গীতগোবিন্দ-রচনায় মনোনিবেশ করেন। সন্ধ্যা-

কালে আবার রাধামাধবের আরতি হয় এবং মাখন, শর্করা, পক্ক রম্ভা, মিছরী, ওলা প্রভৃতি ঠাকুরকে নিবেদন করেন।

এইভাবে জয়দেব ও পদ্মাবতী ঠাকুরের সেবা করেন। একদিন জয়দেব গীতগোবিন্দে মানভঞ্জন লিখিতে গিয়া "স্মর গরল খণ্ডনং" "মম শিরসি মণ্ডনং" পর্য্যন্ত লিখিয়া শেষের চরণটি আর মিলাইতে পারিলেন না অথবা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পদদ্বয় নিজ মস্তকে স্থাপন করিতেছেন, একথাও লিখিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। নানারূপ ভাবিতে ভাবিতে স্নানের বেলা হইয়াছে দেখিয়া জয়দেব গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন; গঙ্গায় অবতরণ করিতেই তিনি এক দৈববাণী শুনিতে পাইলেন। দৈববাণীর মর্ম্ম এইরূপ, "জয়দেব ! তুমি প্রতিদিন এত কষ্ট করিয়া এতদূর গঙ্গাস্নান করিতে আইস, আর তোমাকে এই কষ্ট সহ্য করিতে হইবে না। কদম্বখণ্ডির ঘাটে আমি উজান বহিয়া যাইব।" কথিত আছে, তৎপরদিন প্রাতঃকালে সকলে গাত্রোত্থান করিয়াই দেখে, জয়দেবের বাড়ীর নিকটে গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছেন; জয়দেব ইহা দর্শনে গঙ্গার স্তব করিলেন—

"চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ সর্ব্বাবয়ব ভূষিতাম্।
রত্নকুম্ভাং সিতাম্ভোজাং বরদামভয়প্রদাম্॥
শ্বেতবস্ত্র পরীধানাং মুক্তামণি বিভূষিতাম্।
ততো ধ্যায়েৎ সুরূপাঞ্চ চন্দ্রাযুত সমপ্রভাম্॥"

জয়দেবের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া মকরবাহিনী গঙ্গাদেবী তাঁহাকে দর্শন দান করিয়াছিলেন। কথিত আছে, গঙ্গাদেবী জয়দেবকে বলিয়াছিলেন, "আমি প্রতি বৎসর পৌষ-সংক্রান্তির দিনে এই কদম্বখণ্ডির ঘাটে আবির্ভূত হইয়া দুই বাহু দেখাইব।" তদবধি প্রতিবৎসর পৌষ-সংক্রান্তির দিনে লক্ষ লক্ষ হিন্দু কদম্বখণ্ডির ঘাটে গঙ্গাবগাহন করিয়া থাকে।

এদিকে জয়দেব গীতগোবিন্দে মানভঞ্জনের অর্দ্ধপদ লিখিয়া গঙ্গায়

স্নান করিতে গিয়াছেন, তখন অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের মনো-বাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিবার জন্য স্বয়ং জয়দেবের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সিক্ত-বসনে যেভাবে জয়দেব গৃহে ফিরিয়া আসেন সেইভাবে জয়দেব-গৃহে উপস্থিত হইলেন। পদ্মাবতী মাথার কেশ দিয়া জয়দেবের পাদপদ্ম মুছাইয়া দিলেন। অতঃপর বসন পরিধান করিয়া জয়দেবরূপী শ্রীকৃষ্ণ রাধামাধবের বিগ্রহ পূজা করিলেন, পদ্মাবতী যে অন্ন রাধামাধবের ভোগের জন্য রন্ধন করিয়াছেন তাহা রাধামাধবকে উৎসর্গ করিয়া দিয়া নিজে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তার পর পুঁথি পাড়িয়া যেখানে জয়দেব লিখিয়াছিলেন—

"স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং"

তাহার নিম্নে লিখিয়া দিলেন :—

"দেহি পদপল্লব মুদারম্।"

এই কথা লিখিয়া জয়দেবরূপী শ্রীকৃষ্ণ গিয়া শয়ন করিলেন। এদিকে পদ্মাবতী স্বামীর প্রসাদ মনে করিয়া সেই প্রসাদ খাইতে বসিলেন। এমন সময় জয়দেব আসিয়া উপস্থিত। গঙ্গা অন্তর্হিতা হইবার সময় বলিয়া গিয়াছেন, আজ শ্রীকৃষ্ণ তোমার ঘরে আহার করিবেন, সেই কথা শুনিয়া জয়দেব হৃষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিয়াছেন। কিন্তু ঘরে ফিরিয়া কি দেখিলেন? পদ্মাবতী অন্নের থালা লইয়া ভোজনে বসিয়াছেন। তদ্দর্শনে জয়দেব বলিলেন, "একি পদ্মাবতী এরূপ ব্যবহার ত তোমার কখনও দেখি নাই! তুমি আমার অগ্রেই খাইতে বসিয়াছ! এইরূপই কি তুমি নিত্য কর।" পদ্মাবতী বলিলেন, "এ কি তোমার ছলনা! এইমাত্র যে তুমি আহারাদি করিয়া, গ্রন্থ লিখিয়া গিয়া শয়ন করিলে!" তখন জয়দেব গীতগোবিন্দের পাণ্ডুলিপি উন্মোচন করিয়া দেখেন, মা গঙ্গার সমস্ত কথাই ঠিক। সত্য সত্যই শ্রীকৃষ্ণ আজ তাহার অবর্তমানে আসিয়া পাদ

পূরণ করিয়া গিয়াছেন। তখন জয়দেব মন্দিরে গিয়া দেখেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শয়নের সমস্ত চিহ্নই রহিয়াছে, নাই কেবল শ্রীকৃষ্ণ। তিনি দুই বাহু তুলিয়া নাচিতে নাচিতে পদ্মাবতীর নিকট আসিয়া তাঁহার সহিত ভোজনে বসিলেন এবং বলিলেন, "পদ্মারে! তুই বড় ভাগ্যবতী!" স্বামীস্ত্রী উভয়ে মিলিয়া সেই প্রসাদ খাইলেন।

ইহার কিছু দিন পরে জয়দেব বৃন্দাবনে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন; পদ্মাবতীও কিছুতে স্বামীর সংসর্গ ছাড়িলেন না। কিন্তু কিরূপে রাধা-মাধবের বিগ্রহ বৃন্দাবনে লইয়া যাইবেন, এই ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন। রাত্রিকালে উভয়েই স্বপ্ন দেখিলেন, রাধামাধব বলিতেছেন, "আমাকে তোমরা ছাড়িলেও তোমাদিগকে আমি ছাড়িব না। অতএব আমাকে লইয়া যাও, আমি অতঃপর নিজ মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া ছোট একটি শালিগ্রাম শিলা হইব, তোমরা অনায়াসে আমাকে বন্ধন করিয়া লইতে পারিবে।" পরদিন জয়দেব ও পদ্মাবতী মন্দিরে গিয়া দেখেন, সত্য সত্যই রাধামাধব দুই মিলিয়া এক শালিগ্রাম শিলায় পরিণত হইয়াছেন। জয়দেব ও পদ্মাবতী বহুদিন পদব্রজে চলিয়া বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন এবং পশ্চিমে যমুনার তীরে একটি কুঞ্জ রচনা করিয়া তন্মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। শালিগ্রামের নিত্যসেবা এখানেও যথারীতি চলিতে লাগিল।

জ্ঞানদাস

প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে জ্ঞানদাসের স্থান অতি উচ্চে। ভক্তিরত্নাকর ভিন্ন অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থে জ্ঞানদাসের জীবনী পাওয়া যায় না। জেলা বীরভূমের কাঁদড়া গ্রামে ব্রাহ্মণ-বংশে জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করেন। এই কাঁদড়া গ্রাম হইতে দুই ক্রোশ দূরে একচক্রা নগর, তথায় মহাপ্রভুর পরম সঙ্গী নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে আছে—

"রাঢ় দেশে কাঁদড়া গ্রামেতে নাম হয়।
তথায় বসতি জ্ঞানদাসের আলয়॥"

বর্দ্ধমান ও বীরভূমে অদ্যাপি "মঙ্গল ব্রাহ্মণ" নামে এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ বাস করেন। জ্ঞানদাস এই মঙ্গল-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কেহ "মঙ্গল ঠাকুর", কেহ "শ্রীমঙ্গল" এবং কেহ বা "মদন মঙ্গল" বলিয়া অভিহিত করিতেন।

জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবী দেবীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া বৈরাগ্যধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জ্ঞাতিবর্গও জাহ্নবী দেবীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাদের বংশকে "গোস্বামী বংশ" বলিত। কাঁদড়ায় অদ্যাপি জ্ঞানদাসের মঠ বিদ্যমান আছে। প্রতি বৎসর পৌষ পূর্ণিমায় কাঁদড়ায় জ্ঞানদাসের আবির্ভাব উপলক্ষে মহোৎসব হয় এবং তিনদিন এতদুপলক্ষে মহামেলা হইয়া থাকে।

জ্ঞানদাস চিরকাল অকৃতদার ছিলেন; তাঁহার পিতামাতার নাম জানিতে পারা যায় না। জ্ঞানদাস একজন সুবিখ্যাত পদকর্ত্তা।

বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের পদ হইতে জ্ঞানদাসের পদগুলি কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। তাঁহার রচিত পদগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি একজন পণ্ডিত এবং সাধক ছিলেন। ইনি অনেকগুলি প্রশ্নদূতিকা পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। আজকাল এ ভাবের রচনা বড়ই বিরল।

জ্ঞানদাসের ষোড়শ গোপাল—গোপালরূপ বর্ণনা অতি চমৎকার। বৈষ্ণব-জগতে জ্ঞানদাসই প্রথম এই ষোড়শ গোপালরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মুরলা শিক্ষার পদের তুলনা নাই। প্রবাস এবং মাথুর বর্ণনে জ্ঞানদাস অতি সুন্দর নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। জ্ঞানদাসের পদাবলীতে সকল রসেরই সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ভাষার মধুরতায়, রসের গাঢ়তায় ও ভাবের উচ্ছ্বাসে বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে জ্ঞানদাসের স্থান অতি উচ্চে। বৈষ্ণব কবিগণ অনেকেই সখীভাবে সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আত্মহারা হইয়া সখীর মত দশ দশায় শ্রীমতীর সেবা করিতেন, তাঁহাদের রচনায় সেজন্য একটি জীবন্ত ভাব দৃষ্টিগোচর হয়। সেরূপ আত্মহারা হইয়া এক একটি ভাবে না ডুবিলে কেহ সে ভাবের প্রগাঢ়তা বুঝিতে পারে না, বুঝাইতেও পারে না। ভক্তি, বিনয় ও পাণ্ডিত্যে জ্ঞানদাস চৌষট্টি মোহান্তের একজন হইয়াছিলেন। এস্থলে জ্ঞানদাসের দুই একটি পদের উল্লেখ করা হইল :—

সুহই

অপরূপ তুয়া মুরলী ধ্বনি।
লালসা বাড়ল শবদ শুনি॥

কিরূপে এরূপে দেখিয়া সেহ।
উদ্বেগে ধনী না ধরে দেহ॥
জাগিয়া হইল শরীর ক্ষীণ।
অসিত চান্দের উদয় দিন॥
জড়িত হৃদয়ে করত ভেদ।
অতি বেয়াকুল করত খেদ॥
পাণ্ডুর বরণ বেয়াধি বাধা।
মূরছি নিশ্বাস হরল রাধা॥
তব যদি তুহুঁ মিলয় নাহ।
গোকুল মঙ্গল সবাই গায়॥
জ্ঞানদাস কহে শুনহ শ্যাম।
জীবন সুখদ তোঁহারি নাম॥

সুহই

রাই কেনে বা এমন হৈলা।
কিরূপ দেখিয়া আইলা॥
মরম কহ না মোয়।
বেয়াধি ঘুচাব তোয়॥
সব দেখি বিপরীত।
সোণার বরণ তনু।
কাজর হৈভ গেল জনু॥
নয়ানে বহয়ে ধারা।
কহিতে বচনহারা—

জ্ঞানদাস মনে জাগ।
কহিতে ঘুচাবে তাপ॥

এই ভাবের নায়িকার পূর্ব্বরাগ, নায়কের পূর্ব্বরাগ, গোষ্ঠবিহার, শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী, গোষ্ঠবিহার, শ্রীকৃষ্ণের এবং ষোড়শ গোপালের রূপ, শ্রীরাধিকার জন্মোৎসব, শ্রীরাধিকার বাল্যলীলা, রাধাকৃষ্ণ মিলন, প্রেম বৈচিত্র্য, সম্ভোগ-মিলন, রসোদ্গার, মুরলীশিক্ষা, বসন্তলীলা, রাসলীলা, নৌকাবিলাস, দানলীলা, অনুরাগ—নায়ক-সম্বোধনে, অনুরাগ—সখী সম্বোধনে, অনুরাগ—আত্মপ্রীতি, অভিসার, বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, মান, কলহান্তরিতা, প্রবাস, মাথুর, ভাবসম্মিলন, যুগলরূপ, শ্রীগৌরচন্দ্র, শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র প্রভৃতি বহু কবিতা জ্ঞানদাসের পদাবলীতে সন্নিবেশিত আছে। এস্থলে শ্রীগৌরচন্দ্র সম্বন্ধে জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

কনয় কিশোর, বয়স অতি রসময়
কিয়ে নব কুসুম ধনু।
লাবণ্য সার কিয়ে সুধা নিরমিত
গৌর সুললিত তনু॥
সাধ করি হেন গোরাগুণ শুনি।
শ্রবণ পরশে, সরস রস তনু
অন্তরে জুড়ায় পরাণী॥
কনক নীপফুল পুলক সমতুল
স্বেদ বিন্দু বিন্দু মুখে।
বিভোর প্রেমভরে, অন্তর গর গর
উজোর মরমের সুখে।

অরুণ নয়নে করুণ নিরমিত
সঘনে বলে হরিবোল।
জ্ঞানদাস কহে, পঁহুর পদভরে
অবনী আনন্দে হিলোল।

প্রভুপাদ পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন

এই মহাপুরুষ খড়দহবাসী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ প্রভু হইতে ইনি অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ। নিম্নে উহা বংশতালিকায় দেখান যাইতেছে।
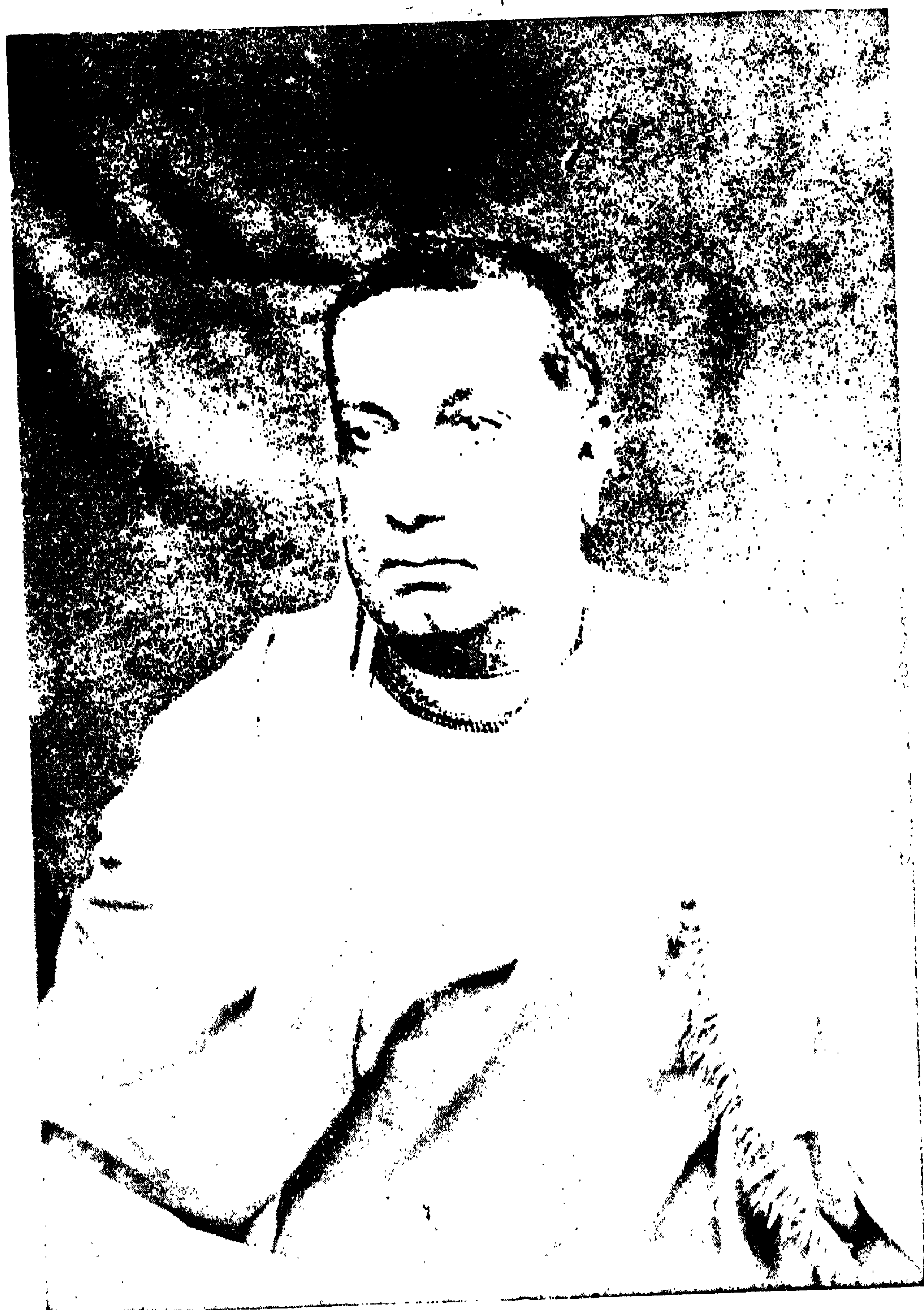
স্বর্গীয় গোকুলচন্দ্র গোস্বামী

সত্যানন্দ গোস্বামী

৺কুঞ্জবিহারী গোস্বামী হইতে ইঁহারা কলিকাতার শোভাবাজার ৪৩নং নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীটে আসিয়া বাস করেন। এই স্থানে ইনি ১২৮৩ সালে মাঘমাসে জন্মগ্রহণ করেন। এক্ষণে ইঁহারা সিন্দুরিয়াপটীতে বাস করিতেছেন।

খড়দহে নিত্যানন্দ বংশের বহুবিস্তৃতি ঘটিলে ইঁহাদিগের ন্যায় অনেকেই খড়দহের বাসস্থান ত্যাগ করিয়া কলিকাতাবাসী হইয়াছেন। তৎকালীন ধনী সুবর্ণবণিক শিষ্যদিগের আগ্রহে ও যত্নে, খড়দহ গ্রামে ম্যালেরিয়া দেখা দিলে, যেসকল গোস্বামিসন্তান খড়দহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস আরম্ভ করেন, তাঁহারা খড়দহ-বাস পরিত্যাগ করিলেও, তাঁহাদিগের কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺শ্যামসুন্দর জিউর সেবা পরিত্যাগ

করেন নাই ; বিগ্রহের পরিচর্য্যা উপলক্ষে অনেক সময় খড়দহে গিয়া থাকেন।

নিত্যানন্দ প্রভুর বংশে অনেক বৈষ্ণব পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ সত্যানন্দের পিতা ৺গোকুলচন্দ্র গোস্বামী সর্ব্বজন-সমাদৃত সুপণ্ডিত ছিলেন। বৈষ্ণবদর্শনাদি শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তদুপরি তাঁহার সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিলে তাঁহার প্রতি ভক্তিভাবের উদয় হইত এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইত। কি বংশগৌরবে, কি পাণ্ডিত্যে, তিনি যে একজন আদর্শ পুরুষরূপে বৈষ্ণবসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইঁহাদের শিষ্য প্রাতঃস্মরণীয় ৺কাশীনাথ মল্লিক মহাশয় তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া বড়-বাজার সিন্দুরিয়াপটীস্থ নিজবাস ভবনে ভগবন্মন্দির ও নিত্যানন্দপ্রভু-বংশীয় গোস্বামিবালকগণের শিক্ষার নিমিত্ত সংস্কৃত দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ব্যবস্থা করিয়া যান। প্রভুপাদ ৺গোকুলচন্দ্র ১২৯১ সাল হইতে ঐ বিদ্যালয়ের পরিচালনভার গ্রহণ করেন এবং সুখ্যাতির সহিত পরিচালন করিয়া যান। বর্ত্তমানে তাঁহার উপযুক্ত পুত্র পণ্ডিত সত্যানন্দ বিদ্যালয় ও ভগবন্মন্দির পরিচালন করিতেছেন।

বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণব জগতে যাঁহারা সুপণ্ডিত বলিয়া সুপরিচিত ও সমাদৃত তাঁহাদের অনেকেই প্রভুপাদ গোকুলচন্দ্রের ছাত্র।

সত্যানন্দের পিতা গোকুলচন্দ্র শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত "প্রমেয় রত্নাবলী" সানুবাদ প্রকাশ করেন। তিনি বৈষ্ণবসাধারণের সুবিধার জন্য "ব্যবস্থাসারসংগ্রহ" নামে স্মৃতি সংকলন করেন এবং গুরুশিষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও দীক্ষাগ্রহণের আবশ্যকতা বিষয়ে "দীক্ষা তত্ত্বপ্রকাশিকা" প্রকাশিত করেন। ইনি পণ্ডিতসমাজেই যে কেবল

প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন

সম্পর্কিত কুলীন কুটুম্ব-সমাজেও বিশেষ সমাদৃত ও সম্মানিত ছিলেন। কোন সামাজিক গোলযোগ উপস্থিত হইলে তিনি তাহার সুমীমাংসা করিয়া দিতেন, তিনি কখন কাহাকেও নির্য্যাতিত করিবার পক্ষে যোগ দিতেন না, বরং নির্য্যাতিতকে উত্তোলন ও সমাজে গ্রহণের পক্ষে দণ্ডায়মান হইতেন, এ কার্য্যে ক্ষতিস্বীকার করিতেও সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন বলিয়া সকল সুধীলোকই তাঁহার বিশেষ সম্মান ও প্রশংসা করিত। তিনি ৫৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার শোকে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কথা দূরে থাক, ইংরাজী শিক্ষিতসম্প্রদায়ও অভিভূত হইয়াছিলেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ সকল সংবাদপত্রই তাঁহার মৃত্যু জন্য শোক প্রকাশ করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ "ইণ্ডিয়ান নেশন" পত্রের বিজ্ঞবর সম্পাদক এন্-এন্ ঘোষ মহাশয়ের ভাষা এখানে উদ্ধৃত করিলে হ তাহার পরিচয় পাইবেন :—

"One of the best known men in Vaishnav circles, Pundit Gokul Chunder Goswami, breathed his last on Monday. The deceased was a learned Pundit, well educated in the Shastras and in the literature of Vaishnavism and was esteemed not only by his friends and disciples but by Pundits and society in general. More remarkable even than his learning were the purity and dignity of his character and the modesty of his behaviour. He was a leading and representative member of a certain section of society, and his loss will be keenly felt. He died at the rather early age of 53, from a disease which appeared somewhat suddenly namely paralysis of the brain. He

has left two sons who are likely to prove worthy of himself by their talents and character and the elder of whom is already well educated enough to keep up the *tol* of the late Goswami."—Indian Nation, 1st June, 1903.

অমৃতবাজার পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান মিরার, বঙ্গবাসী, রঙ্গালয় প্রভৃতি পত্রে তাঁহার কথা আলোচিত হইয়াছিল। কি ইংরাজী, কি বাঙ্গলা সকল সাময়িক পত্র তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছিল।

সত্যানন্দ পিতার নিকট ব্যাকরণাদি হইতে বৈষ্ণব দর্শনশাস্ত্রাদি এবং রায় শিউবক্স্ বগলা মহোদয়ের প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ ৺সত্যনারায়ণ জিউর শ্রীমন্মন্দিরের অধ্যাপক সর্ব্বদর্শনজ্ঞ মৈথিলী পণ্ডিত ৺বেণীমাধব শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট প্রাচীন ও নব্য ন্যায় এবং সাংখ্যদর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সত্যানন্দ পিতার জীবিত কাল হইতেই তদন্তেবাসিগণের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করায় তাঁহার পিতা ও শাস্ত্রী মহোদয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পারিতোষিকস্বরূপ "সিদ্ধান্তরত্ন" উপাধি প্রদান করেন, সত্যানন্দ উহা গুরুজনের আশীর্ব্বাদরূপে বহন করিয়া আসিতেছেন।

সত্যানন্দ পিতৃপদাঙ্কানুসরণ করিয়া আজও সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট সচেষ্ট। "ভাগবতসন্দর্ভ" নামক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ষট্সন্দর্ভ নামক গ্রন্থের সানুবাদ ব্যাখ্যা লিখিতেছেন। এই ষট্সন্দর্ভান্তর্গত প্রথম "তত্ত্বসন্দর্ভ", দ্বিতীয় "ভগবৎসন্দর্ভ" তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যার সহিত প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণবসমাজের তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের যে কি উপকার সাধন করিয়াছেন উক্ত গ্রন্থপাঠকগণই তাহা অবগত হইতেছেন। ইনি এক্ষণে তৃতীয় "পরমাত্ম-সন্দর্ভ" ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বৈষ্ণবদর্শন-সম্মত ব্যাখ্যা লিখিতেছেন। তাঁহার সহিত আলাপে অবগত হইয়াছি, যদি কোন দৈব প্রতিবন্ধক না ঘটে, তাহা হইলে তিনি তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যার

সহিত ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থ সমাপন করিতে বিশেষ সচেষ্ট থাকিবেন। উক্ত গ্রন্থ যেরূপ ভাবে লিখিতেছেন সেরূপে সম্পন্ন হইলে বৈষ্ণবজগৎ কেন, সমগ্র দার্শনিক জগৎ এক অদ্ভুত দান প্রাপ্ত হইবেন। ভগবান তাঁহার এই মহৎ কার্য্যে সহায় হউন, এই আমাদের প্রার্থনা।

ইঁহার পিতা যেরূপ চরিত্রবান্, অমায়িক এবং একজন প্রকৃত পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন ইনিও তদ্রূপ হইয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইনি বড়বাজার সিন্দুরিয়াপটীস্থ কাশীনাথ মল্লিকের ভগবন্মন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেছেন। ইঁহার পিতা ৺গোকুলচন্দ্র গোস্বামী ভাগবতধর্ম্মমণ্ডল নামক একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন, ইনি সেই সভা পরিচালন করিয়া আসিতেছেন। চতুর্দ্দিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের আবরণে নানা উপসম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইতে দেখায়, ইনি বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মসংরক্ষণ নিমিত্ত নানা চেষ্টা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত পরীক্ষায় বৈষ্ণবশাস্ত্রগ্রন্থ গবর্ণমেণ্ট-অনুমোদিত তালিকাভুক্ত না থাকায় ইহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা আশানুরূপ হয় না দেখিয়া শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, শ্রীভাগবতকুমার শাস্ত্রী এবং অন্যান্য কয়েকজন বৈষ্ণব পণ্ডিত ও ভক্তগণকে লইয়া আলোচনা করেন এবং সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হন। এক্ষণে সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষায় বৈষ্ণব-শাস্ত্র তালিকাভুক্ত হইয়াছে ও পরীক্ষা গৃহীত হইতেছে।

বৈষ্ণবব্রতাদি সম্বন্ধে পঞ্জিকায় অনেক সময় দিকনির্ণয়ের অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ভাগবতধর্ম্মমণ্ডল হইতে তিনি ব্রততালিকা প্রকাশ করেন এবং বৈষ্ণবগণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া থাকেন।

গোস্বামিগৃহে পুরুষেরা বৈষ্ণবস্মৃতি হরিভক্তিবিলাস-মতে ও বিধবারা স্মার্ত্তমতে একাদশী আদি ব্রত পালন করেন জানিতে পারিয়া ইনি

বড়ই দুঃখিত হন এবং ভাগবতধর্ম্মমণ্ডল হইতে প্রকাশিত ব্রত-তালিকায় "বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা যতিধর্ম্মপরায়ণা (বিধবা) দ্বিজপত্নী-গণেরও এই নিয়মে উপবাস হইবে"—এই কথায় বিশেষ জোর দিয়া লিখিয়া থাকেন।

এইবার ইঁহার বাল্যজীবনের দুই একটা কথা বলিব। ইনি কোন প্রচলিত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন নাই, নানাপ্রকৃতির ছাত্রগণের সংস্রবে না আসায় চরিত্র সুনির্ম্মলভাবে গঠিত হইয়াছিল। নিজভবনে পিতার নিকট অধ্যয়ন, সতত তাঁহার সঙ্গলাভ ইঁহাকে পিতার সকল মনোবৃত্তির অধিকারী করিয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যদর্শনে বাল্যে ইঁহার হৃদয়ে যে ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ হইয়াছিল বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহা ইঁহার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে স্থান অধিকার করিয়াছে। ইনি চিরদিনই প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে ভালবাসেন এবং তদ্দর্শনে ভগবন্মহিমায় মুগ্ধ হইয়া থাকেন। প্রফুল্লভাবে ইনি জীবন কাটাইয়া আসিতেছেন। সংসার-জীবনে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা সহিয়াছেন ; কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না এবং আমরা তাঁহাকে কখনই বিষণ্ণ দেখি নাই। সর্ব্বদাই তাঁহার হাসি-মুখ দেখিতে পাওয়া যায়।

তাঁহার সংসার-জীবন সেরূপ সুখের নহে। কারণ একমাত্র পুত্র অকালে কাঁদাইয়া চলিয়া গিয়াছে। একমাত্র কন্যা, সেও আবার দৃষ্টি-শক্তিহীনা। ভগবদ্‌কৃপায় তিনি যেরূপ সুন্দর প্রসন্নমূর্ত্তি, সেইরূপ গুণবতী পরমাসুন্দরী ভার্য্যা লাভ করিয়াছেন ; এইরূপ না হইলে, সংসারজীবনে ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা অপরের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। তিনি সংসারী হইলেও ত্যাগী পুরুষ। "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ" কথাটী তাঁহার প্রতি যথার্থ প্রযুক্ত হইতে পারে।

ইঁহারা গুরুব্যবসায়ী হইলেও সত্যানন্দ যাহাকে তাহাকে অবিচারে

শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করেন না। ধনিব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ শিষ্যত্বগ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ইচ্ছামাত্রপ্রকাশে তাঁহাকে শিষ্য করিবার জন্য অন্যান্য গুরুদিগের ন্যায় ইনি ব্যস্ত হন না। যখন তখন ধনী শিষ্যের দ্বারস্থ হইতে ভালবাসেন না। ইনি বড়ই স্বাধীনচেতা। পরচ্ছন্দানুবর্ত্তিতা আদৌ ভালবাসেন না। ধনী শিষ্যের অযথা গুণগান করিয়া স্বীয় মর্য্যাদা খর্ব্ব করিতে সতত পরাঙ্মুখ থাকেন। ইঁহার পিতৃশিষ্য কলিকাতা কলুটোলা-নিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী ৺ বিহারীলাল পাইন ২৪ পরগণার সুখচর গ্রামে এক বৃহৎ নানা কারুকার্য্যশোভিত সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া গুরু-দেবের দ্বারা ৺ রাধাগোবিন্দ জিউর শ্রীবিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করান এবং সেই মন্দিরের দেবসেবাদি পর্য্যবেক্ষণের ভার গুরুবংশের উপর ন্যস্ত করেন। সেকারণ বিশেষ বৃত্তিও নির্দ্দিষ্ট করেন। কোন সময়ে বিহারী বাবু গুরুপুত্র সত্যানন্দকে বৃত্তির উল্লেখে পর্য্যবেক্ষণ প্রতি কটাক্ষ করেন। বৃত্তিউল্লেখে কটাক্ষ করায় অর্থক্ষতি স্বীকার করিয়া স্বীয় মর্য্যাদারক্ষাকল্পে শিষ্যকে ত্যাগ করেন। ইঁহার এইরূপ কার্য্যে অন্যান্য ধনী শিষ্যেরা ভীত হইয়াছেন। কয়েক বৎসর পরে বিহারীবাবুর অনুতাপ হওয়ায় তিনি নিজ অপরাধ বুঝিতে পারিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলে সত্যানন্দ তাঁহাকে ক্ষমা করেন। এরূপ তেজস্বী গুরুর শিষ্য হওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। ইঁহার চরিত্রবলের একটি কথা না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। ইনিও পিতার ন্যায় যাহা শাস্ত্রযুক্তিসম্মত বলিয়া বুঝিতে পারেন তাহা সম্পাদন করিতে লোকনিন্দা বা সমাজের ভয় করেন না। উৎ-পীড়িত ব্যক্তির পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাকে রক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হন না।

পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গোস্বামিপ্রভুরা নিজদিগকে পতিতপাবন বলিয়া মনে করেন এবং সেই

ধারণার বশে বেশ্যাকে দীক্ষা দান করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না ; "সুদুরাচারী ব্যক্তিও ভগবদ্ভক্ত হইলে সাধুপদবাচ্য হন"—একথা সত্য ; কিন্তু যে সকল পতিতা তাঁহাদের নির্লজ্জ বৃত্তি চালাইতেছে, দীক্ষা গ্রহণান্তে পেশা ত্যাগ করে না, তাহাদিগকে শিষ্যা করা যে কতদূর সঙ্গত তাহা বুঝিতে কি বিলম্ব হয় ? কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয়, প্রভুরা ইহাদিগকে শিষ্যা করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। শিষ্যের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনা যখন গুরুর কর্ত্তব্য, তখন ঐ শিষ্যার মঙ্গল হউক, আশীর্ব্বাদ করিলে কোন ধনিসন্তানের সর্ব্বনাশ না হইলে ত বেশ্যার আর্থিক উন্নতি ঘটে না ও মঙ্গল হয় না। সত্যানন্দ এরূপ ঘৃণ্য কাজ করেন না, এ কারণ আমরা ইঁহার একটীও বেশ্যা শিষ্যা দেখিতে পাই না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইনি একজন পরম বৈষ্ণব। সদাচার রক্ষা করিয়া যাঁহারা রাগমার্গের ভজনে উন্নীত হইয়াছেন তাঁহারা ইঁহার আদরণীয় ও নমস্য, কিন্তু যাঁহারা রাগানুগা ভজনের ভাণ করিয়া ভক্ত বলিয়া পরিচিত হইতে প্রয়াসী তাঁহারা ইঁহার নিকট অতীব ঘৃণ্য। এমন কি, যাঁহারা বৈষ্ণব আচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এইরূপ লোকদিগকে প্রশ্রয় দেন তাঁহাদিগের সঙ্গ পর্য্যন্ত সত্যানন্দের অবাঞ্ছনীয়। তাঁহার অভিমত এরূপ হইলেও কাহারও সহিত কখন রূঢ় ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। তিনি অতীব অমায়িক এবং তাঁহার ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট।

বৈষ্ণবশাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং সদাচারবিরুদ্ধ কোন মতেরই প্রশ্রয় দিতে ইঁহাকে কখন দেখা যায় না। এমন কি শাস্ত্রবিরুদ্ধ অযৌক্তিক বিষয়, যুক্তিপরম্পরায় লোকমনোহর প্রতীয়মান হইলেও এবং বহুলোক তন্মতাবলম্বী হইলেও তাহাতে ইনি কখনও যোগ দেন না, একারণ যদি তাহার

পরিচিত এমন বন্ধুরও অপ্রিয় হইতে হয়, তাহাতেও সত্যানন্দের আপত্তি নাই। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, ইনি "গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া" যুগল-ভজনের ও পূজার পক্ষপাতী নন। গৌরাঙ্গ দেব যখন একাধারে রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি "রাধাভবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপং", "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" তখন রাধাকৃষ্ণ যুগল-ভজনের ন্যায় গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ভজনের আবশ্যকতা নাই, এরূপ ভজন বৈষ্ণবশাস্ত্র ও মহাজনগণ-অভিপ্রেত নয়—ইহাই সত্যানন্দের অভিমত।

কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থকে প্রকৃত জ্ঞানের ভাণ্ডার বলিয়া বড়ই সমাদর করেন। দুরধিগম্য ভগবদ্‌তত্ত্ব কিরূপ সুন্দর ও সহজভাবে লিখিত হইয়াছে, এই কথা বলিয়া, ইহাকে শ্লাঘা করিতে শুনিতে পাই। দার্শনিক শ্রীজীবগোস্বামীর নামে ইহাকে পুলকিত দেখিতে পাই। ইনি কীর্ত্তন শুনিতে ভালবাসিলেও রসকীর্ত্তন শুনিতে ইহার আগ্রহ দেখা যায় না। নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা কীর্ত্তন ইহার বড়ই প্রিয় এবং উচ্চ নামসংকীর্ত্তনেরও পক্ষপাতী। রসকীর্ত্তন শুনিবার আমাদের অধিকার হয় নাই এবং আমরা উহার অধিকারী নহি, এই কথা বলিয়া থাকেন।

এইবার নিত্যানন্দ প্রভুর উর্দ্ধতন বংশাবলী লিখিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

শাণ্ডিল্য গোত্র

কান্যকুব্জবাসী

বামদেব

ক্ষিতীশ

|

(রাজা আদিশূর কর্ত্তৃক গৌড়ে আনীত)

(রাজা আদিশূর কর্ত্তৃক গৌড় আনীত)

|

(আদিশূর পত্র ভূশুরাসহ রাঢ়ে আগত এবং ইঁহার বংশধরগণ রাঢ়ী বলিয়া পরিচিত) ভট্টনারায়ণ (ইঁহার ষোলটী পুত্র—ষোল গাঁঞি বলিয়া পরিচিত)

|

বরাহ (বন্দ্যঘাটী গাঁই)

|

আর্ত্ত | গাউ | ধীর | হংস | সুভিক্ষ

গাউ

|

হাকুর | গঙ্গাধর | জহ্নু | সুরেশ্বর | ভগীরথ

গঙ্গাধর

|

পশো

|

শকুনি

|

জাহ্নন | মহেশ্বর

(ইঁহারা উভয়ে বল্লাল-পূজিত কুলীন)

|

মহাদেব

|

দুর্ব্বলী | ত্রিকুবো | পুরাই

(ত্রিবিক্রম অপর নাম)
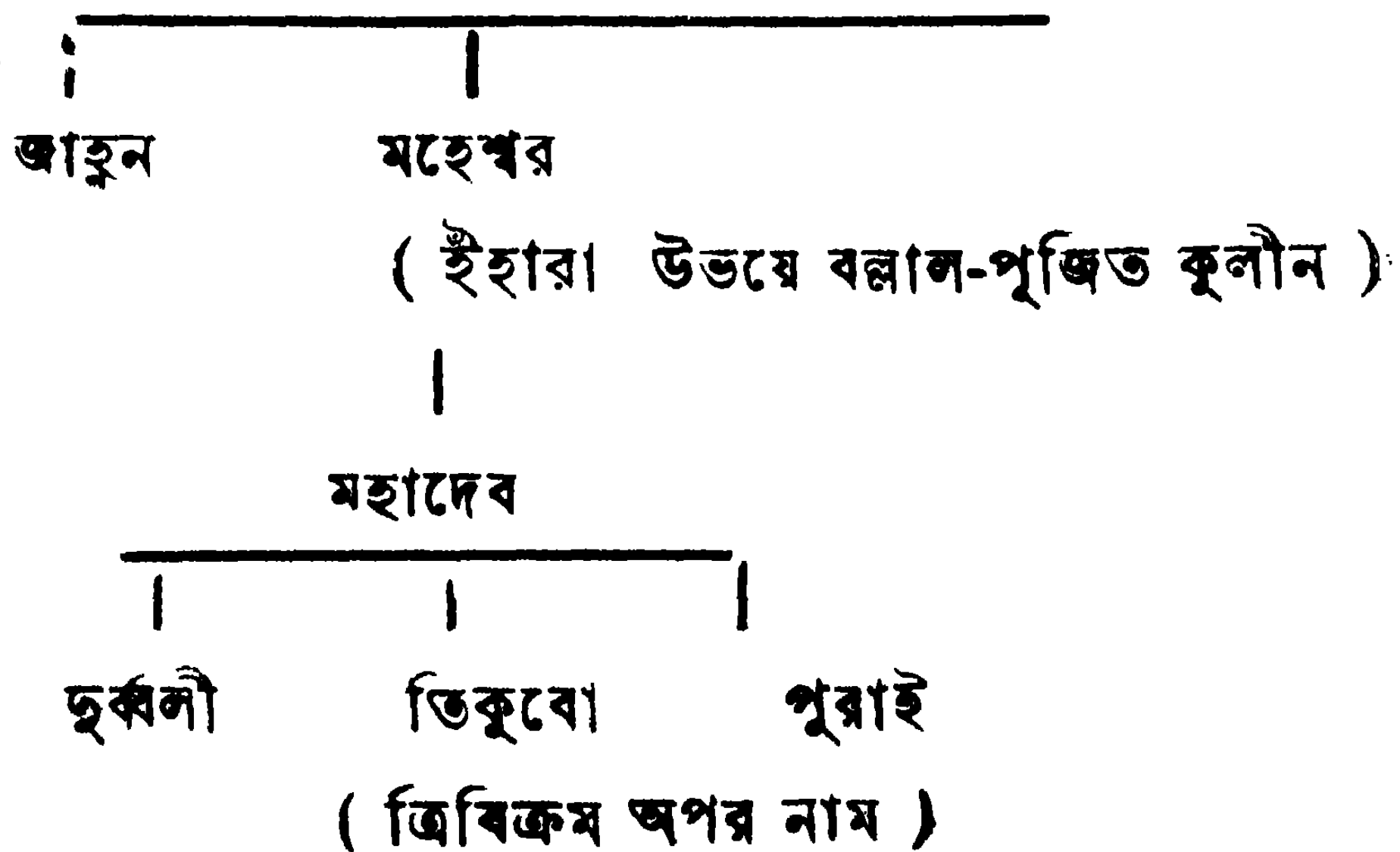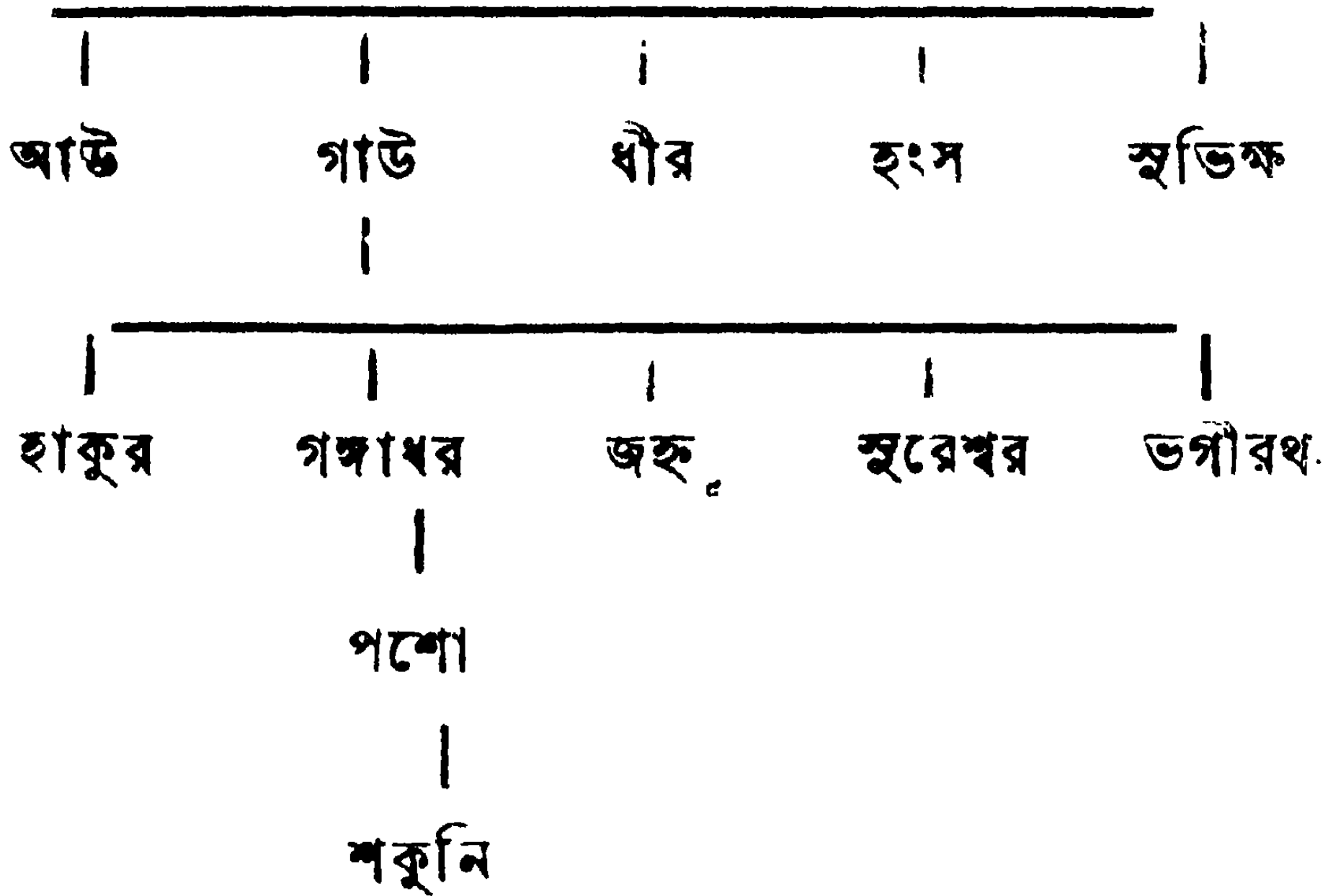
বিষ্ণু (ইনি বল্লালসেন
কর্ত্তৃক পতিত)
নেঙ্গুল
গঙ্গ
সোম
সিধু
লখাই
মিহির (বংশজ বলিয়া কুলীন
সমাজে অনাদৃত)
মিহির
ভাস্কর
পুষ্কর
সৃষ্টিধর
মালাধর
বৃষকেতু
চন্দ্রকেতু
সুন্দরামম্ন নকড়ি বাঁড়ুরী (কেহ কেহ সিন্দূরামও বলেন)
মুকুন্দ (হাড়) ওঝা—
নিত্যানন্দ
কৃষ্ণানন্দ
সর্ব্বানন্দ
ব্রহ্মানন্দ
পূর্ণানন্দ
প্রেমানন্দ
বিশুদ্ধানন্দ

রামচন্দ্রের বংশধরেরা বটব্যালশ্রেণীর বলিয়া পরিচয় দেন।

গোপীজনবল্লভ ও রামকৃষ্ণের বংশধরেরা নোত্তা ও মালদহের গোস্বামী বলিয়া বিখ্যাত এবং সুন্দরামন্ন বাড়ুরীর (বাড়ুয্যের সন্তান বন্দ্যঘাটী বলিয়া পরিচিত।

অবধূত নিত্যানন্দ প্রভু কোন সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, ভারতবর্ষের তীর্থসকল সন্ন্যাসীসহ পর্য্যটন করিয়া, নবদ্বীপে আসিয়া গৌরাঙ্গদেবের সহিত মিলিত হয়েন। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশে কালনা-নিবাসী সূর্য্যদাস সারখেলের বসুধা ও জাহ্নবী নাম্নী দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। নিত্যানন্দের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়ায় সূর্য্যদাস পণ্ডিতকে তাৎকালিক সমাজে উৎপীড়িত হইতে হইয়াছিল।

কুলাচার্য্য (ঘটক) গণ তেজীয়ান নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর বীরভদ্রের নামে বীরভদ্রী থাক ঘোষণা করেন। ফুলের মুখটী পার্ব্বতীনাথ বীরভদ্রের কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে কুলীনের কুলরক্ষার্থে ঘটকেরা ইহাদিগকে বংশজ বাঁড়ুয্যে হইতে বটব্যাল শুদ্ধ শ্রোত্রিয়ে পরিণত করিয়াছেন। এই সময়ে দেবীবর ব্রাহ্মণগণের কুলপ্রথার সংস্কার করিয়া

কুলীনগণকে ৩৬ মেলে বদ্ধ করেন। বীরভদ্রপুত্র রামচন্দ্র দেবীবরের সভায় উপস্থিত ছিলেন, অন্য দুই পুত্র এই সভায় যোগ না দেওয়ায় তাঁহারা উপেক্ষিত হন, সেকারণ তদ্‌বংশধরগণ সিন্দুরা (সুন্দরা) মেলের সন্তান বন্দ্যঘাটী গাঁই বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু খড়দহবাসী গোস্বামিগণ ঘটকগণের নির্দ্দেশমত বটব্যাল গাঁঞি শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইঁহারা খড়দহ, ফুলে, বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী এই চারিমেলের কুলীনগণ সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই সকল কুলীন বীরভদ্রী থাকের কুলীন বলিয়া সমাজে পরিচিত। কিছুকাল পূর্ব্বে খড়দহবাসী গোস্বামিগণ কুলীন পাত্রে কন্যাদান জন্য ব্যস্ত ছিলেন দেখা যাইত। এক্ষণে ইঁহারা কুলীন ও শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান করিতেছেন, এখানে সত্যানন্দের একটী কথা না বলিয়া থাকা যায় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডলের মধ্য দিয়া এক প্রস্তাব করেন যে, মহাপ্রভুর পার্ষদবর্গের মধ্যে অনেক রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহাদের বংশধরের মধ্যে অনেকেই এখন বর্ত্তমান আছেন, সেই সকল বংশের পরিচয় যিনি সংগ্রহ করিয়া নির্দ্দিষ্ট কালমধ্যে লিখিতে পারিবেন, ভাগবতধর্ম্মমণ্ডল হইতে তাঁহাকে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে আদান-প্রদান প্রচলিত হইলে অনেকের ক্ষোভের কারণ দূর হইবে। কারণ, আজন্ম বৈষ্ণবগৃহে পালিতা নিরামিষাশী কন্যা শাক্তগৃহে গিয়া স্বামীর প্রসাদ-গ্রহণে অসমর্থা হইয়া থাকে। কোন একটী এইরূপ কন্যাকে স্বামীর জন্য মাংসাদি রন্ধন করায় ও স্বামীর প্রসাদ গ্রহণ করায় ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে ইহলীলা সংবরণ করিতে হইয়াছিল। ইনি একজন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব।

ইঁহার সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা জানি, তাহা লিখিয়া এই প্রবন্ধের কলেবর আর বৃদ্ধি করিব না।

পিতৃভক্ত সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী নন, নিজ কথা কিছুই বলিতে চান না। তাঁহার সম্বন্ধে লিখিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে নিজ পিতার কথাই বর্ণনা করেন। কাজেই তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা জানিতে পারা গেল না। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের নিকট হইতে যাহা পাওয়া গেল লিপিবদ্ধ করিলাম। তিনি একজন চরিত্রবান উদারহৃদয় নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

———

ব্রহ্মানন্দ ভারতী

কেশব ভারতী গৌরাঙ্গ প্রভুকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন ব্রহ্মানন্দ ভারতী তাঁহার ধর্মভাই। গোবিন্দ নীলাচলে আগমন করিবার পরই ব্রহ্মানন্দ প্রভুকে দর্শন করিতে আসেন। সমগ্র ভারতবর্ষে তিনি সাধু ও পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহার যেমন বিরাট বপু, তেমনি অগাধ পাণ্ডিত্য। তাঁহার দোষের মধ্যে তিনি ঈশ্বরের সাকারত্বে বিশ্বাসবান নহেন, তিনি ঈশ্বরের নিরাকার রূপের ধ্যান করেন। তিনি প্রভুকে ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই, চারিদিকে প্রভুর নাম শুনিয়া এইবার মাত্র তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। মুকুন্দ প্রভুর দ্বাররক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মানন্দ আসিয়া প্রভুর দর্শনপ্রার্থী হইলেন। মুকুন্দ গিয়া প্রভুর নিকট ব্রহ্মানন্দের আগমন-সংবাদ জানাইলেন। প্রভু বলিলেন, "তিনি গুরু, তাঁহাকে কোথায় আমি দর্শন করিতে যাইব, তাহা না হইয়া তিনিই আমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।" এই বলিয়া মহাপ্রভু শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে নিজেই দ্বারদেশে ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে অভ্যর্থনা করিতে চলিলেন। ভারতী দেখেন—

"চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ মাঝে বিশ্বম্ভর।
তারক বেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর॥
দূর হৈতে ব্রহ্মানন্দ প্রভুকে দেখিয়া।
কহিতে লাগিলা অতি বিস্ময় পাইয়া॥"

—চন্দ্রোদয় নাটক।

প্রভু ভারতীর নিকট উপস্থিত হইয়াই দেখেন, ভারতী একখানি চর্ম্মনির্ম্মিত বসন পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। দেখিয়াই প্রভু মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। মুকুন্দকে তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "কৈ তোমার ভারতী গোঁসাই কৈ?" মুকুন্দ বলিলেন, "ঐ যে প্রভু আপনার সমক্ষেই ভারতী গোঁসাই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।" প্রভু বলিলেন, "পুরী তুমি অজ্ঞান, যদি উনি ভারতী গোঁসাই হইবেন, তবে উঁহার দেহে চর্ম্মাম্বর কেন?"

মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া ভারতী গোঁসাইয়ের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি বড় আশা করিয়া প্রভুকে প্রণাম করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, এক্ষণে মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া তাঁহার সে আশা নির্ম্মূল হইল। তিনি মহাপ্রভুকে বলিলেন, "আমি এক্ষণে এই চর্ম্মাম্বর পরিত্যাগ করিতেছি।" দামোদর অমনি প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া একখানি বহির্ব্বাস আনিয়া ভারতীকে দিলেন। ভারতী গোঁসাই সেই বহির্ব্বাস পরিধান করিলেন। প্রভুকে প্রণাম করিতেই প্রভু বলিলেন, "দেখুন ভারতী গোঁসাই, আপনি সম্পর্কে আমার গুরু, সুতরাং আমাকে প্রণাম করিয়া আর গুরুর কাছে আমাকে অবিনয়ী করিবেন না।" এই বলিয়া মহাপ্রভু শিষ্যগণের নিকট ভারতী গোঁসাইয়ের পরিচয় দিলেন। শিষ্যগণ একে একে ভারতী গোঁসাইকে প্রণাম করিলেন। অতঃপর সার্ব্বভৌমের দিকে ফিরিয়া ভারতী গোঁসাই বলিলেন, "দেখুন ভগবান চিরদিনই ভক্তের নিকট মস্তক অবনত করিয়া থাকেন, মহাপ্রভুও তেমনি আজ আমার নিকট মস্তক অবনত করিয়া নিজের ভগবানত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন। আজ আর ভগবানের নিরাকার রূপের ধ্যান করিবার প্রবৃত্তি নাই, আজ আমি দিব্যচক্ষে সম্মুখে সাকাররূপে ভগবানকে দেখিতে পাইতেছি।" এতক্ষণ প্রভু ভারতীর অনেক কথা হাসিয়া উড়াইয়া

দিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে ভাবের বশে এমন সমস্ত কথা বলিতে লাগিলেন যে, মহাপ্রভু আর তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। তিনি নির্নিমেষলোচনে ব্রহ্মানন্দের ভাবাবেশ পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর একটি মহাগুণ এই ছিল যে, লোকে তাঁহাকে ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি রূপে ব্যাখ্যা করিলেও তিনি কিন্তু কখনও নিজেকে ভগবান বলিয়া প্রকটিত অথবা প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেন না। মহাপ্রভু এ বিষয়ে আত্মভাব গোপন করিতে পারিতেন। তিনি কখনও কাহারও নিকট ধরা দিতেন না। তাই ব্রহ্মানন্দ যখন পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "আজ আমার নিরাকার ভাব দূরে গিয়াছে, আজ আমি সম্মুখে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতেছি" তখন মহাপ্রভু বলিলেন, "দেখুন জীবের যখন ভগবানে অপরা ভক্তির উদয় হয়, তখন সে চারিদিকই কৃষ্ণময় দেখিয়া থাকে। কাজেই আপনিও যে আজ চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণময় দেখিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে?"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "হাঁ তা বটে! কিন্তু ভক্তি থাকুক আর নাই থাকুক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি ছদ্মবেশে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হন, তাহা হইলেও তাহার হৃদয়ে ভক্তির ভাব প্রকট হইয়া থাকে, সে চারিদিক কৃষ্ণময় দেখিয়া থাকে।"

সার্ব্বভৌমের এই কথা শুনিয়া প্রভু কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া বলিলেন, "সার্ব্বভৌম চুপ কর, চুপ কর, অতিমাত্রায় স্তুতি আর নিন্দা একই কথা, একথা সর্ব্বদা মনে রাখিবে।"

ব্রহ্মানন্দ তবুও বলিতে লাগিলেন, "আজ মহাপ্রভুকে দেখিয়া আমার মনপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণে এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছে যে, আর আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ একই ব্যক্তি।

শ্রীভগবান যে সুবর্ণ বর্ণ ধারণ করিয়া কলিতে জীব তরাইতে অবতীর্ণ হইবেন, ইহা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে।”

মহাপ্রভু ভারতীর মুখে এইরূপ প্রশংসাবাদ শুনিয়া আর কাল-বিলম্ব না করিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

তদবধি ভারতী নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার জন্য একটি বাসা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং পরিচর্য্যার জন্য একজন ভৃত্য দিলেন।

৬কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

যে ভক্তপ্রবর কৃষ্ণদাসের নয়বৎসরব্যাপী কঠোর সাধনার ফলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পূতলীলাকাহিনী আজ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত হইতেছে, যাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাহিত্যাকাশের মধ্যমান দ্যুতি, ভক্তিপিপাসুগণ যাঁহার কৃপা না হইলে আজ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পবিত্র লীলা জানিবার সুযোগ পাইতেন না, সেই ভক্তচূড়ামণি কবিবর কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিশদ জীবনী জানিবার উপায় না থাকিলেও যতটুকু জানিতে পারা গিয়াছে, এস্থলে তাহারই উল্লেখ করা হইল।

অনুমান ৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে কবিরাজ গোস্বামীর আবির্ভাব হয় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। গোস্বামী মহাশয় বৈদ্যকুলসম্ভূত এবং বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার ঝামটপুর গ্রামে তাঁহার জন্মস্থান ছিল। তাঁহার পিতার নাম ভগীরথ কবিরাজ এবং মাতার নাম সুনন্দাদেবী। সুনন্দাদেবী নামেও সুনন্দা এবং কার্য্যেও সুনন্দা ছিলেন। কবিরাজ মহাশয়ের শ্যামদাস নামে একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতাও ছিল। তাঁহার পিতা জাতিগত কবিরাজী ব্যবসায় করিতেন বটে, কিন্তু এই ব্যবসায়ে তাদৃশ অর্থাগম না হওয়ায় তিনি পুত্রদ্বয়কে লইয়া অতি কষ্টে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

কবিরাজ গোস্বামীর বয়ঃক্রম মাত্র যখন ছয় বৎসর, তখন তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন। তাহার কিছুদিন পরে তাঁহার জননী দেবীও স্বর্গারোহণ করেন। বাল্যে দুই ভ্রাতা পিতৃমাতৃহীন হইয়া পিতৃষ্বসার আশ্রয়ে লালিত পালিত হন। বাল্যাবধি কবিরাজ গোস্বামী

মহাশয়ের সঙ্কল্প ছিল সংস্কৃতশাস্ত্রে অগাধ বুৎপত্তি লাভ করা। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, যদি তিনি সংস্কৃতশাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবেন। কিন্তু কয়েক জন নিষ্কাম, নিস্পৃহ, ভগবত্তত্ত্বপিপাসু সাধু-সজ্জনের সঙ্গলাভ হওয়ায় তিনি অর্থের পরিবর্ত্তে পরমার্থের বিষয়ই চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দিবারাত্র কেবল হরিনাম সংকীর্ত্তনেই অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অতঃপর তাঁহার বয়স যখন ২৩ বৎসর হইল, তখন তাঁহার পিতৃস্বসা স্বর্গারোহণ করিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃস্বসার বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন, আর তিনি নিজে মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত নামসঙ্কীর্ত্তন লইয়া দিন-যামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এইভাবে ধর্ম্মানুশীলনের দ্বারা তিনি কুড়ি বৎসর কাল কাটান। মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত নামকীর্ত্তন যতই তিনি করিতে লাগিলেন, ততই তিনি সংসারের মায়া-পাশ ছিন্ন করিয়া তাঁহার মত দেশে দেশে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইবার জন্য উৎসুক হইলেন। তাঁহার মনে নিশিদিন কেবল কৃষ্ণ-প্রেমানল জ্বলিতে লাগিল। একদিন রাত্রিকালে তিনি শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন এবং পরদিন প্রাতঃকালেই সংসারের মায়া-জাল ছিন্ন করিয়া, সংসার-মরু ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। তখন বৃন্দাবনে রূপ, সনাতন, রঘুনাথদাস, জীব গোস্বামী, কবি কর্ণপুর, গোপাল ভট্ট ও অন্যান্য বৈষ্ণব ভক্তগণ অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় তিনি রঘুনাথ দাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-মাহাত্ম্যাদি পাঠ ও শ্রবণ করিয়া একেবারে তাহাতেই তন্ময় হইয়া পড়েন। ক্রমে লীলাময় মহাপ্রভুর লীলা-কাহিনী গ্রন্থাকারে প্রচার করিবার মহতী বাসনা তাঁহার হৃদয়ে উদ্রেক হয়। তিনি গোবিন্দ-

লীলামৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা, ভাগবতশাস্ত্রগূঢ়রহস্য, অদ্বৈত সূত্রের করচা, স্বরূপ বর্ণন, বৃন্দাবন ধ্যান, ছয় গোস্বামীর সংস্কৃত সূচক, চৌষট্টি দণ্ডনির্ণয়, প্রেমরত্নাবলী, বৈষ্ণবাষ্টক, রাগমালা, শ্রীরূপ গোস্বামীর গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার, রাগময় করণ, পাষাণ্ড দলন, বৃন্দাবন পরিক্রম, রাগরত্নাবলী, শ্যামানন্দ প্রকাশ, সারসংগ্রহ ও সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যদিও বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি চৈতন্য-চরিতামৃতের রচনা তাঁহার যৌবনের রচনা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন হয় নাই।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ভক্তজনের চির আকাঙ্ক্ষিত অতি সুমধুর গ্রন্থ। এই গ্রন্থই কৃষ্ণদাস কবিরাজের খ্যাতি-স্তম্ভ। এই চরিতামৃত তিন খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম ভাগে আদি লীলা, আদি লীলায় সপ্তদশটি পরিচ্ছেদ আছে। এই সপ্তদশ পরিচ্ছেদে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকাল পর্য্যন্ত সময়ের বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় ভাগে মধ্যলীলা। এই মধ্য লীলায় পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ আছে। ইহাতে তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণ হইতে পরবর্ত্তী ছয় বৎসর কালের ইতিহাস বর্ণিত আছে। তৃতীয় ভাগে অন্ত্য লীলা; এই তৃতীয় ভাগ বিংশতি পরিচ্ছেদময়। ইহাতে তাঁহার জীবনের শেষ ঘটনাবলীর বিবরণ আছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সমগ্র শ্লোকের সংখ্যা ১২ হাজার ৬১টি মাত্র। এই চৈতন্যচরিতামৃত রচনার পূর্ব্বে আরও অনেক গ্রন্থকার মহাপ্রভুর লীলা বর্ণন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন গ্রন্থে মহাপ্রভুর লীলার সবিস্তার বর্ণন নাই। এই অভাব দূরীকরণার্থ কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় সুদীর্ঘ নয় বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়া বহু গবেষণার পর এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে সংস্কৃত,

বৃন্দাবনী, প্রাচীন বাঙ্গালা ও পার্শী—-এই কয়েক ভাষারই সমাবেশ ও সন্নিবেশ আছে।

কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিয়া তাহার পাণ্ডুলিপি শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীর হস্তে প্রদানপূর্ব্বক গ্রন্থখানি প্রকাশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। শ্রীজীব গোস্বামী পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া ইহার ভাষার লালিত্য, বর্ণনা-সৌন্দর্য্য ও পাণ্ডিত্য দর্শনে অতিমাত্র বিস্মিত হন এবং মনে মনে ভাবেন যে, এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে নিশ্চয়ই পূর্ব্বে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মর্য্যাদা লোপ পাইবে। এই ভাবিয়া তিনি পাণ্ডুলিপিখানি নষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হন না। তৎপরে গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি গৌড়ে প্রেরিত হয়, পথিমধ্যে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের রাজা ইহা লুণ্ঠন করেন। তৎপর তাঁহার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া গ্রন্থখানিকে বৃন্দাবনে রাখা হয়। অদ্যাপি অবিকৃত অবস্থায় গ্রন্থখানি বৃন্দাবনে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীশ্রীকবিরাজ গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য মুকুন্দ দত্ত গ্রন্থখানির একটি নকল রাখিয়াছিলেন, অদ্যাপি সেই নকল তাঁহার জন্মস্থান ঝামটপুরে বিদ্যমান রহিয়াছে। আজিও কবিরাজ গোস্বামীর জন্মস্থান ঝামটপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিগ্রহের পূজা হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর

হুগলী জেলার ত্রিবেণীতীরস্থ সপ্তগ্রাম নামক নগরে বৈশ্যবংশে শ্রীকর দত্তের ঔরসে এবং ভদ্রাবতী দেবীর গর্ভে শ্রীমদ্দত্ত উদ্ধারণ ঠাকুর মহোদয় ১৪০৩ শকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ভবেশ বা ভবশরণ দত্ত অযোধ্যার রামগড়ে বাস করিতেন। তথা হইতে তাঁহার বংশধরগণ সপ্তগ্রামে আসেন। বাণিজ্যার্থ বঙ্গদেশে আসিয়া ভবেশ প্রথমে বিক্রমপুরে যান এবং মহারাজা আদিশূরকে বহুমূল্য ধনরত্নসমূহ উপহার প্রদান করিয়া বসবাসের জন্য একটু স্থান প্রার্থনা করায় মহারাজা তাঁহাকে ব্রহ্মপুত্রনদতীরবর্ত্তী সুবর্ণগ্রামে বাস করিতে বলেন। সুবর্ণগ্রাম তখন সত্য সত্যই "সুবর্ণগ্রাম" ছিল। এই সুবর্ণগ্রামে অযোধ্যানিবাসী রত্নব্যবসায়িগণ কোটি কোটি টাকার রত্নের ব্যবসায় করিতেন ; এই জন্য এই স্থানের নাম সুবর্ণগ্রাম রাখা হয়। রাজা আদি-শূর এই ব্যবসায়িবৃন্দের সম্মানার্থ ইহাদিগকে "সুবর্ণবণিক" উপাধি-দিয়াছিলেন।

আদিশূরের মৃত্যুর পর বল্লাল সেন সুবর্ণবণিকগণের উপর নানারূপ অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করায় বাঙ্গালার সুবর্ণবণিকগণ ভারতের নানা স্থানে চলিয়া যান।

মহারাজা লক্ষ্মণ সেন পিতা বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর ১১১৬ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি গৌড়ের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া স্বীয় নামানুসারে "লক্ষ্মণাবতী" রাখেন। তিনি মিথিলা দেশকে গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। মিথিলার রাজপণ্ডিত কৃষ্ণ দত্ত মহাশয় ভবেশ দত্তের পুত্র ছিলেন। ইনি পরম বৈষ্ণব কবি ছিলেন।

তাঁহার মাতৃস্বস্র ছিলেন উমাপতি ধর। উমাপতি জাতিতে সুবর্ণ বণিক ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। উমাপতি লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত কবি জয়দেবের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কৃষ্ণ দত্ত অতি সুকবি ছিলেন, মহারাজ লক্ষ্মণ সেন ইঁহাকে স্বরাজ্যে আনিয়া সুবর্ণগ্রামে কয়েক বিঘা জমি দান করিয়াছিলেন। নিম্নে ইঁহার বংশতালিকা প্রদত্ত হইল :—
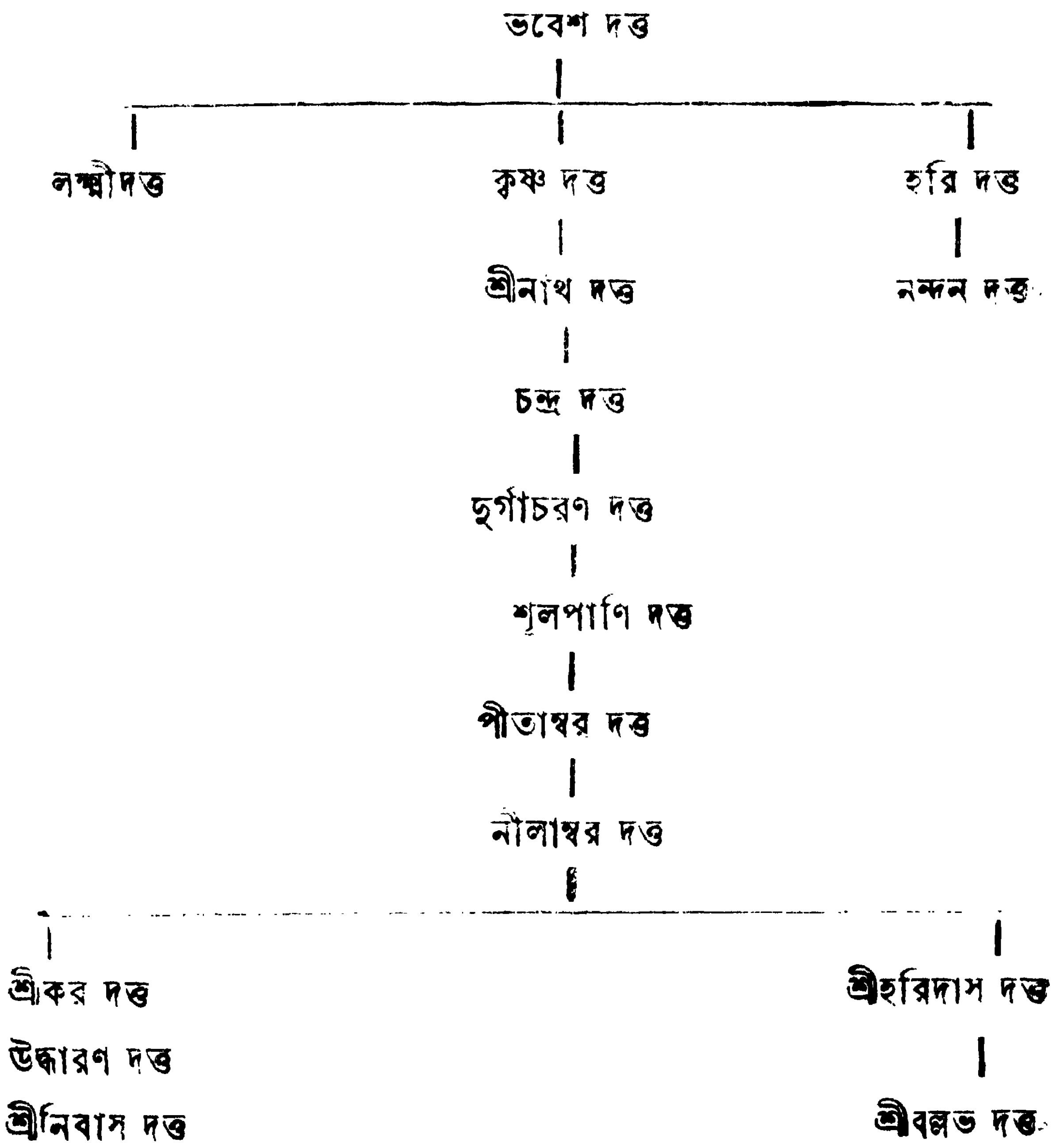
সপ্তগ্রামের দত্তেরা উদ্ধারণের নিজ বংশ। ইহার পিতা শ্রীকর দত্তের নিকট হইতে গৌড়ের অধিপতি অর্থাদি ঋণ লইতেন। শ্রীকরের মৃত্যুর পর উদ্ধারণ পিতৃদেবের বিষয়-সম্পত্তি দেখিতেন। তাঁহার বাটীতে হিন্দুর পূজা-পার্ব্বণ-সমূহ সমাধা হইত।

শ্রীমান্ উদ্ধারণ দত্ত হুসেন সাহের নিকট হইতে একটী জমিদারী খরিদ করিয়া তাহার নাম "উদ্ধারণপুর" রাখিয়াছিলেন। কাটোয়ার সন্নিকটে এই "উদ্ধারণপুর" আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। উদ্ধারণ পরম ভক্ত ছিলেন। দাতাকর্ণ গৌরী সেনের পূর্ব্বপুরুষ হলধর উদ্ধারণের নিকট কর্ম্ম করিতেন। হলধরের ভগিনী সুপ্রসন্নাকে উদ্ধারণ বিবাহ করেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দদেব উদ্ধারণের বাটীতে অবস্থান করিয়

"সপ্তগ্রামের বণিকের সব ঘরে ঘরে।
আপনি নিতাই চাঁদে কীর্ত্তন বিহরে॥"

শ্রীমৎ উদ্ধারণ মহাপ্রভু নিত্যানন্দের সহিত রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং হ্লাদিনী রাধারাণীকে দেখিবার জন্য নবদ্বীপে গিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিবাহব্যাপারে উদ্ধারণ দত্ত অনেকপ্রকার সাহায্য করিয়াছিলেন। যখন নিত্যানন্দ প্রভু জানিতে পারিলেন যে, পূর্ব্বাবতারে তাঁহার সেই প্রেমময়ী পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী রেবতী দেবীর অংশস্বরূপা "বসুধা" অম্বিকনগর-নিবাসী শ্রীযুত সূর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহে অবতীর্ণা হইয়াছেন, তখন নিত্যানন্দ উদ্ধারণকে সঙ্গে লইয়া সূর্য্য দাসের ভবনে গমন করিয়াছিলেন। প্রভু নিত্যানন্দ উদ্ধারণকে সূর্য্য-দাস পণ্ডিতের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং উদ্ধারণই সূর্য্যদাসের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া, নিত্যানন্দের পরিচয় তাঁহাকে দিয়া বিবাহের কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন। কিন্তু সূর্য্যদাস নিত্যানন্দকে বলিলেন—

"পণ্ডিত কহেন প্রভু ইহা কৈছে হয় ;
বর্ণযুক্ত গৃহাচারী আছে জাতি ভয় ॥
যদ্যপি সন্ন্যাসীরূপে তুমি নারায়ণ।
তথাপিও বর্ণত্যাগী আমি হে ব্রাহ্মণ ॥
এত শুনি নিত্যানন্দ চলিল ফিরিয়া
লোক সব নিরীক্ষয়ে চমৎকৃত হঞা ॥"

নিত্যানন্দ চলিয়া গেলেন, উদ্ধারণকে লইয়া ভাগীরথীতীরে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এদিকে বসুধাও অপস্মাররোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তখন গৌরীদাস গিয়া গঙ্গাতীরে নিত্যানন্দকে ফিরিয়া আসিতে বলিলেন। ভক্তের ইচ্ছা পরিপূরণের জন্য নিত্যানন্দ সূর্য্যদাসের বাটীতে পুনরায় উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যদাস তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। প্রভু বসুধার শয্যাপার্শ্বে গিয়া তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—

"এই কন্যা যদি মুঞি জীয়াইতে পারি।
তবে তুমি কন্যা দিবে কহ সত্য করি ॥
শুনিয়া পণ্ডিত কহে আর বন্ধুগণ।
জীয়াইলে কন্যা দিব করিলাম পণ ॥"

অতঃপর নিত্যানন্দের স্পর্শে বসুধা পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন। বসুধার সহিত নিত্যানন্দের বিবাহ হইল। কুলাচার্য্যগণ নিত্যানন্দকে তাঁহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমার নাম নিত্যানন্দ, পিতা হাড়াই পণ্ডিত, মাতার নাম পদ্মাবতী, জন্মস্থান রাঢ়প্রদেশস্থ একচাকা গ্রামে। আহারাদি সম্বন্ধে নিত্যানন্দ বলিলেন—

"প্রভু কহে কখন বা আমি পাক করি।
না পারিলে উদ্ধারণ রাধয়ে উতরি॥
এই মত পরিবর্ত্ত রূপে পাক হয়।
শুনিয়া সবার মনে লাগিলা বিস্ময়॥"

তখন কুলাচার্য্যগণ উদ্ধারণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু বলিলেন :—

"প্রভু কহে ত্রিবেণীতে বসতি উহার।
সুবর্ণ বণিক দেখি করিনু স্বীকার॥
বৈশ্য কুলেতে জন্ম হয় সদাচারী।
এজন্য উহার অন্ন ঘৃণা নাহি করি॥
সেই দিন হইতে নিত্য নিত্য মহোৎসব।
আসিয়া মিলয়ে যত আত্ম বন্ধু সব॥
প্রভু আজ্ঞামতে দত্ত করয়ে রন্ধন।
নিত্য নিত্য শত শত ভুঞ্জয়ে ব্রাহ্মণ॥"

শ্রীমদ্দত্ত উদ্ধারণই ঠাকুর নিত্যানন্দকে যজ্ঞোপবীত ও বিবাহাদি দিবার প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

উদ্ধারণ ঠাকুর আটচল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক ছয় বৎসরাবধি নীলাচলে অবস্থান করিয়াছিলেন। নীলাচল হইতে তিনি বৃন্দাবনধামে গমন করিয়া ১৪৬০ শকের অগ্রহায়ণ মাসে দেহত্যাগ করেন। জীবনের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি হরিনামেই কালাতিপাত করিয়াছিলেন। হুগলী ও কলিকাতায় আজিও ইঁহার বংশধরগণ বাস করিতেছেন। উদ্ধারণের বাসভূমি শ্রীপাট সপ্তগ্রাম আজিও বৈষ্ণবগণের পক্ষে মহাতীর্থক্ষেত্র। এই তীর্থে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-

দেবের দারুময় ষড়ভুজ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর প্রতিদিন এই মূর্ত্তির পূজা করিতেন। আজিও সুবর্ণবণিকসমিতির চেষ্টায় এই মূর্ত্তির নিত্যপূজা হইয়া থাকে। উদ্ধারণের বাসভূমি সপ্তগ্রাম একসময়ে বাঙ্গালার গৌরবস্থল ছিল। গন্ধবণিক ও সুবর্ণ বণিকগণ সপ্তগ্রামে বাস করিতেন, সপ্তগ্রাম ছাড়িয়া তাঁহারা আর কোথাও যাইতেন না। শাস্ত্রে আছে, এখানে পূর্ব্বে সপ্ত ঋষি তপস্যা করিতেন। কলিকাতার অপর পারস্থ হাওড়া ষ্টেশন হইতে ২৭ মাইল দূরে ত্রিশ বিঘা ষ্টেশন প্রতিষ্ঠিত। এই ষ্টেশনের নিকটেই মূল সপ্তগ্রাম অবস্থিত ছিল। কেহ কেহ বলেন, সাতটি গ্রাম ধরিয়া সপ্তগ্রামের নামকরণ করা হইয়াছিল। সপ্তগ্রামে প্রাচীন কীর্ত্তির অনেক ধ্বংসাবশেষ এখনও ভাবুকের চক্ষে অশ্রুধারা প্লাবিত করায়।

শ্রীপাট সপ্তগ্রামস্থ শ্রীমৎ উদ্ধারণ ঠাকুরের শ্রীমন্দিরোদ্যান মধ্যে একটি নুপুর কুণ্ড আছে। ইহাকে দেখিলে শ্যামকুণ্ড বা রাধাকুণ্ড অথবা স্বর্গের অমৃতকুণ্ড বলিয়াই বোধ হয়। এই কুণ্ডের তীরবর্ত্তী নিভৃতকুঞ্জে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বাল্যভাবাবেশ উদ্ধারণকে লইয়া লুকোচুরি খেলা করিতেন—কখনও সেই কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া জলক্রীড়া করিতেন। একদিন জলক্রীড়া করিতে করিতে নিত্যানন্দের চরণ হইতে নুপুর খসিয়া জলে পড়ে। তদবধি কুণ্ডটির নাম "নুপুর কু-" হয়।

উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর দ্বাদশ গোপালের মধ্যে অন্যতম। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের পূর্ব্বলীলায় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণলীলার সময়ে তিনি সুবাহু গোপ নামক গোপাল ছিলেন। এখন শ্রীকৃষ্ণ অবতারে উদ্ধারণ দত্ত নামে বৈষ্ণব জগতে দ্বাদশ গোপালের মধ্যে একজন গোপাল হইয়া ছিলেন।

"সুবাহুর্যো ব্রজগোপো দত্ত উদ্ধারণাখ্যকঃ।"

উদ্ধারণ দত্ত সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। একদিন এক শঙ্খবিক্রেতা সরস্বতী নদী নিকট দিয়া শঙ্খ বিক্রয় করিবার জন্য সপ্তগ্রাম যাইতেছিল। এমন সময়ে একটি পরমাসুন্দরী বালিকা আসিয়া তাহাকে বলিলেন, "আমাকে এক জোড়া ভাল শাঁখার বালা দেও"। শাঁখারী ভাল এক জোড়া বালা তাঁহাকে দিয়া দাম চাহিলে, তিনি বলিলেন, "আমার পিতা উদ্ধারণের নিকট গিয়া তুমি ইহার দাম পাইবে।"

শাঁখারী বলিল, "তিনি যদি দাম না দেন, তবে?"

বালিকা বলিলেন, "তাঁহাকে বলিবে যে, পূর্ব্বঘরের পশ্চিমে কুলিঙ্গায় পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা আছে, তাহা আমাকে তোমার মেয়ে দিতে বলিয়াছেন। যদি তিনি তোমাকে দাম না দেন, তবে এইখানে আসিলেই দাম পাইবে।"

শাঁখারী উদ্ধারণের বাটী যাইয়া শাঁখার দাম চাহিতেই উদ্ধারণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমার ত কোন মেয়ে নাই!" শাঁখারী বলিল," সে কি অমন দুধে আলতায় মিশান রং, ভুবনমোহিনী প্রতিমা, আপনি তাঁহাকে মেয়ে বলিয়াই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন! তিনি বলিয়া দিয়াছেন, পূর্ব্বঘরের পশ্চিম কুলুঙ্গেতে পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা আছে, আমাকে তাহা আনিয়া দিন, আমি হৃষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিয়া যাই।" উদ্ধারণ তাহাই করিলেন, যাইয়া দেখেন সত্য সত্যই কুলুঙ্গিতে পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা রহিয়াছে। তিনি শাঁখারীকে সেই মুদ্রা পাঁচটি দিয়া মেয়ে দেখিতে গেলেন, কিন্তু পাঁতি পাঁতি করিয়াও তাঁহার দর্শন পাইলেন না। তখন উদ্ধারণ হাহাকার করিতে লাগিলেন; বুঝিলেন, ইহা মহামায়ারই মায়া।

রঘুনাথ দাস

বর্ত্তমান ত্রিশ বিঘা ষ্টেশনের নিকট পূর্ব্বে সপ্তগ্রাম বলিয়া একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। বাণিজ্য-ব্যবসায়ের জন্য এই সপ্তগ্রাম তৎকালে অতি প্রসিদ্ধ ছিল। প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে এখানে হিরণ্যক ও গোবর্দ্ধন দাস নামে দুই জন ধনী বাস করিতেন। ইঁহারা দুই ভাই গৌড়ের অধিপতি সৈয়দ হুসেন সাহের কর সংগ্রহ করিয়া দিতেন। সপ্তগ্রাম অঞ্চল হইতে ইঁহারা মোট ২০ লক্ষ টাকা কর সংগ্রহ করিয়া দিয়া অবশিষ্ট আট লক্ষ টাকা নিজেরা গ্রহণ করিতেন। সৈয়দ হুসেন শাহ ইঁহাদের সত্যনিষ্ঠা-দর্শনে পুলকিত হইয়া ইঁহাদিগকে "মজুমদার" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

গোবর্দ্ধন দাসের একটি মাত্র পুত্র ছিল তাহার নাম রঘুনাথ। হিরণ্যকের কোন সন্তানাদি ছিল না। পিতৃব্য হিরণ্যক অপুত্রক বিধায় রঘুনাথকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। রঘুনাথের কোন প্রকার অভাব-অভিযোগ ছিল না। কিন্তু ধনৈশ্বর্য্যের মধ্যে সর্ব্বদা আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিলেও বাল্য কাল হইতে তাঁহার মন কেমন বিষয়-বিরাগী হইয়া উঠিয়াছিল। পিতার যত্নে রঘুনাথ বাল্য বয়সেই সংস্কৃতশাস্ত্রে সাতিশয় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ঠাকুর হরিদাস হিরণ্যক ও গোবর্দ্ধন দাসের কুল-পুরোহিত বলরাম আচার্য্যের গৃহে বাস করিতেছিলেন। রঘুনাথ বলরামের গৃহে শিক্ষার্থ গমন করিতেন, সেইখানে হরিদাসের সহিত তাঁহার পরিচয় ও তাঁহার ভক্তিভাব-দর্শনে তাঁহার দিকে রঘুনাথের মন আকৃষ্ট হয়। রঘুনাথ দেখিলেন, সংসারে অনিত্য বিষয়-সুখ পরিহার করিয়া হরিদাস ভক্তি-সরোবরে স্নান করিয়া

পরম আনন্দে দিনাতিপাত করিতেছেন। রঘুনাথের প্রাণের তন্ত্রীতেও যেন কোন্ অজ্ঞাত হস্ত ঝঙ্কার দিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণের জন্য তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেছে।

সেই সময়ে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতের বাটীতে আসিয়াছেন। রঘুনাথ মহাপ্রভুর নাম শুনিয়াছিলেন, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রঘুনাথ পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, গোবর্দ্ধন দাসের প্রাণ কি আর সন্ন্যাসী-দর্শনে পুত্রকে যাইতে দিতে চাহে? তিনি নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক কেবল পুত্রের মনে ব্যথা লাগিবার ভয়ে তাঁহাকে শান্তিপুরে যাইতে অনুমতি দিলেন। রঘুনাথের জন্য একখানি শিবিকা আসিল, নানা দ্রব্যসম্ভার তিনি মহাপ্রভুকে নিবেদন করিবার জন্য লইলেন, অতঃপর দ্বারবান প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া রঘুনাথ শান্তিপুরে উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু গাঢ় আলিঙ্গনপাশে রঘুনাথকে আবদ্ধ করিলেন। রঘুনাথ মহাপ্রভুর নিকট সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহাকে অনাসক্তভাবে সংসারাশ্রম করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিলেন। রঘুনাথ মহাপ্রভুর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু মনপ্রাণ তাঁহার বাঁধা থাকিল মহাপ্রভুর শ্রীচরণে। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গম যেমন একবার উন্মুক্ত বাতাসে উড়িয়া বেড়াইবার সুযোগ পাইলে আর পিঞ্জরে আবদ্ধ হইতে চাহে না, সন্ন্যাসের শৃঙ্খলবিহীন ধর্ম্মজীবনের আস্বাদন পাইয়া রঘুনাথের মনপ্রাণও আর সংসার-পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিতে চাহিল না। গোবর্দ্ধনদাস পুত্রের এই প্রকার বিষয়-বৈরাগ্য-দর্শনে চিন্তিত হইলেন এবং রঘুনাথ তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিয়া পলাইতে না পারে এজন্য পাঁচজন পাইককে সর্ব্বদা তাঁহার উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য

নিযুক্ত করিলেন। রঘুনাথের বাহ্যিক দেহ আজ পিতৃ-প্রাসাদে অবরুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু তাঁহার মন স্বাধীন রাহিল।

রঘুনাথ শুনিতে পাইলেন, মহাপ্রভু শান্তিপুর হইতে নীলাচলে চলিয়া গিয়াছেন। শুনিয়া তাঁহার বড় ইচ্ছা হইল নীলাচলে যাইতে। তিনি সুযোগ পাইলেই নীলাচলের দিকে ছুটিতেন, পাইকেরা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া আসিত। পাড়ার সকলে আসিয়া বলিল, রঘুনাথ পাগল হইয়াছে, উহাকে রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া রাখ। গোবর্দ্ধনদাস তাহাই করিলেন। কিন্তু তাহাতেও রঘুনাথের পাগলামী কমিল না। তিনি বন্ধনাবস্থাতেও "শ্রীগৌরাঙ্গ" বলিয়া অহর্নিশ চীৎকার করিতেন—দুই গণ্ড দিয়া অশ্রু-ধারা বিগলিত হইত। রঘুনাথের এইরূপ অদম্য ভগবৎ-পিপাসা-দর্শনে গোবর্দ্ধনদাস ভাবিলেন, হায়! অনিন্দ্যসুন্দরী ভার্য্যা এবং অনন্ত বিষয় ঐশ্বর্য্য যাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না, সামান্য রজ্জু তাহাকে কিরূপে বাঁধিয়া রাখিবে? তিনি রঘুনাথের বন্ধন-রজ্জু খুলিয়া দিলেন।

এই সময়ে মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে পাণিহাটি গ্রামে আসিয়াছিলেন। রঘুনাথ বন্ধনমুক্ত হইয়াই পাণিহাটিতে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জহুরী জহর চিনে। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু রঘুনাথকে দেখিয়া একজন অকপট ভক্ত বলিয়া চিনিতে পারিলেন। অতঃপর নিত্যানন্দের আদেশে রঘুনাথ পাণিহাটিতে একটি দধি-চিড়ার মহোৎসব দিলেন।

পাণিহাটি হইতে রঘুনাথ গৃহে ফিরিয়া গেলেন। আবার তাঁহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য প্রহরীর ব্যবস্থা হইল। তখন আর তিনি অন্তঃপুরে থাকেন না। পত্নীর সহিত তিনি রাত্রিতে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত না করিয়া বহির্ব্বাটীতে আসিয়া শুইয়া থাকিতেন। নীলাচলে যাইবার জন্য তাঁহার প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

একদিন প্রত্যূষে প্রহরিগণকে নিদ্রিত দেখিয়া রঘুনাথ ধীরে ধীরে বাটী পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। যে সময়ে রঘুনাথ নীলাচলে যাইতে ছিলেন, সেই সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণেরও নীলাচলে যাইবার কথা। রঘুনাথ দেখিলেন, তিনি রাজপথ ধরিয়া গেলে কাহারও না কাহারও নয়নগোচর হইবেন, এই ভাবিয়া তিনি বন জঙ্গলের পথ ধরিয়া নীলাচলাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। রাত্রিতে এক গোয়ালার বাটীতে থাকিয়া রঘুনাথ পরদিন আবার নীলাচলাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

প্রভাতে উঠিয়া গোবর্দ্ধনদাস দেখিলেন, রঘুনাথ ঘরে নাই। তখন তাঁহার মনে হইল, রঘুনাথ নিশ্চয়ই নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। তখন শিবানন্দ সেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অধিনায়ক হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে নীলাচলে লইয়া যাইতেন। গোবর্দ্ধনদাস শিবানন্দের নামে একখানি চিঠি দিয়া দশজন লোক রঘুনাথের অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। ঝাকরা নামক স্থানে শিবানন্দের সহিত গোবর্দ্ধনদাস-প্রেরিত লোকদের সাক্ষাৎ হইল। শিবানন্দ পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন, তাঁহাদের সহিত রঘুনাথ আসেন নাই, দূতেরা নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়া গোবর্দ্ধনদাসকে এই সংবাদ দিল। গোবর্দ্ধন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার বাটীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাঁদিতে লাগিল। রঘুনাথের যুবতী স্ত্রী বক্ষে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে রঘুনাথ ঝড়, বৃষ্টি, পথশ্রান্তি, বন, জঙ্গল কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে নীলাচলাভিমুখে ছুটিতে লাগিলেন; বার দিনের দিন তিনি নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, এই দ্বাদশ দিনের মধ্যে তিন দিন মাত্র তিনি অন্নাহার করিয়াছিলেন। বাকী কয়েক দিন তাঁহার একরূপ উপবাসেই কাটিয়াছিল।

পুরুষোত্তমে পৌছিয়া রঘুনাথ একেবারে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত

হইলেন। তখন মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদর, মুকুন্দ দত্ত প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। রঘুনাথকে দেখিয়াই মহাপ্রভু উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণের কৃপাই আজ তোমায় বিষয়-বিরাগী করিয়া তুলিয়াছে।" রঘুনাথ বলিলেন, "ঠাকুর আমি শ্রীকৃষ্ণ বুঝি না, আপনার দয়ায় আমি বিষয়ের আকর্ষণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছি।"

অতঃপর মহাপ্রভু স্বরূপের হস্ত টানিয়া লইয়া রঘুনাথের হস্ত তাহাতে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "আমি আজ হইতে রঘুনাথকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম, তুমি ইহার যাহা কিছু সেবার ভার গ্রহণ কর।" স্বরূপ দামোদর নতমস্তকে প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন।

রঘুনাথ প্রতিদিন সমুদ্র-স্নানান্তে জগন্নাথদেবের সিংহদ্বারে আসিয়া ভিক্ষার্থীর মত দাঁড়াইয়া থাকিতেন, যাত্রিগণ যেমন অন্যান্য ভিক্ষার্থীকে দেয়, সেইরূপ রঘুনাথকেও কিছু কিছু প্রদান করিত। ধনী বিলাসীর পুত্র রঘুনাথ ইহাতে একটুও লজ্জিত হইতেন না। কিন্তু ক্রমে যাত্রীরা তাঁহার পরিচয় পাইয়া ক্রমে তাঁহাকে নানাপ্রকার উপাদেয় ভোজ্য আনিয়া দিতে লাগিল। রঘুনাথ দেখিলেন, মহাবিপদ, উপাদেয় ভোজ্য খাইতে হইবে, এই আশঙ্কায় স্বরূপ দামোদরের বাটীর আহার্য্য ছাড়িলাম, এখানে আসিয়াও সেই বিপদ। মহাপ্রভুর নিকট তত্ত্বকথা শিখিতে গেলে তিনি বলিয়াছিলেন, "কখনও গ্রাম্য কথা শুনিবে না, আর ভাল খাইবে না ও ভাল পরিবে না, নিজে অমানী হইয়া অপরকে মান দান করিবে এবং রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি ধ্যান করিবে।" কিন্তু সিংহদ্বারে তাহার বিপরীত হইতে চলিল। রঘুনাথ অগত্যা সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিলেন।

এদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নীলাচলে পৌঁছিলেন, রঘুনাথের সহিত তাঁহাদের সকলের পরিচয়ও হইল। চারিমাস কাল তাঁহারা

নীলাচলে অবস্থান করিয়া গৌড়দেশে ফিরিয়া আসিলেন। গোবর্দ্ধনদাস তখন শিবানন্দ সেনের নিকট চিঠি লিখিয়া জানিলেন যে, তাঁহার পুত্র রঘুনাথ পুরীধামে অতি কঠোর বৈরাগ্য সাধন করিতেছে। পুত্রের অবস্থা শুনিয়া দুঃখে কষ্টে গোবর্দ্ধনের হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। যে গোবর্দ্ধনদাসের দ্বারে শত শত লোক প্রতিদিন অকাতরে অন্নবস্ত্র পাইতেছে, সেই গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ আজ একমুষ্টি অন্নের জন্য শীতাতপের মধ্যে কত না কষ্ট পাইতেছে, এ চিন্তা যে দুঃসহ হইতেও দুঃসহ! কিন্তু কি করেন! পুত্র যে পথে গিয়াছে, সে পথ হইতে ত সে শীঘ্র ফিরিবে না, অগত্যা গোবর্দ্ধনদাস পুত্রের আহার-বিহারের জন্য চারিশত সুবর্ণ মুদ্রা রঘুনাথের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

রঘুনাথ পিতার মনস্তুষ্টির জন্য মুদ্রাগুলি গ্রহণ করিলেন। পিতৃ-প্রেরিত লোকেরা ফিরিয়া আসিলে রঘুনাথই সেই মুদ্রা দিয়া মাসে দুই দিন করিয়া মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিবার অর্থাৎ আহার করাইবার ব্যবস্থা করিলেন। মহাপ্রভু প্রতিমাসে দুইদিন করিয়া রঘুনাথের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। পরে রঘুনাথ বিষয়ীর অর্থে গৌরাঙ্গদেবের ভিক্ষা দেওয়া সমীচীন নহে বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ করা বন্ধ করিয়া দেন।

এখন হইতে রঘুনাথ ছত্রে গিয়া ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভু রঘুনাথের ভক্তিভাব-দর্শনে তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে গোবর্দ্ধনশিলা ও গুঞ্জমালা দান করেন। রঘুনাথ ছত্রে ভিক্ষা করিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, কেন না ছত্রে লোকে তাঁহাকে ভাল চাউল, ডাইল দেয়। তাই তিনি মন্দিরের চারি পার্শ্বে পশারীরা যে সমস্ত পচা প্রসাদান্ন ফেলিয়া দিত, দুর্গন্ধে যাহা গরুতেও পর্য্যন্ত খাইত না, রঘুনাথ তাহা লইয়া রাত্রিতে জলে তাহা ধৌত করিয়া তন্মধ্যে যেগুলি

একটু শক্ত শক্ত থাকিত, তাহা খাইতেন। রঘুনাথ এইরূপ খাদ্য খান, তাহা শুনিতে পাইয়া মহাপ্রভু একদিন রাত্রিকালে হঠাৎ রঘুনাথের কুটীরে উপস্থিত হইয়া রঘুনাথের হাত হইতে প্রথম গ্রাস কাড়িয়া লইয়া ভক্ষণ করেন। অতঃপর যখন দ্বিতীয় গ্রাস খাইতে যাইবেন, তখন স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর হাত হইতে সে গ্রাস কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "এরূপ অখাদ্য অন্ন আপনার খাইতে নাই।" মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া বলিলেন, "আমি নিত্য নিত্য যে অন্ন খাই, তাহা হইতে ইহা শতগুণে উপাদেয়।"

রঘুনাথ এইভাবে ষোল বৎসরকাল নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু অন্তর্হিত হইলে এবং তৎপরে স্বরূপ দেহ ত্যাগ করিলে রঘুনাথ নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে চলিয়া যান। একদিন তিনি মহাপ্রভুর শোকে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত হইতে লম্ফ দিয়া পড়িবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, রূপ-সনাতন তাঁহাকে সে সঙ্কল্পচ্যুত করেন।

বৃন্দাবনে তিনি সামান্য "মাঠা" খাইয়া জীবন ধারণ ও কঠোর সাধনা করিতেন। কখনও অন্ন জল গ্রহণ করিতেন না। ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় তিনিও একলক্ষ বার হরিনাম জপ করিতেন। রঘুনাথের কয়েকখানি অতি মূল্যবান সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, বৃন্দাবনধামে অবস্থানের সময় তিনি ইহা রচনা করেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ৮৫ বৎসর বয়সে রঘুনাথ বৃন্দাবনধামে দেহত্যাগ করেন।

শ্রীজীব গোস্বামী

মহাপ্রভুর প্রিয়তম শিষ্য রূপ-সনাতন গোস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী। জীব গোস্বামী ন্যায়, দর্শন, ব্যাকরণ প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। জীব গোস্বামী শৈশবাবধি পিতৃব্য রূপ গোস্বামীর নিকট থাকিতেন, তাহার ফলে ভক্তি-বীজ তাঁহার শৈশব-হৃদয়েই অঙ্কুরিত হইয়াছিল। বংশের একজন যদি সৎপথাবলম্বী হয়, তদ্দৃষ্টে অন্য সকলেও ধীরে ধীরে তাঁহার পথ অনুসরণ করে। সুতরাং সনাতনের পুত্র জীব গোস্বামীও যে ভক্তিধনের অধিকারী হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? রূপ-সনাতন যখন বৃন্দাবনে গিয়া বসবাস করেন, বল্লভও সেই সময় বৃন্দাবনে গিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। তথায় বল্লভের ঔরসে শ্রীজীবের জন্ম হয়। শ্রীজীব কখনও দারপরিগ্রহ করেন নাই। জীব গোস্বামী তদানীন্তনকালে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। রূপ-সনাতনের দেহত্যাগের পর জীব গোস্বামীই বৃন্দাবনে বৈষ্ণব-সমাজের নায়ক হইয়া মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামীর "ষট্‌সন্দর্ভ" নামক পুস্তকখানি আজিও বৈষ্ণব সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সমাদরের সহিত পঠিত হইয়া থাকে।

রূপ-সনাতনও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া একদিন এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তাঁহাদের সহিত বিচার বিতর্ক করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। রূপ-সনাতন পরম বিনয়ী ছিলেন,

তাই তিনি দিগ্বিজয়ীর সহিত বিচার না করিয়া তাঁহাকে পরাজয়-পত্র লিখিয়া দেন। জীব গোস্বামী যে সময়ে যমুনায় স্নান করিতেছিলেন, রূপ-সনাতনের নিকট জয়-পতাকা পাইয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ভাবিলেন, যদি জীব গোস্বামীকে পরাজিত করিতে পারি, তবেই আমার দিগ্বিজয় সার্থক হয়। শুনিয়াছি, জীব গোস্বামী নাকি ন্যায়, দর্শন, ব্যাকরণ প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত। ইহা ভাবিয়া দিগ্বিজয়ী সেই যমুনার তটে উপস্থিত হইয়াই হুঙ্কার করিয়া জীব গোস্বামীকে বলিলেন, "তুমি যদি আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে চাও, তবে হও, না হয় আমাকে পরাজয়-পত্র লিখিয়া দিয়া আপন মান রক্ষা কর।"

দিগ্বিজয়ীর দাম্ভিকতা-পূর্ণ কথাগুলি জীব গোস্বামীর প্রাণে বড়ই লাগিল। তিনি বুঝিলেন, দাম্ভিক দিগ্বিজয়ী রূপ-সনাতনের বিনয় বুঝিয়াও বুঝিতে পারে নাই। তাই তিনি দিগ্বিজয়ীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন ও তাঁহাকে পরাভূত করিলেন।

"যমুনায় শ্রীজীব গোসাঞি স্নান করে।
হস্তী অশ্ব সহ দিগ্বিজয়ী গিয়া তীরে ॥
কহে রূপ-সনাতন বিচারের ডরে।
জয়পত্র লিখি দোঁহে দিলা যে আমারে ॥
তুমিহ বিচার কর নহে লিখি দেহ।
গোসাঞি শুনিয়া কিছু হইল অসহ ॥
মনে মনে চিন্তে এই পণ্ডিতাভিমানী।
রূপ-সনাতনের মহিমা নাহি জানি ॥
পরাভব হৈল বলি করিয়াছে গর্ব্ব।
তাহার উচিত আজি করিব যে খর্ব্ব ॥

ইহা ভাবি কহে তুমি রূপ-সনাতনে।
বিনে শাস্ত্র প্রসঙ্গেতে জিনিলে কেমনে॥
সে বা হউ তাঁহা সবা সহিত বিচারে।
তুমি ত না হও যোগ্য তেঁই থাক দূরে॥
আমি তাঁহা সভার ক্ষুদ্র শিষ্য অভিমানী।
মোরে পরাভব কর, তবে তোমা জানি॥
এত কহি বিচার তাহার সনে কৈল।
দিগ্বিজয়ী বিচারে হারি দর্প-খর্ব্ব হৈল॥"—শ্রীশ্রীভক্তমাল।

দিগ্বিজয়ী পরাজিত হইলেন বটে, কিন্তু রূপ এই সংবাদ শুনিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ জীবের নিকটে গিয়া বলিলেন, "তুমি বৈষ্ণব হইয়া এইরূপ দাম্ভিকতার পরিচয় দিলে কেন? তুমি কি জান না তৃণ হইতেও সুনীচ হইয়া বৈষ্ণবের থাকা উচিত? তুমি বৈষ্ণবের নীতি লঙ্ঘন করিয়াছ, অতএব আমি আর তোমার মুখদর্শন করিব না।" এই বলিয়া রূপ ব্যথিত-অন্তঃকরণে, অভিমানভরে যমুনাতটে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, অন্নজল ত্যাগ করিলেন, শ্রীজীব গোস্বামীর জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এদিকে সনাতন ভ্রাতা রূপের এইরূপ কঠোর উপবাস দর্শনে যমুনাতটে গিয়া রূপকে বলিলেন, "জীবের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য?" উত্তরে রূপ বলিলেন, "জীবমাত্রকেই দয়া করা কর্ত্তব্য।" উত্তর শুনিয়া সনাতন বলিলেন, তাহা হইলে জীবের প্রতি দয়া কর, উঠিয়া অন্নজল গ্রহণ কর।"

রূপ বুঝিতে পারিলেন, জীবের পক্ষ হইতেই সনাতন তাঁহার নিকট জীবের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিতেছেন, তাই তিনি উঠিয়া অন্নজল গ্রহণ করিলেন।

"এ কথা শুনিয়া রূপ গোসাঞি কুপিয়া।
জীব গোসাঞি কহে ভর্ৎসন করিয়া॥
তুমি ত বৈরাগী হারি জিত তেজি হৈলে।
তবে কেন জিতিবারে আগ্রহ করিলে॥
সেই ব্যক্তি হারি জিত অভিমান ময়।
তাহার হৃদয়ে হয় জয়-পরাজয়॥
তুমি কেনে পরাভব আপনি হইয়া।
না দিলে তাহার মান দীনতা করিয়া॥
তেঁহ কহে কৈল মোর গুরুর নিন্দন।
বিধি অনুসারে তার করিল শাসন।
জীব গোসাঞির কভু অভিমান নাই।
তাহাও বুঝিয়াছেন শ্রীরূপ গোসাঞি॥
তথাপিহ শাসন করয়ে ভঙ্গি করি।
লোক শিখাবার হেতু তাহার উপরি॥
কহে আজি হৈতে তব না হেরিব মুখ।
বজ্রতুল্য বাক্য শুনি কাঁপি গেল বুক॥
কাতর হইয়া বহু স্তুতি নতি কৈলা।
যদ্যপি গোসাঞি তাহে প্রসন্ন হইলা॥
অন্ন জল তেয়াগতে যমুনার তীরে।
গোসাঞির পদ মাত্র ধেয়ান অন্তরে॥
পড়িয়া রহিলা দুনয়নে ধারা বহে।
বিশীর্ণ হইল দেহ প্রাণমাত্র রহে॥
কথোক দিবস ব্যাজে বিশেষ কথন।
শুনিয়া খেদিত হৈলা শ্রীল সনাতন॥

শ্রীরূপ নিকটে যাইয়া ধীরে ধীরে।
বাক্য ছল করি তাঁরে এক প্রশ্ন করে ॥
সদাচার যতেক তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
কিবা স্থির করিয়াছ সকলের ইষ্ট ॥
শ্রীরূপ কহেন প্রভু মোর বিবেচনে।
জীবে দয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রেতে বাখানে ॥
গোসাঞি কহেন তবে কেনে নাহি হয়।
বাক্যের শ্লেষেতে তেঁহ বুঝিলা হৃদয় ॥
"যে আজ্ঞা" বলিয়া জীব গোসাঞিরে ডাকি।
আলিঙ্গন করি দিলে ছল ছল আঁখি ॥"

—শ্রীশ্রীভক্তমাল।

রূপ-সনাতনের দেহত্যাগের পর শ্রীজীব গোস্বামীই বৈষ্ণবধর্ম্মের ধারক ও বাহক ছিলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্য্য অন্যতম। তাঁহার পিতা গদাধর ভট্টাচার্য্য বর্দ্ধমান জেলার চাকন্দী গ্রামে বাস করিতেন। গদাধর অতি সুপণ্ডিত ছিলেন, অনেক ছাত্র তাঁহার চতুস্পাঠীতে অধ্যয়ন করিত। গদাধর মহাপ্রভুর লীলা-কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্যও অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ছাত্রগণ মহাপ্রভুকে বড় ভক্তির চক্ষে দেখিত না, কাজেই গদাধর নিজের ইচ্ছা সত্ত্বেও এত দিন শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন করেন নাই। অবশেষে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যখন কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা-গ্রহণের জন্য উপস্থিত হন, ক্ষৌরকার যখন কাঁদিতে কাঁদিতে মহাপ্রভুর চাচর চিকুর কেশ মুণ্ডন করিয়া দেয়, তখন গঙ্গাধর কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন করেন। অন্যান্য ভক্তগণের ন্যায় তিনিও মহাপ্রভুর সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন দর্শনে কাঁদিয়া আকুল হন। সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর মহাপ্রভু কাটোয়া হইতে শান্তিপুরে আসেন এবং শান্তিপুরে মাতা শচীদেবীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া নীলাচলে চলিয়া যান। এদিকে গঙ্গাধর গৃহে ফিরিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম জপ করিতে থাকেন। তাঁহার সন্তানাদি ছিল না, সন্তানাদি হইবারও কোন লক্ষণ হয় নাই। তাই তিনি মহাপ্রভুর অনুগ্রহ-লাভাশায় সহধর্ম্মিণী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে সঙ্গে

লইয়া নীলাচলে যাইয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে পড়েন। মহাপ্রভু অন্তর্য্যামী, তিনি গঙ্গাধর ও তদীয় পত্নীর আগমনের কারণ বুঝিতে পারিয়া গোবিন্দকে বলিলেন, "দেখ এই ভক্ত-দম্পতীকে বল, তাহারা যে উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছে তাহাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।" মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া গদাধর ও তদীয় পত্নী হৃষ্টচিত্তে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর শুভদিনে শুভক্ষণে লক্ষ্মীপ্রিয়ার গর্ভে একটি সুন্দর সুঠাম নয়নাভিরাম পুত্র-রত্ন প্রসূত হইল। পিতা মাতা আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন শ্রীনিবাস।

পিতা মাতার শিক্ষাদীক্ষার উপরই পুত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। পিতা মাতা যদি ভক্তিমান, পুণ্যবান ও ধার্ম্মিক হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিতেও যে সেই গুণ বর্ত্তিবে ইহা সুনিশ্চিত। শ্রীনিবাস-জননী শিশুর আধ আধ কথা শুনিয়া তাহার নিকট ভগবৎ-বিষয়ক শ্লোকসমূহ বলিতেন। শিশু শ্রীনিবাসও আধ আধ স্বরে যখন সেই শ্লোকসমূহ আবৃত্তি করিত, তখন পিতা মাতার আর আনন্দের অবধি থাকিত না। কালক্রমে শ্রীনিবাস যখন বাল্য দশায় উপনীত হইলেন, তখন এই শ্রীচৈতন্যভক্তি তাঁহাতে দেদীপ্যমান হইয়া ফুটিয়া উঠিল। শ্রীনিবাস বাল্যাবস্থাতেই জ্ঞানপিপাসু হইয়া উঠিলেন। গঙ্গাধর শ্রীনিবাসকে চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নার্থ পাঠাইলেন। বালক শ্রীনিবাস অল্পদিনের মধ্যে কাব্য, অলঙ্কার ও দর্শনে এত প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন এবং এরূপ প্রতিভার পরিচয় দিলেন যে, সেরূপ প্রতিভা তদঞ্চলে কেহ কখনও পূর্ব্বে দেখে নাই। শুধু ইহাই নহে, অধ্যয়ন-স্পৃহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে ভক্তির ধারাও ফল্গু-প্রবাহে প্রবাহিত হইতে লাগিল। শ্রীনিবাস যেখানেই দেখেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কথা অথবা কীর্ত্তন হইতেছে, শত কাজ ফেলিয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হন।

একদিন যাজিগ্রামে যাইতেছেন, এমন সময় শ্রীনিবাসের সহিত পথি-মধ্যে কাটোয়া-নিবাসী ভক্তপ্রবর নরহরি সরকারের সাক্ষাৎ হইল। নরহরি ইতিপূর্ব্বেই শ্রীনিবাসের প্রতিভা ও অনন্যসাধারণ ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, শ্রীনিবাসও নরহরি ঠাকুরের ভক্তির কথা অবিদিত ছিলেন না। উভয়ে উভয়কে দর্শন করিবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল ছিলেন। আজ ঘটনাচক্রে পথিমধ্যে উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীনিবাস বিশেষ আকুলভাবে নরহরিকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলেন। নরহরি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রসঙ্গ বলিতে বলিতে একেবারে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। নরহরির সেই ভগবৎ ভক্তি—সেই চৈতন্যপ্রীতিদর্শনে শ্রীনিবাসের প্রাণে ভক্তির বন্যা আরও উদ্বেলিত হইল। তিনি নরহরির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটীতে আসিয়াই পিতা গদাধর বা "চৈতন্যদাসের" নিকট শ্রীচৈতন্যের মহিমা জিজ্ঞাসা করিলেন।

পুত্রমুখে চৈতন্য-কথা শ্রবণ করিয়া চৈতন্যদাসের আনন্দের আর সীমা থাকিল না। নিশিদিন যে চৈতন্য ছাড়া তিনি কিছু জানেন না, যে চৈতন্য তাহার ধ্যান-জ্ঞান, সেই চৈতন্য-কথা আজ তাঁহার পুত্র জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন, পিতার নিকট ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? চৈতন্যদাস বলিলেন, "বাবা! সে গোরার কথা আর কি বলিব? সে গোরার অস্ত্র নাই, শস্ত্র নাই, অথচ তিনি শুধু প্রেমদান করিয়া পাপী তাপী নারকীকে উদ্ধার করেন। দস্যু তাঁহাকে দর্শন করিয়া দস্যুতা পরিত্যাগ করে,—ঘাতক তাঁহাকে দর্শন করিয়া শাণিত অস্ত্র পরিত্যাগ করে,—মাতাল তাঁহাকে দেখিয়া মদ্যভাণ্ড দূরে নিক্ষেপ করিয়া সাধু হয়,—লক্ষপতি ধনী তাঁহার পদস্পর্শে ছিন্নকন্থাধারী সন্ন্যাসীতে পরিণত হয়। বাবা! আমি সেই ভুবনমোহন অপরূপ

রূপ দেখিয়াছি, দেখিয়া সেই রূপসাগরে ডুবিয়াছি, বোধ হয় জীবনে তেমন রূপ আর দেখিব না।” বলিতে বলিতে বৃদ্ধ চৈতন্যদাস একেবারে ভাবাবেশে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, শ্রীনিবাসও পিতার অবস্থা দেখিয়া নিজে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। পিতাপুত্র উভয়েই ভাবে বিভোর।

এইভাবে পিতাপুত্রের কিছুদিন চৈতন্যপ্রসঙ্গে কাটিল। তার পর শ্রীনিবাসের পিতা চৈতন্যদাস জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। শ্রীনিবাস যথারীতি শাস্ত্রীয় বিধানমতে পিতার পারলৌকিক ক্রিয়াদি সমাপ্ত করিলেন। মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে তিনি নানা প্রবোধ-বাক্যে আশ্বাস দিলেন। এই সময়ে অশুভের মধ্যেও একটী শুভ ঘটনার উৎপত্তি হইল। পিতার মৃত্যুর পর শ্রীনিবাস মাতাকে সঙ্গে লইয়া মাতুলালয়ে যাজিগ্রামে বলরামাচার্য্যের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মাতামহের প্রভূত সম্পত্তিও তিনি পাইলেন। কিন্তু পাইলে কি হয়? টাকা-কড়ি অর্থ বিত্ত সম্পদ উপভোগ ত তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য নহে। তিনি যে শৈশব হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অপূর্ব্ব ত্যাগময় জীবনের লীলা-কাহিনী শুনিয়া আপন মন হইতে কামনা বাসনা প্রভৃতি সমস্ত ভস্মীভূত করিয়াছেন। তাই মাতামহের অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াও তিনি প্রাণে শান্তি পাইলেন না। সোনার গৌরাঙ্গকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ সদাই অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল। একদিন, দুই দিন করিয়া কয়েক দিন গেল, অবশেষে গৌরাঙ্গ-দর্শন-লালসা তাঁহার মনে এত তীব্রতর হইয়া উঠিল যে, তিনি আর ঘরে থাকিতে পারিলেন না। অচিরাৎ পুরুষোত্তম-অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ভক্তপ্রবর নরহরি সরকার বা “সরকার ঠাকুর” তাঁহার সঙ্গে একজন লোক দিলেন, শ্রীনিবাস সেই লোক সঙ্গে করিয়া পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। কিন্তু

পথিমধ্যে গিয়া তিনি শুনিতে পাইলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গদেব আর নীলাচলে নাই, শত সহস্র ভক্তকে কাঁদাইয়া তিনি গদাধর-মন্দিরে অদৃশ্য হইয়াছেন।

বহুদিন পরে পতি-সন্দর্শনে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে যদি যুবতী স্ত্রী তাহার স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ পায়, তাহার মনের ভিতর তখন যে ভাবের উদয় হয়, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অদৃশ্য হইয়াছেন শুনিয়া শ্রীনিবাসের মনেও ঠিক সেই ভাবের শোক উপস্থিত হইল। তাঁহার পা আর অগ্রসর হয় না, আর তিনি চলিতে পারেন না, পথিমধ্যে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পাড়লেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে তিনি পুনরায় পুরুষোত্তমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে যে কেহ তাঁহার অশ্রু ও বিষাদপূর্ণ মুখ দেখিতে লাগিল, সেই তাঁহার জন্য বিলাপ করিতে লাগিল। কেহ বা বলিতে লাগিল, "না জানি এই সুকোমল যুবকের বুকে কে শেল হানিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে!" এইভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীনিবাস পুরুষোত্তমে গিয়া গদাধরের আশ্রমে উপনীত হইলেন। গদাধর গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদাবধি দুঃখে কালাতিপাত করিতেছেন। সমুদ্রের তীরে সুন্দর আশ্রম আজ গৌরাঙ্গ অভাবে যেন বিষাদের মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। গদাধরের মুখে ভাষা নাই—নয়নে দীপ্তি নাই—পদে চলচ্ছক্তি নাই। তিনি অহর্নিশ "গৌরাঙ্গ" "গৌরাঙ্গ" বলিয়া কাঁদিতেছেন। এমন সময় শ্রীনিবাস গিয়া "গৌরাঙ্গ" "গৌরাঙ্গ" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত হইলেন। গদাধর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আহা! কে আমায় এমন মধুর নাম শুনাইল রে!" এই বলিয়া গদাধর শ্রীনিবাসকে গাঢ় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিলেন। গদাধরের তাপিত দেহ সেই সুখশীতল স্পর্শে সুশীতল হইল। অতঃপর গদাধর একজন ভক্তকে সঙ্গে দিয়া বলিলেন, "এই ভক্তপ্রধানকে পুরুষোত্তমের যাবতীয় ভক্তবৃন্দের নিকট লইয়া যাও।"

শ্রীনিবাস তাঁহার সহিত পুরুষোত্তমের যাবতীয় দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করিলেন এবং সর্ব্বভৌমাচার্য্য, রায় রামানন্দ প্রভৃতি যাবতীয় ভক্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন। অতঃপর হরিদাসের সমাধিস্থলে উপস্থিত হইয়া শ্রীনিবাস সেই ভক্তপ্রবরের অহৈতুকী ভক্তিকথা শ্রবণ করিয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন।

হরিদাসের সমাধিক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর গদাধর শ্রীনিবাসকে বলিলেন, "দেখ তুমি রূপ-সনাতন-বিরচিত ভাগবতশাস্ত্র পাঠ করিয়া গৌড়ে গিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার কর।" গদাধরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীনিবাস গৌড়দেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এখানে আসিয়া প্রথমে শ্রীখণ্ডীতে নরহরি সরকার ঠাকুরের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে গদাধরের পত্রখানি দিয়া পুনরায় নীলাচলে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে শুনিলেন, ইত্যবসরে গদাধর ঠাকুরেরও তিরোভাব হইয়াছে। তখন তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি আর নীলাচলে না গিয়া পুনরায় গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং শ্রীখণ্ডে সরকার ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময় পথিমধ্যে শুনিতে পাইলেন যে, অদ্বৈতাচার্য্য ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুও দেহত্যাগ করিয়াছেন। একে গদাধর নাই, তারপর অদ্বৈত ও নিত্যানন্দও নাই, এ সংবাদ ভক্ত শ্রীনিবাসের প্রাণে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে মহাপ্রভুর লীলাক্ষেত্র নবদ্বীপ-দর্শনে যাত্রা করিলেন। নবদ্বীপ-দর্শনে তিনি ভাবিলেন, হায়! এই সেই ভাগ্যবতী নবদ্বীপ নগরী! এইখানেই আমার ত্রিতাপহরণ সোনার গৌরাঙ্গ লীলা পরিগ্রহ করিয়া হরিনামামৃত-দানে জগদ্বাসীকে উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। হায়! কেন আমি আর কিছুদিন পূর্ব্বে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিলাম না, তাহা হইলে ত স্বচক্ষে প্রভুর লীলা দর্শন করিয়া জীবনকে ধন্য ও কৃতার্থ করিতে পারিতাম!

আমি অতি অভাজন, তাই মহাপ্রভুর দয়া আমার উপর বর্ষিত হইল না!

নবদ্বীপে গিয়া শ্রীনিবাস প্রথমে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাদপদ্মে প্রণাম করেন। স্বামীর সন্ন্যাস-গ্রহণের পর হইতে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কঠোর সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়া কালাতিপাত করিতেছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী দাসীদিগের দ্বারা শ্রীনিবাসকে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীনিবাসকে শান্তিপুর ও খড়দহে যাইতে বলেন। শ্রীনিবাস মহাপ্রভুর বহির্ব্বাটীতে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া এবং মাতা বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বহস্তে প্রস্তুত প্রসাদ গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে গমন করেন। এখানেও সীতাদেবী তাঁহাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করেন এবং স্বহস্তে নানাবিধ ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া নিজে তৃপ্তিলাভ করেন। তথা হইতে শ্রীনিবাস শ্রীমন্নিত্যানন্দের লীলাভূমি খড়দহে গমন করেন। নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র তাঁহাকে অতি সমাদরে আহার করান। তথায় কিয়দ্দিবস অবস্থান করিয়া শ্রীনিবাস খানাকুল কৃষ্ণনগরে অভিরাম স্বামীর আশ্রমে গমন করেন। অভিরাম স্বামী ও তৎপত্নী মালিনী দেবী তাঁহাকে পরমাদরে গ্রহণ করিয়া কয়েক দিবস নানা ভোজ্যদানে তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করেন। অভিরাম স্বামী তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি শীঘ্র বৃন্দাবনে যাইয়া গোপাল ভট্টের নিকট দীক্ষা লইয়া গৌড়ে ফিরিয়া আসিবে এবং ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিবে।"

শ্রীনিবাস তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বৃন্দাবনে প্রস্থান করিলেন। বৃন্দাবনে যাইবার সময় তিনি মাতার অনুমতি লইয়া গেলেন। বৃন্দাবনের পথে তিনি প্রথমে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্মস্থান একচক্রা, তার পর গয়া, তৎপর প্রয়াগ ও অযোধ্যা হইয়া বৃন্দাবনে

উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে তিনি শুনিতে পাইলেন, রঘুনাথদাস ও রূপ গোস্বামীও পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীর আশ্রমে উপনীত হইলেন। জীব গোঁস্বামী তাঁহাকে ভক্ত-প্রবর গোপাল ভট্টের নিকট লইয়া গেলেন। গোপাল ভট্ট তাঁহার হস্তে একখানি লিপি দিয়া বলিলেন, "এই লিপি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত তোমার সম্বন্ধে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।" মহাপ্রভুর স্বহস্ত-লিখিত পত্রদর্শনে শ্রীনিবাস একেবারে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূতলে পতিত হইলেন। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইলে শ্রীনিবাসকে আপন আশ্রমে লইয়া গেলেন। পরদিন গোপাল ভট্টের নিকট শ্রীনিবাস দীক্ষা লইলেন।

অতঃপর শ্রীনিবাসকে জীব গোস্বামী স্বরচিত ও রূপ-সনাতন-রচিত নানা ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করাইতে লাগিলেন। শ্রীনিবাস যখন ভক্তিগ্রন্থে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন, তখন শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী তাঁহাকে বলিলেন, "এইবার তুমি গৌড়দেশে গিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার কর।" বৃন্দাবনের অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণও শ্রীজীবের এ প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। অতঃপর নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে সঙ্গে লইয়া গুরুচরণে প্রণাম করিয়া শ্রীনিবাস গৌড়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন। একটী সিন্দুকে পূরিয়া বহু মূল্যবান গ্রন্থসমূহ একখানি গো-শকটে চাপান হইল, দশজন সশস্ত্র প্রহরী সেই গো-শকটের সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। কিন্তু পথিমধ্যে একটা মহা দুর্ঘটনা ঘটিল। দুর্ঘটনাটি এই—সেই সময়ে বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরে বীর হাম্বির নামে এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। বীর হাম্বিরকে দস্যুদলের সর্দ্দার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিরীহ পথিকের সর্ব্বস্ব লুট করিতে বীর হাম্বিরের অনুচরেরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিত না, কাহারও ধনসম্পদ লইয়া বীর হাম্বিরের রাজ্য দিয়া নিরাপদে কোথাও যাইবার উপায় ছিল না।

পুস্তকের পেটরা বা সিন্দুক লইয়া যখন গো-শকট বাঁকুড়া জেলায় উপনীত হইল, তখন বীর হাম্বিরের অনুচরেরা সেই সিন্দুকে বহু ধনরত্ন আছে, এই আশা করিয়া তাহা বীর হাম্বিরের নিকট লইয়া গেল। শ্রীনিবাস এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া সেই দশজন প্রহরীকে বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট সেই সংবাদ দিবার জন্য পাঠাইলেন, আর শ্যামানন্দ ও নরোত্তমকে গৃহে ফিরিতে বলিয়া একাকী উদাসভাবে বাঁকুড়া জেলায় বনবিষ্ণুপুরের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি প্রহরীদিগকে ও নরোত্তমকে বলিলেন, "যদি পুস্তকগুলি অবিকৃতভাবে উদ্ধার না হয়, তাহা হইলে তিনি আর লোকালয়ে মুখ দেখাইবেন না। এই বনেই অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিবেন।"

এইভাবে ছিন্ন ও মলিন বসন পরিধান করিয়া শ্রীনিবাস বন বিষ্ণুপুরের বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ান। ক্ষুৎপিপাসায় তাঁহার দেহ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়াছে। তাঁহার শীতাতপ, কি আহার-নিদ্রা, কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই। কেবল কি উপায়ে দস্যুরাজের কবল হইতে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুস্তকগুলি উদ্ধার করিবেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র কামনা। কতকদিন এই ভাবে গেল। অবশেষে কৃষ্ণদাস নামে এক ব্রাহ্মণকুমারের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। কৃষ্ণদাস শ্রীনিবাসের দুঃখদুর্দ্দশার কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে রাজসভায় লইয়া গেলেন। রাজসভায় তখন একজন ব্রাহ্মণ কয়েকদিন হইতে ধারাবাহিকভাবে ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। শ্রীনিবাস মলিনবসনে দীনহীনের ন্যায় এক পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। ব্রাহ্মণ ভাগবতের শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছেন। কিন্তু ব্যাখ্যা করিলে কি হয়? ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যায় অসংখ্য ভুলভ্রান্তি। অন্যান্য শ্রোতারা উৎকর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণের

ব্যাখ্যা শুনিতেছেন, শ্রীনিবাস কিন্তু আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি উঠিয়া ব্রাহ্মণের ভুল-ভ্রান্তি দেখাইয়া ছিলেন। ব্রাহ্মণ ত চটিয়াই অস্থির। ব্রাহ্মণ একবারে রক্তচক্ষু হইয়া বলিলেন, "তুমি কে হে, এইভাবে আমার ন্যায় পণ্ডিতের ভুল ধরিতে সাহস কর? বামন হইয়া চাঁদে হাত!"

কৃষ্ণদাস তখন বলিলেন; "আচ্ছা ঠাকুর তুমি ইহার উপর অত চটিতেছ কেন? তোমার ব্যাখ্যা ত শুনিলাম, এইবার ইহার ব্যাখ্যা শুনিতে আপত্তি কি? আশা করি রাজা মহাশয় এই অতিথিকে ব্যাখ্যা করিতে আদেশ দিবেন।"

কৃষ্ণদাসের কথায় বীর হাম্বির শ্রীনিবাসকে ভাগবতের শ্লোক ব্যাখ্যা করিবার জন্য আদেশ দিলেন। তাঁহার আদেশে শ্রীনিবাস শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সে ব্যাখ্যা শুনিয়া রাজার চক্ষু দিয়া দর-বিগলিত ধারায় অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। ভাগবত-পাঠক ব্রাহ্মণ গল-লগ্নীকৃত-বাসে শ্রীনিবাসের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

অতঃপর রাজা বীরহাম্বির শ্রীনিবাসকে বনবিষ্ণুপুরে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীনিবাস তখন সজলনয়নে রাজসমীপে দস্যু কর্ত্তৃক তাঁহার গ্রন্থরাজির "পেটিকা-লুণ্ঠনের সমস্ত কথা বিবৃত করিলেন। রাজা বীরহাম্বির শ্রীনিবাসের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রকোষ্ঠের চাবি দিয়া বলিলেন, "পেটিকা যেরূপ অবস্থায় আনা হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপ অবস্থায় রহিয়াছে। আপনি উহা স্বচ্ছন্দে লইয়া যাইতে পারেন।" বহু দিনের পর প্রিয় সন্দর্শন হইলে প্রিয়ার যেরূপ আনন্দ হয়, লুণ্ঠিত গ্রন্থসমূহ পাইয়া শ্রীনিবাসেরও তদ্রূপ হইল। তিনি পুনঃ পুনঃ সেই গ্রন্থরাজির সম্মুখে প্রণাম করিতে লাগিলেন। আনন্দাশ্রু তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল।

রাজা বীর হাম্বির অতঃপর শ্রীনিবাসের সেবার জন্ম যথারীতি ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। রাজা শ্রীনিবাসের নিকট ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহার মুখে ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিতে করিতে ভক্তিধারায় অভিসিঞ্চিত হইতে লাগিলেন। অতঃপর সেই রাজ-দম্পতী শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

বনবিষ্ণুপুর হইতে শ্রীনিবাস যাজিগ্রামে প্রত্যাগমন করিয়া জননী লক্ষ্মীপ্রিয়ার চরণে প্রণিপাত করেন। বহুদিন পরে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া জননী লক্ষ্মীপ্রিয়ার প্রাণে যে বিপুল অনন্দের উদ্রেক হইয়াছিল, একথা বলাই বাহুল্য। অতঃপর তিনি যাজিগ্রামে একটী চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়া বসিলেন। বহু স্থান হইতে পাঠার্থীগণ যাজিগ্রামে আসিয়া তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। শ্যামানন্দ ও নরোত্তম আসিয়া এই সময় তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তিনি একদিকে ছাত্রগণের সহিত গভীর জ্ঞানের আলোচনায়, অন্যদিকে শ্যামানন্দ এবং নরোত্তমের সহিত সুমধুর কীর্ত্তনে দিনাতি পাত করিতে লাগিলেন। জ্ঞান ও ভক্তির সংমিশ্রণে তাঁহার বাটী সত্য সত্যই এক রমণীয় স্থান হইয়া উঠিল। অতঃপর কিছু দিন পরে জননী লক্ষ্মীপ্রিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। শ্রীনিবাস যথারীতি শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে মাতার পর-লৌকিক ক্রিয়াদি সম্পাদন করিয়া নরহরি সরকার বা "সরকার ঠাকুরে"র অনুরোধে পরিণয়-পাশে আবদ্ধ হইলেন। যখন তিনি দার পরিগ্রহ করেন, তাঁহার তাঁহার বয়স ৪৯ বৎসর। সুখে স্বচ্ছন্দে ধর্ম্মানুষ্ঠানের ভিতর দিয়া তাঁহাদের সংসার-যাত্রা চলিতে লাগিল। কিন্তু পরিণয়-পাশে আবদ্ধ হইলেও আবাল্য-পোষিত ভক্তিভাব তাঁহার মন হইতে রীভূত হইল না। কিছুদিন সংসারাশ্রমে থাকিবার পর তিনি বৃন্দাবন-

ধামে গমন করিলেন। তখন তাঁহার দীক্ষাগুরু গোপাল ভট্ট দেহত্যাগ করিয়াছেন ; কিন্তু ভক্তকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী জীবিত আছেন। তিনি শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীর নিকট কিছুকদিন অবস্থান করিয়া ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা করিতে লাগিলেন। এবার জীব গোস্বামী তাঁহাকে আরও কয়েকখানি ভক্তিগ্রন্থ উপহার দিলেন। অতঃপর পবিত্র বৃন্দাবনধামে কিছুকাল অবস্থান করিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য গৌড় দেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং যাজিগ্রামে উপস্থিত হইলেন। এবার আসিয়া তিনি ভক্তিশাস্ত্রের প্রচারে মনোনিবেশ করিলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে তিনি মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মকে গৌড়ে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিলেন। গৌড় সমাজেও বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে নেতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ রামচন্দ্র কবিরাজ তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

শ্রীনিবাস পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন বটে, কিন্তু সংসারে অনাসক্ত হইয়াই বাস করিতে লাগিলেন। বনবিষ্ণুপুরের রাজা তাঁহার বাটীতে আসিয়া সস্ত্রীক তাঁহার প্রসাদান্ন ভক্ষণ করিলেন এবং বন-বিষ্ণুপুরে শ্রীনিবাসের জন্য একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। শ্রীনিবাস তথায় থাকিয়া অনেক সময়ে রাজাকে ভাগবত পাঠ করিয়া শুনাইতেন।

অতঃপর বৃদ্ধ বয়সে শ্রীনিবাস পুনরায় বৃন্দাবনে গমন করেন এবং তথায় নরলীলা শেষ করেন।

নরোত্তম দাস

কল-কল-নাদিনী স্রোতস্বিনী পদ্মানদীর তীরে খেতরি গ্রাম। এই গ্রাম রামপুর বোয়ালিয়ার অন্তর্ভুক্ত। প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে এই খেতরি গ্রামে কৃষ্ণানন্দ দত্ত নামে এক কায়স্থ রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের উপাধি ছিল "মজুমদার"। রাজা কৃষ্ণানন্দের ঔরসে এবং পত্নী নারায়ণীর গর্ভে সাধু নরোত্তমের জন্ম হয়। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন, আর নরোত্তম জন্মিয়াছিলেন মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে। ইতিপূর্ব্বে রাজার আর কোন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই। সেই দুঃখে রাজ-পরিবারের সকলেই সাতিশয় ম্রিয়মান ছিলেন। কাজেই এই নবজাত কুমারের জন্মগ্রহণে রাজপুরীতে আর আনন্দের সীমা রহিল না। রাজা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইতে বৈষ্ণব ও ভিখারীদিগকে পর্য্যন্ত অকাতরে অন্ন, বস্ত্র ও গো দান করিলেন।

দেখিতে দেখিতে শুক্লপক্ষের শশধরের ন্যায় নরোত্তম মাতৃক্রোড় সুশোভিত করিয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ পুত্রের হাতেখড়ি দিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষকেব শিক্ষাধীন রাখিলেন। নরোত্তম অতি অল্পদিনের মধ্যে ব্যাকরণ, সাহিত্য প্রভৃতি নানাবিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তাঁহার প্রতিভা-দর্শনে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া রাজা কৃষ্ণানন্দ তাঁহাকে পরিণীত করিবার জন্য চারিদিকে ঘটক প্রেরণ করিতে লাগিলেন। যেখানে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, সর্ব্ব সুলক্ষণা-ক্রান্তা কন্যা পাওয়া যায়, সেখানেই যেন নরোত্তমের জন্য পাত্রী দেখা

হয়, রাজা কৃষ্ণানন্দের এইরূপ আদেশ ছিল। ঘটকেরা রাজাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিল। এদিকে নরোত্তম পিতার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার এই দুর্লভ মানবজন্ম কি কেবল তুচ্ছ বিষয়-সম্ভোগেই কাটিবে? যে হরিনামে প্রাণ সুশীতল হয়—বৈকুণ্ঠের দ্বার উন্মুক্ত হয়, একবার মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় কি সেই প্রাণারাম হরিনাম করিতে পারিব না? আর কি বৈষ্ণব সাধকদের মত গৌরাঙ্গপ্রেমে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া এই অকিঞ্চিৎকর মানবজীবনকে ধন্য ও কৃতার্থ করিতে পারিব না? ইত্যাকার অনেক কথা ভাবিতে ভাবিতে বিষয়ের প্রতি নরোত্তমের তীব্র ঘৃণা উপস্থিত হইল। কবে এই বিষয়-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তিনি দুবাহু তুলিয়া বৃন্দাবনে যাইতে পারিবেন, কেবল সেই সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। মানুষের মুখ তাহার মনের অভিব্যক্তি। কোন্ মানুষের ভিতর কি ভাবের খেলা খেলিতেছে, তাহা তাহার মুখের প্রতিচ্ছবি দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, মদ, মাৎসর্য্য এক একটি ভাবে লোকের মনের ভাব এক এক রকম হয়। নরোত্তম যে বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং বিবাহ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে রাজা কৃষ্ণানন্দের অধিক বিলম্ব হইল না। তিনি নরোত্তমের উপর কঠোর প্রহরা রাখিবার জন্য সুদক্ষ প্রহরীদিগকে নিযুক্ত করিলেন। নরোত্তম আজ রাজপুত্র হইয়াও নিজের ঘরে নিজে বন্দী হইলেন। কিন্তু লৌহ-কারাগারে রাখিয়া লোকের দৈহিক স্বাধীনতা হরণ করা যাইতে পারে, মনকে ত কখনও অধীন করা যায় না। নরোত্তমের মন-প্রাণ সমস্তই সেই নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে পড়িয়া রহিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে মহাপ্রভু লীলা সাঙ্গ করিয়া তিরোহিত

হইয়াছেন—হরিদাস, রূপ, সনাতন ও রঘুনাথ ইঁহারাও একে একে অন্তর্হিত হইয়াছেন। নরোত্তম যখনই ইঁহাদের কথা ভাবিতেন, তখনই তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইত, তিনি ইঁহাদিগকে যে স্বচক্ষে দেখিতে পায়েন নাই,এই দুঃখের জ্বালায় তিনি নিশিদিন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেন। অবশেষে তিনি যে কোন রূপে হউক বৃন্দাবনে পলাইয়া যাইবেন, সঙ্কল্প করিলেন। মানুষের মনে যদি তীব্রভাবে কোন সৎকার্য্যে সঙ্কল্পের উদ্রেক হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে এমন কোন্ শক্তি আছে যে তাহা, প্রতিহত করিতে পারে? কাজেই রাজা কৃষ্ণানন্দ যতই চেষ্টা করুন, নরোত্তমকে তিনি গৃহে রাখিতে পারিলেন না। নরোত্তম একদিন বৃন্দাবনে পলাইয়া গেলেন। নরোত্তম চলিয়া গেলে রাজা কৃষ্ণানন্দ পুত্রের বিরহে বহু বিলাপ করিলেন, মাতা নারায়ণীও "নরু" "নরু" বলিয়া ক্রন্দন করিলেন। তাঁহাদের ক্রন্দনে বনের পশুপক্ষী পর্য্যন্ত কাঁদিতে লাগিল। ষোল বৎসরের পুত্র নরোত্তম কি প্রকারে দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া অনাহারে, অনিদ্রায় থাকিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইবেন, এই চিন্তায় নরোত্তমের পিতা মাতা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। এদিকে দুর্গম পথ দিয়া যাইতে যাইতে নরোত্তমের পদতল ক্ষত বিক্ষত হইল। তিনি অতি কষ্টে বারাণসীধামে উপস্থিত হইলেন। এই বারাণসীধামে চন্দ্রশেখরের বাটীতে অবস্থান করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু —শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাম্ভিক বৈদান্তিক প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করেন এবং এইখানেই সনাতন আসিয়া তাঁহার নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন। নরোত্তম কিছুদিন কাশীধামে থাকিয়া প্রয়াগ ও তথা হইতে মথুরায় যান। মথুরায় গিয়া তাঁহার শরীর অনবরত পরিশ্রমে ও ভ্রমণে এতদূর ক্লান্ত হইয়া পড়ে যে, তিনি বৃন্দাবনে যাইবার শক্তি পর্য্যন্ত হারান। অবশেষে অনেক কষ্ট করিয়া, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া নরোত্তম

কোন রূপে বৃন্দাবনের ঘাটে গিয়া উপস্থিত হন। শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আপন কুঞ্জে লইয়া যান; তথায় কয়েক দিন অবস্থান করিয়া নরোত্তম সুস্থ হইলে জীব গোস্বামী তাঁহাকে লোকনাথ গোস্বামীর নিকট লইয়া যান।

লোকনাথ গোস্বামীর পরিচয় ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেওয়া গেল। লোকনাথ এক জনমানবশূন্য প্রান্তরে বসিয়া অহর্নিশ কৃষ্ণ আরাধনা করিতেছিলেন; তিনি একে একে শিষ্যদের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া এতই কাতর হইয়াছিলেন যে, তিনি স্থির করিয়াছিলেন, জীবনে আর কাহাকেও শিষ্য করিবেন না। কিন্তু শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী যখন নরোত্তমকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি আপন প্রতিজ্ঞার কথা সমস্তই বিস্মৃত হইলেন। নরোত্তমের সুন্দর, মনোহর আকৃতি ও অকপট ভক্তিভাব-দর্শনে মোহিত হইয়া তিনি নরোত্তমকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। নরোত্তমের পরিচয় শুনিয়া লোকনাথের চক্ষু দিয়া দর-বিগলিত ধারায় অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। নরোত্তম লোকনাথের আশ্রমে একবৎসরকাল অতিবাহিত করিয়া তাঁহার মলমূত্রাদি পরিষ্কার করা হইতে সেবাশুশ্রূষা পর্য্যন্ত করিতে লাগিলেন। নরোত্তমের এই প্রকার অকপট গুরুভক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া লোকনাথ এক বৎসর পরে নরোত্তমকে বৃন্দাবনে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নরোত্তম অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণই আমার বৃন্দাবন আগমনের উদ্দেশ্য।" লোকনাথ পূর্ব্বেই সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তিনি জীবনে আর কাহাকেও শিষ্যত্বে বরণ করিবেন না; তাই তিনি নরোত্তমকে আপনার বক্তব্য স্পষ্ট করিয়াই জানাইলেন। নরোত্তম সেকথা শুনিয়া কাঁদিতে কাদিতে তাঁহার পায়ে পড়িলেন। তাঁহার অপার ভক্তিভাব এবং গুরুর প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠাদর্শনে

লোকনাথ অভিভূত হইলেন, তাঁহার স্থির সঙ্কল্প আজ একজন ভিখারী-বেশী রাজপুত্রের দীনতার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। তিনি নরোত্তমকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"আচ্ছা তোমাকে যদি শিষ্যত্বে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে তুমি মদ্য, মাংস গ্রহণ না করিয়া নিরামিষ-ভোজীরূপে জীবন কাটাইতে পারিবে? তুমি কি দারপরিগ্রহ না করিয়া চিরকৌমার্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া জীবন কাটাইতে পারিবে?" নরোত্তম বলিলেন, "হাঁ, প্রভু, যদি আপনার দয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি এ সমস্ত আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিব।"

লোকনাথ অতঃপর তাঁহাকে দীক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শুভদিন শুভলগ্ন। লোকনাথ ঐ দিনেই নরোত্তমকে দীক্ষা দিবেন স্থির হইল। দেখিতে দেখিতে সে সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইল। দীক্ষার দিন বহু ভক্ত-সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি গৌরভক্তেরা দীক্ষাস্থানে উপস্থিত হইলেন। মহাসমারোহে দীক্ষাকার্য্য সমাপ্ত হইল। যে নরোত্তম রাজপুত্র হইয়া রাজপ্রাসাদে বাস করিয়া কত প্রকার ঐহিক সুখভোগ করিবেন, সেই নরোত্তম আজ পথের ভিখারী হইলেন, কৌপীন ও বাহির্বাস তাঁহার অঙ্গের ভূষণ হইল—তিনি ভক্তিপথের পথিক হইলেন।

দীক্ষাকার্য্য সমাপ্ত হইলে শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী নরোত্তমকে আপন আশ্রমে লইয়া আসিলেন শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীর নিকট নরোত্তম, শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দ এই তিনজনে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তার পর শ্রীজীবের আদেশে শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন গৌড়দেশে আগমন করেন, তখন তাঁহার সহিত নরোত্তম ও শ্যামানন্দও প্রেরিত হন। পথিমধ্যে বনবিষ্ণুপুরে দস্যু কর্ত্তৃক গ্রন্থের পেটিকা লুণ্ঠিত হইলে শ্রীনিবাস আচার্য্য নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে স্বগৃহে ফিরিতে আদেশ করেন।

সে কথা শ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রসঙ্গে বিস্তারিত ভাবে বলা হইয়াছে। নরোত্তম শ্রীনিবাসের আদেশে মনোক্ষুণ্ণ অবস্থায় খেতরি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় তিনি পৌঁছিবামাত্র রাজা কৃষ্ণানন্দের নিকট এই সংবাদ যায় যে, আপনার পুত্র ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই হারানিধিকে দর্শন করিবার মানসে রাজা কৃষ্ণানন্দ ও মহিষী ছুটিয়া আসিলেন। নরোত্তম পিতামাতাকে প্রণাম করিলেন। মাতাকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "আমি এখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, সন্ন্যাসীর পক্ষে সংসারাশ্রমে প্রবেশ করা নিষেধ। অতএব আমি সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিব না। প্রভুপাদ লোকনাথ গোস্বামী বৃন্দাবনে আমাকে দীক্ষা দান করিয়াছেন, আমি কামিনী-কাঞ্চন স্পর্শ করিব না বলিয়া তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়াতেই তিনি আমাকে মন্ত্রদান করিয়াছেন।"

রাজা কৃষ্ণানন্দ ও রাণী পুত্রের প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া আর কিছু বলিলেন না। পুত্রকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতেও তাঁহারা চেষ্টা করিলেন না। তবে মাতা পুত্রকে এইমাত্র অনুরোধ করিলেন "অতঃপর বাছা আমাদের রাজবাটীর সন্নিকটেই তুমি বাস কর, যাহাতে তোমার মুখারবিন্দ দেখিয়া এই দগ্ধপ্রাণ শীতল করিতে পারি।" মাতার এই অনুরোধ নরোত্তম লঙ্ঘন করিলেন না। রাজবাটীর সন্নিকটেই তাঁহার জন্য আশ্রম নির্ম্মিত হইল। নরোত্তম সেই আশ্রমে অবস্থান করিয়া পিতামাতার আনন্দ জন্মাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য বহুদূর হইতে দর্শকগণ খেতরি গ্রামে উপস্থিত হইতে লাগিল। নরোত্তম যখন বৈরাগ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন, তখন রাজা কৃষ্ণানন্দ গত্যন্তর না দেখিয়া নরোত্তমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুরুষোত্তমের পুত্র সন্তোষ দত্তকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। শ্যামানন্দ ঠাকুর নরোত্তমের সহিত খেতরি গ্রামে

পদ্মানদীর তীরে বাস করিতে লাগিলেন। দুই ভক্তে মিলিয়া নিশিদিন হরিনাম করিতেন, বড়ই আনন্দে তাঁহাদের দিনাতিপাত হইত। নরোত্তম পিতামাতার সন্তোষ-বিধানের জন্য প্রতিদিনই তাঁহাদিগকে একবার করিয়া দেখা দিয়া আসিতেন।

কিন্তু এদিকে হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। এতদিন যে শ্যামানন্দের সহিত তিনি অভিন্নাত্ম হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই শ্যামানন্দ উড়িষ্যায় যাইতে মানস করিলেন। বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে আসিবার সময় শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী শ্যামানন্দকে উড়িষ্যায় গিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। শ্যামানন্দ এতদিন নরোত্তমের সহিত নামকীর্ত্তনে ব্যস্ত ছিলেন, গোঁসাই প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে পারেন নাই। এতদিনে সেই কথা স্মরণ হওয়াতে তিনি আর কালবিলম্ব করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না। শ্যামানন্দের আসন্ন বিচ্ছেদ-শোক নরোত্তমের প্রাণকে অস্থির করিয়া তুলিলেও তিনি তিনি সানন্দে এ কার্য্যে অনুমতি দিলেন; কারণ শ্যামানন্দ যে মহাপ্রভুর লীলাকাহিনী প্রচারের জন্য যাইতেছেন। নরোত্তম ও যুবরাজ সন্তোষ দত্ত উভয়ে পদ্মাতীর দিয়া কিয়দ্দূর শ্যামানন্দের সঙ্গে গেলেন। শ্যামানন্দ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিতে পারেন, এজন্য তাঁহার সহিত দুইজন লোকও দিলেন। শ্যামানন্দ উৎকল যাইবার সময় পথিমধ্যে নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি তীর্থস্থানসমূহ দর্শন করিয়া গেলেন।

শ্যামানন্দকে হারাইয়া নরোত্তমের প্রাণ যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল। খেতরি গ্রাম আর তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইবার সঙ্কল্প করিলেন। মহাপ্রভু যে যে স্থানে লীলা করিয়া তাহা তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন, নরোত্তম সর্ব্বাগ্রে সেই সেই স্থানে গমন করিলেন। তাঁহার পিতামাতা এবার

আর তাঁহার এই সাধু উদ্দেশ্যের প্রতিবাদী হইলেন না। নরোত্তম প্রথমে নবদ্বীপধামে উপস্থিত হইলেন। এই নবদ্বীপে মহাপ্রভু শৈশব, বাল্য ও কৈশোরে কত লীলা করিয়াছেন, সে কথা স্মরণ করিতে নরোত্তমের দুই চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। নবদ্বীপে নরোত্তমের সহিত এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎকার হইল। পরিচয়ে জানিলেন, ইনি শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী। মহাপ্রভুর তিরোধানের বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার দেহে এখনও প্রাণ আছে সত্য, কিন্তু তিনি জীবন্মৃত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শুক্লাম্বর পূর্ব্বেই নরোত্তমের নাম শুনিয়াছিলেন ; এখন স্বচক্ষে তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে দুই বাহু দিয়া আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ে উভয়ের গলদেশ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তার পর শুক্লাম্বর নরোত্তমকে সঙ্গে লইয়া মহাপ্রভুর বাটী দেখাইতে গেলেন। "এইখানে মহাপ্রভু শচীমাতার গর্ভ হইতে প্রসূত হইয়াছিলেন, এইখানে মহাপ্রভু একদিন ছাইগাদার উপর গিয়া বসিয়াছিলেন"—শুক্লাম্বর যতই ইত্যাদি প্রকার কথা বলিতে লাগিলেন, ততই নরোত্তমের দুই চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

অতঃপর নবদ্বীপে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া নরোত্তম শান্তিপুরে গমন করিলেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সহধর্ম্মিণী জাহ্নবী দেবী এবং পুত্র বীরচন্দ্র অতি সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া নানাবিধ ভোজ্য-সম্ভারে তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। অতঃপর আরও নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে নরোত্তম নীলাচলে আসিলেন। নীলাচলে যদিও তখন মহাপ্রভু ছিলেন না—ঠাকুর হরিদাস ছিলেন না ; তথাপি ভক্ত গোপীনাথ ছিলেন, আর ছিলেন সেই কাশী মিশ্র যাঁহার বাটীতে থাকিয়া মহাপ্রভু অষ্টাদশবর্ষ কাল হরিনামে দেশকে প্লাবিত করিয়াছিলেন। কাশী মিশ্র ইতিপূর্ব্বেই নরোত্তমের নাম শুনিয়াছিলেন, তখন চাক্ষুষ তাঁহাকে পাইয়া

তাঁহার যে কত আনন্দ হইল, তাহা বর্ণনাতীত। কাশী মিশ্রের সহিত নরোত্তম শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বেদীর উপর সমাসীন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। অতঃপর কাশী মিশ্রের ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া নরোত্তম ঠাকুর মহাপ্রভু যেখানে কদলীপত্রে শয়ন করিতেন, সে স্থান দর্শন করিলেন। যে কন্থা তিনি গায়ে দিতেন, তাহাও দর্শন করিলেন। আর যে খড়ম তিনি পায়ে দিতেন তাহা দর্শন করিতেও ত্রুটি করিলেন না। অতঃপর সমুদ্র-তটে গঙ্গাধরের আশ্রমে যে গোপীনাথ-মন্দিরে বসিয়া মহাপ্রভু গদাধরের মুখে ভাগবতপাঠ শুনিতেন তাহা দর্শন করিলেন। অতঃপর শ্যামানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বহুদিন পরে অভিন্নহৃদয় নরোত্তমকে পাইয়া শ্যামানন্দের আনন্দ আর দেখে কে! শিশু যেমন মিষ্টান্ন পাইলে পৃথিবীর সকল কথা ভুলিয়া যায়, নরোত্তমকে পাইয়া শ্যামানন্দও তেমনি সকল কথা ভুলিয়া গেলেন। শ্যামানন্দ জাতিতে সদ্‌গোপ হইলেও নরোত্তম দেখিলেন, অনেক ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত তাঁহার ভক্তিভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

কিছুদিন পুরুষোত্তমে বাস করিয়া নরোত্তম গৌড়াভিমুখে ফিরিয়া আসিলেন। যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলে শ্রীনিবাস অধ্যাপনা ফেলিয়া রাখিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিলেন। সেই যে বনবিষ্ণুপুরে শ্যামানন্দ ও নরোত্তম তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, তদবধি এ পর্য্যন্ত আর উভয়ে সাক্ষাৎকার হয় নাই। তাই আজ বহুদিন পরে নরোত্তমের সাক্ষাৎকার পাইয়া শ্রীনিবাসের প্রেম-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। নরোত্তমও বহুদিনের পর শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎকার পাইয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। অতঃপর নরোত্তম তথা হইতে কাটোয়া, একচাকা প্রভৃতি বৈষ্ণবতীর্থ-দর্শনান্তর

স্বগ্রাম খেতরিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ ও রাণী আবার তাঁহাকে ফিরিয়া পাইয়া বিপুল আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

খেতরিতে প্রত্যাগমনের পর সাধু নরোত্তম স্বপ্নে দেখিলেন, যেন মহাপ্রভু তাঁহাকে খেতরিগ্রামে যুগল মূর্ত্তি স্থাপন করিতে বলিতেছেন। নরোত্তম সেই স্বপ্ন স্মরণ করিয়া খেতরিতে মহাপ্রভুর যুগলমূর্ত্তি স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প করিলেন। পিতা রাজা কৃষ্ণানন্দকে এই কথা বলিতেই তিনি আনন্দে তাহাতে রাজি হইলেন এবং অতি সমারোহসহকারে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে যেদিন মহাপ্রভু নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেইদিন খেতরিগ্রামে তাঁহার যুগল মূর্ত্তি স্থাপন করা হইল। এই মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে খেতরি গ্রামে যে প্রকার উৎসব হইয়াছিল, সেরূপ উৎসব আর কখনও হয় নাই—এই উৎসব উৎকল, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, খড়দহ প্রভৃতি নানাস্থান হইতে শত সহস্র ভক্ত আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। এমন কি আচার্য্য শ্রীনিবাস প্রভু পর্য্যন্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এই উৎসবে এমন প্রাণমন-মাতোয়ারা কীর্ত্তন হইয়াছিল যে, স্বয়ং রাজা কৃষ্ণানন্দ কীর্ত্তনে মাতিয়া ভূমিতে পড়িয়া লুটাইয়াছিলেন এবং ঘর হইতে বহুমূল্য জিনিষপত্র আনিয়া কীর্ত্তনের স্থানে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। কত স্থানের কত বড় বড় মোহান্ত আসিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ প্রত্যেক মোহন্তকে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করিলেন। পদ্মা-বক্ষ দিয়া শত শত সহস্র সহস্র নৌকা তাঁহাদিগকে লইয়া স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিল, রাজা কৃষ্ণানন্দ তাঁহাদের প্রত্যেকের ব্যয়ভার বহন করিলেন। এই মহোৎসবের জন্য দেশ-দেশান্তরে নরোত্তমের নাম বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বহুলোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। এমন কি, ব্রাহ্মণ বলরাম মিশ্র পর্য্যন্ত তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিলেন না।

শিবানন্দ নামক একজন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের দুই পুত্র হরিরাম ও রামকৃষ্ণ ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ হইয়া তাঁহারা রীতিমত শূদ্রের নিকট দীক্ষা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেন। ইহাতেই বুঝা যায়, ভক্ত নরোত্তম অকপট ভক্তিপ্রভাবে গৌড়ে তখন কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

বালুচরের নিকটবর্ত্তী গাম্ভিলা গ্রামের গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী তখনকার সময়ে গৌড়দেশে একজন প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। নরোত্তমের ভক্তিভাবের কথা শুনিয়া তিনিও নরোত্তমের নিকট গিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং কৃষ্ণকথায় নিশিদিন যাপন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা ইহাতে কুপিত হইয়া পক্কপল্লীবাসী রাজা নরসিংহের শরণাপন্ন হইলেন; কিন্তু রাজা নরসিংহ তাঁহার ভক্তিভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর সংবাদ আসিল যে, বৃন্দাবনে শ্রীনিবাস আচার্য্য দেহত্যাগ করিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া নরোত্তমের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং তিনিও অল্পদিন পরে দেহত্যাগ করিলেন।

আজিও প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে কৃষ্ণা পঞ্চমীতিথিতে খেতরিতে মেলা হইয়া থাকে।

গোপাল ভট্ট

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পুরুষোত্তম হইতে দাক্ষিণাত্যভ্রমণে যান ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপনীত হন। এই শ্রীরঙ্গক্ষেত্র কাবেরীনদীর তীরে অবস্থিত। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের নিকটে বলংগণ্ডী নামক গ্রামে তখন বেঙ্কট ভট্ট নামে একজন অতি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। মহাপ্রভু যখন শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে রঙ্গদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার নৃত্যগীতাদি করিতেছিলেন, তখন বেঙ্কট ভট্ট তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই নবীন মনোহর যুবাপুরুষের ভক্তিভাব-দর্শনে এতদূর প্রীত হইলেন যে, তিনি মহাপ্রভুর চরণ আর কিছুতেই ছাড়িলেন না। তিনি মহাপ্রভুকে আপন ভবনে লইয়া গেলেন। মহাপ্রভু তথায় চারিমাস কাল অবস্থান করিয়া হরিনাম কীর্ত্তনে দিনাতিপাত করেন। বেঙ্কট ভট্টের বাড়ী মহাপ্রভুর আগমনে অসংখ্য ভক্তের সমাগমক্ষেত্র হইয়া উঠে। মহাপ্রভু ভক্তদের লইয়া মধুর হরিনামে প্রমত্ত থাকেন। এই কীর্ত্তনের সময় বেঙ্কট ভট্টের পুত্রের বয়স ছিল ১২ বৎসর মাত্র। গোপাল ভট্ট মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-দর্শনে এতটা আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেন যে, সর্ব্বদা গোপাল মহাপ্রভুর নিকটে বসিয়া থাকিতেন, এক নিমিষের জন্য মহাপ্রভুকে চক্ষের অন্তরালে যাইতে দিতেন না। বেঙ্কট ভট্ট পুত্রের এবম্বিধ ধর্ম্মভাব-দর্শনে বিন্দুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। সাধারণতঃ পুত্রের ধর্ম্মভাব, বিষয়-বৈরাগ্য, নামানুরাগ দর্শন করিলে বৈষয়িক পিতামাতার মনে কষ্ট হয়, তাঁহারা পুত্রকে বৈরাগ্য ও ভক্তির পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু এ ক্ষেত্রে বেঙ্কট ভট্ট তাহার উলটা করিলেন। তিনি পুত্রকে ভগবন্নিষ্ঠ দেখিয়া বরং আরও নানা উপদেশ

দিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিবার জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। গোপালও অত্যন্ত আনন্দের সহিত মহাপ্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুও গোপালের অনাবিল ভক্তিভাব আরও বিকশিত করিবার জন্য তাঁহাকে নানা ভক্তিতত্ত্বের কথা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অবশেষে স্বয়ং মহাপ্রভু গোপালকে হরিনামে দীক্ষিত করিলেন।

একদিন মহাপ্রভু বেঙ্কটকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার পুত্র গোপালকে উত্তমরূপে শাস্ত্রাদি শিক্ষা দিবে।" বেঙ্কট ভট্ট মহাপ্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। গোপালকে মহাপ্রভু কেন শিক্ষা দিতে বলিলেন? তিনি বালক গোপালের ভক্তিভাব ও প্রতিভা-দর্শনে বুঝিয়াছিলেন, এই বালকের দ্বারা ভবিষ্যতে বৈষ্ণবশাস্ত্র ও বৈষ্ণব-সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

মহাপ্রভু বেঙ্কটের গৃহে চারি মাস অবস্থান করিয়া পুরুষোত্তমে ফিরিয়া আসিবার কালে গোপালকে বলিয়া আসিলেন, "তোমার পিতা-মাতা স্বর্গারোহণ করিলে তুমি বৃন্দাবনে যাইও এবং রূপ ও সনাতনের নিকট ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করিয়া সাধন-ভজন করিবে।" গোপাল নত-মস্তকে মহাপ্রভুর আজ্ঞা গ্রহণ করিলেন।

বেঙ্কট ভট্ট অতঃপর গোপালকে শিক্ষালাভার্থ চতুষ্পাঠীতে প্রেরণ করিলেন। গোপাল অতি অল্প দিনের মধ্যেই সাহিত্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। গোপালের পাণ্ডিত্যের কথা অল্পদিনেই সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। চারিদিক হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণেরা তাঁহার সহিত তর্ক-বিতর্ক করিতে আসিতেন, অকাট্য যুক্তিতর্কের বলে তিনি তাঁহাদের সকলকে ভক্তিপথের পথিক করিলেন। তাঁহার ভক্তিভাব ও কীর্ত্তনানুরাগদর্শনে যাহারা কখনও একদিনও হরিনাম করে নাই, তাহারা পর্য্যন্ত

হরিনাম করিত। কালক্রমে কালের আহ্বানে গোপালের পিতামাতা স্বর্গারোহণ করিলেন। গোপালও যথাবিহিত শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপন করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছিলেন, পিতামাতার মৃত্যুর পর যেন তিনি বৃন্দাবনে গিয়া সাধন-ভজন করেন, মহাপ্রভুর আদেশে তখন তিনি সম্মত হইয়াছিলেন, এখন সেই আদেশ পালনের জন্য তিনি বৃন্দাবনযাত্রা করিলেন। বৃন্দাবনে যাইলে রূপ, সনাতন প্রভৃতি তাঁহাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করেন। মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার আগমনবার্ত্তা পৌঁছিলে তিনি আপনার বসিবার আসন ও ডোর গোপালের জন্য প্রেরণ করেন। গোপাল সেই আসনে উপবেশন করিয়া এবং সেই ডোর মস্তকে দিয়া সর্ব্বদা ভগবৎ অর্চ্চনা করিতেন।

অতঃপর সনাতনের আদেশে গোপাল ভট্টজী "হরিভক্তিবিলাস" নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করেন এবং সুপ্রসিদ্ধ "কৃষ্ণকর্ণামৃত" গ্রন্থের টীকা প্রস্তুত করেন। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁহার শিষ্য ছিলেন। ভট্টজী যতদিন বৃন্দাবনে ছিলেন, শ্রীনিবাস আচার্য্য ততদিন প্রভুভক্ত ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ ভক্তমাল গ্রন্থে গোপাল ভট্টের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উক্তি আছে :—

"শ্রীমান্ গোপাল ভট্ট অদ্ভুত চরিত্র।
ভুবন মঙ্গল কথা পরম মহত্ত্ব॥
শ্রবণ মঙ্গল ভববন্ধ বিমোচন।
কৃষ্ণ প্রেমরসময় ভক্তির জনন॥
ভট্ট গোস্বামী মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র।
প্রীত হইয়া দিলা হরিনাম মহামন্ত্র॥

* * * *

বিষয় ছাড়িয়া বৃন্দাবনে আকর্ষিলা।
শ্রীরাধারমণরূপে বড় কৃপা কৈলা॥
নিজ শিষ্য শ্রীল ভক্তিদাস পূজারিরে।
সেবা সমর্পিয়া প্রভু গেল নিজ পুরে॥
তাঁহার সন্তান তাঁর দৌহিত্রসন্তান।
অদ্যাপি করেন সেবা শ্রীরাধারমণ॥
অদ্যাবধি সেই রাধারমণ বিরাজে।
বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন মাঝে॥
ননীর পুতুলী যেন দেখিতে কোমল।
সৎ-চিৎ-আনন্দময় অঙ্গ ঝলমল॥"

স্বর্গীয় দীন নাথ মণ্ডল ।

কলগুর মণ্ডল-বাটী

স্বর্গীয় দীননাথ মণ্ডল

[জন্ম ১২২৮ সাল, মৃত্যু ১৩১২ সাল।]

আমরা যাঁহার জীবন-কথা সাধারণের গোচর করিতেছি, তিনি সচ্চাষী সম্প্রদায়ের সামাজিক ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় দীননাথ মণ্ডল মহাশয় জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত কলগুর গ্রামে বিখ্যাত মণ্ডল বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

কলগুরের মণ্ডলেরা একটী বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও প্রাচীন পরিবার। আশ্রিত-প্রতিপালক, অতিথি-বৎসল ও পরোপকারী বলিয়া বহুকাল হইতে ইঁহাদের খ্যাতি আছে। ইঁহারা সচ্চাষী সম্প্রদায়ের অন্যতম সমাজ-পতি। সমস্ত সচ্চাষী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট পরিবারসমূহ ইঁহাদিগের সহিত বৈবাহিক-সূত্রে সংশ্লিষ্ট। স্বর্গীয় দীননাথ এই পরিবারে বাঙ্গালা ১২২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। লোকে কুল-পাবন পুত্রের কামনা করে। দীননাথ যে কেবল স্বীয় কুলই পবিত্র করিয়াছিলেন তাহা নহে, বস্তুতঃ তিনি এ প্রদেশটাই অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় বংশীধর মণ্ডল মহাশয় একজন সদাশয় ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ছিলেন। দীননাথ তদীয় পিতৃদেবের যাবতীয় সদ্গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন।

তিনি বাল্যকালে স্থানীয় বঙ্গবিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করেন। তৎকালে দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন ছিল না বলিলেই হয়। কাজেই দীননাথ দেশ-প্রচলিত বঙ্গভাষা বিশেষরূপে শিক্ষা করেন। কিন্তু তিনি অচিরে বুঝিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান কালে ইংরাজী ভাষা ও দেশ-কালোপযোগী

শিক্ষা লাভ না করিলে উন্নতি অসম্ভব। তাই তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছলেন, আধুনিক শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

স্বর্গীয় দীননাথের মত সামাজিক ও অমায়িক লোক আমরা খুব কমই দেখিয়াছি। এই অঞ্চলে যেখানে কোন বড় সামাজিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইত, তিনি সেইখানেই সসম্মানে আহূত হইতেন ও ঐ সমস্ত সামাজিক ক্রিয়া বিশেষ কৃতিত্বের সহিত তত্ত্বাবধান ও সম্পাদন করিতেন। ধান্যকুড়িয়ার প্রাতঃস্মরণীয় দানবীর স্বনামধন্য শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয় তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে যে দানসাগর যজ্ঞ করেন, এই দীননাথ মণ্ডল মহাশয়ই সেই বিপুল যজ্ঞের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয়ের এই বিপুল যজ্ঞ যে এরূপ দক্ষতার সহিত সুসম্পাদিত হইয়াছিল আমাদের এই ভাগ্যবান্ দীননাথের কার্য্যকুশলতাই তাহার অন্যতম কারণ! আজ শ্যামবাবুর মায়ের শ্রাদ্ধ এ অঞ্চলে গল্পের বিষয় হইয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্রে ও পুরাণে তাঁহার প্রচুর জ্ঞান ও অধিকার ছিল। উপাদেয় পৌরাণিক গল্পগাথার তিনি অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন। তিনি এমন মজলিশী লোক ছিলেন যে, যে কোন শ্রোতৃসঙ্ঘকে তিনি গল্পে ও আলাপে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন। আমরা তাঁহার এই অপূর্ব্ব ক্ষমতার পরিচয় বহুবার পাইয়াছি।

স্বর্গীয় দীননাথ ধর্ম্মজগতের একজন নিভৃত সাধক ও কর্ম্ম-জগতের একজন নীরব ও অনাড়ম্বর কর্ম্মী ছিলেন। কোন বাধা বা বিপত্তি তাঁহাকে কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত করিতে পারিত না। স্বর্গীয় দীননাথ মণ্ডল মহাশয় একজন পরম ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউ তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বস্তু ছিলেন। আজ কাঞ্চন-কৌলিন্যের যুগ। অর্থ, পদগৌরব ও বাহ্যিক চাকচিক্যই এখন মানুষকে প্রতিষ্ঠা-ভাজন করে। এই অর্থ, পদগৌরব ও

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডল।

বাহ্যিক চাক্‌চিক্য দীননাথের তদ্রূপ না থাকিলেও তাঁহার আর একটী সম্পদ ছিল যাহাকে পরম সম্পদ বা স্পর্শমণি বলা যাইতে পারে। তাঁহার হৃদয়ে তাঁহার কুলদেবতার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অচলা ভক্তি ছিল। শ্যামসুন্দরের প্রতি তাঁহার "মমতা" ছিল—এই স্বর্গীয় ভক্তি ও নিষ্ঠা বা মমতাকে আজকাল সম্পদ বলিয়া মনে করা হয় না। আজকাল হয়ত এটা একটা দৌর্ব্বল্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু ইহাই মানুষের পরম সম্পদ—জগতে ইহাই স্পর্শমণি। যাহা কিছু ইহার সংস্পর্শে আসে—সোণা হইয়া যায়। স্বর্গীয় দীননাথের এই স্বর্গীয় অলৌকিক সম্পদ বিশেষরূপে ছিল। সংসারের কার্য্য তিনি শ্যামসুন্দরের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। তিনি গীতার শ্লোক আওড়াইয়া "কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে" ইত্যাদি পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেন না। কিন্তু তাঁহার প্রতি কার্য্যে এমন একটা নির্লিপ্ততা ছিল, পরমেশ্বরের প্রতি এমন একটা নির্ভরতা প্রকাশ পাইত, যাহাতে তাঁহাকে সাংসারিক সামান্য লাভ-ক্ষতির ও মায়ামোহের বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত বলিয়া মনে হইত। সংসারে সমস্ত কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও তাঁহার নির্লিপ্ত ভাব ও নিশ্চিন্ততা, এই তাঁহার পরম সাধনা, ভগবানের প্রতি তাঁহার এই একান্ত বিশ্বাস ও সশ্রদ্ধ নির্ভরতা তাঁহাকে তাঁহার আরব্ধ কার্য্যে সাফল্য দান করিয়াছিল—তাঁহার হৃদয়ে শান্তি দিয়াছিল। আবার তাঁহার এই ভগবদ্ভক্তি, অনুরাগ ও নীরব সাধনাই তাঁহার পুত্রদিগকে কালোচিত কর্ম্ম সাধনে প্রেরণা ও সাফল্য দিয়া তাঁহাদিগের নাম জয়শ্রী-মণ্ডিত করিয়াছে। আজ যে তাঁহার পুত্রদিগের নাম যশঃসৌরভে পরিপূরিত ও কীর্ত্তিশ্রী-মণ্ডিত তাহা তাঁহারই ভগবদ্ভক্তি ও সাধনা-প্রসাদে।

কুলদেবতা ৺ শ্যামসুন্দরের সেবা তিনি কায়মনোবাক্যে করিতেন—তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় দেবতার সেবা যাহাতে সুনিয়মে চলে তদ্বিষয়ে

তাঁহার অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার কৃতী পুত্রগণ তাঁহাদের পিতার ঠাকুর ৺শ্যামসুন্দরের জন্য সুন্দর দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের স্বর্গীয় পিতার চরম কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। এখনও শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের "বারমাসে তেরপার্ব্বণ" বিশেষ জাঁকজমকের সহিত চলিয়া আসিতেছে।

দীননাথ সার্থক-নামা পুরুষ ছিলেন। তিনি কলগুরের আশ্রয়-তরু ছিলেন। যে কোন ব্যক্তি দুরবস্থায় পতিত হইয়া তাঁহার শরণ লইতেন তাঁহাকে তিনি সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। সাধারণের নিকট তাঁহার প্রভূত সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। স্থানীয় বিবাদ বিসংবাদের মীমাংসায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার শালিসীতে যে স্থানীয় কত জটিল মোকর্দ্দমা ও বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়া বহু পরিবার অনর্থক সর্ব্বনাশকর মোকদ্দমার হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি নিজের গ্রামকে আদর্শ গ্রাম করিবেন, ইহা তাঁহার একান্ত চেষ্টা ছিল। তিনি তাঁহার পুত্রগণকে সর্ব্বদা এই উপদেশ ও উৎসাহ দিতেন যে, যেখানে যাহা কিছু ভাল দেখিবে গ্রামে সেইরূপ করিতে চেষ্টা করিবে ও যাহা কিছু মন্দ দেখিবে বা বুঝিবে গ্রাম হইতে তাহা যে কোন উপায়ে দূর করিতে চেষ্টা করিবে। তিনি স্বীয় জীবনে, বাক্যে ও কর্ম্মে এই মূল নীতির অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার পুত্রেরাও পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন। জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার প্রভূত অনুরাগ ছিল—দেশে কোন জনহিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবার প্রস্তাব হইলে তিনি সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইতেন। নিজের ব্যবসায় প্রভৃতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করিয়াও তিনি সকলের মঙ্গলকার্য্য করিবার সময় করিয়া লইতেন।

দেশে তখন সুপেয় পানীয় জলের বিশেষ অভাব ছিল। এই অভাব

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ মণ্ডল।
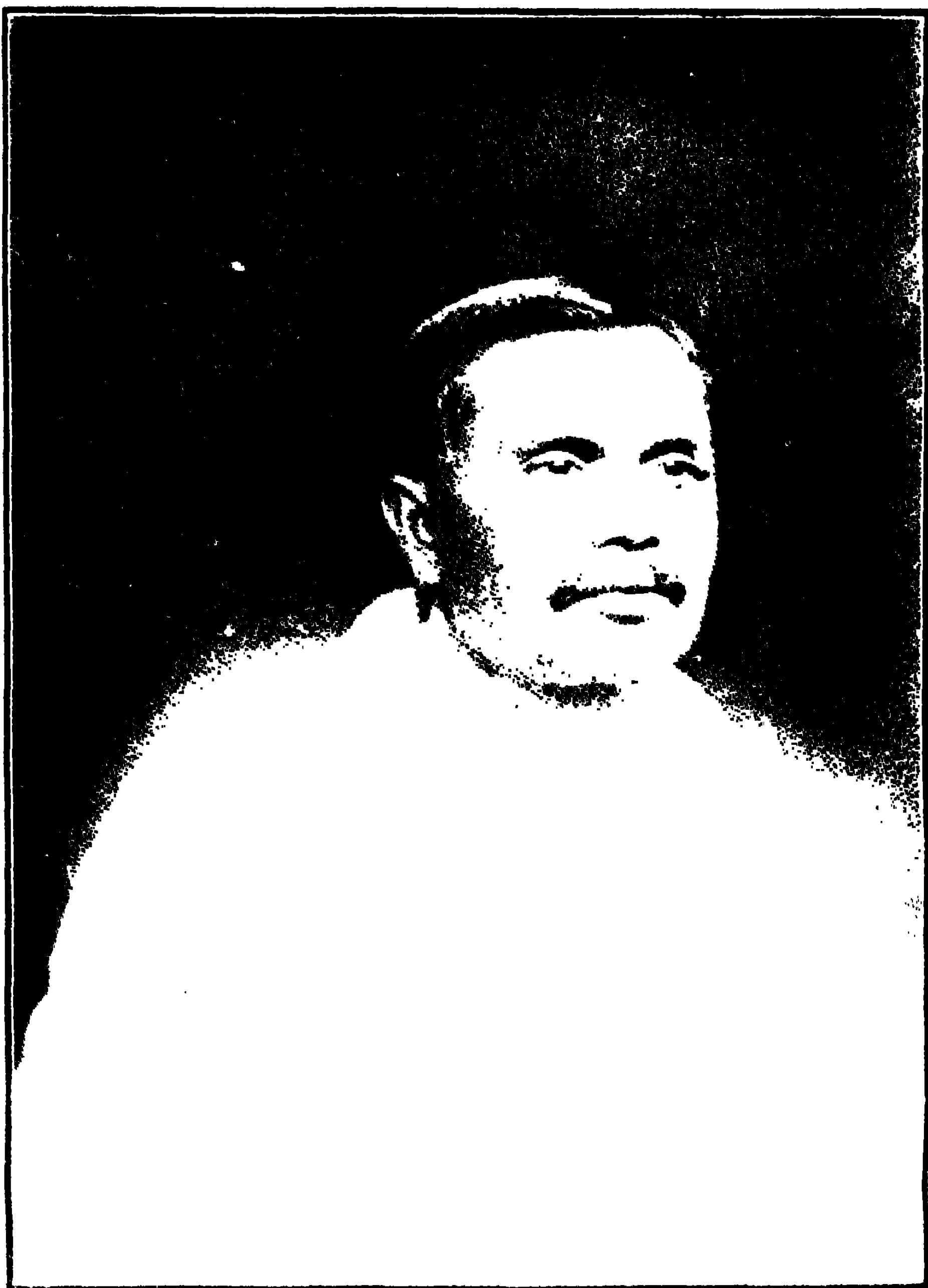
দূরীকরণ-মানসে তিনি প্রসিদ্ধ গৌড়বঙ্গ রাস্তার উভয় পার্শ্বে ও তাঁহার প্রজাদের গ্রামে বহু জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের দশের কল্যাণ-সাধন করিয়াছেন।

তাঁহার আতিথেয়তা ও কুটুম্ব-প্রীতি অতি প্রসিদ্ধ। অতিথি সেবা না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। দরিদ্র-নারায়ণের সেবা তাঁহার কাছে তাঁহার প্রাণের ঠাকুর শ্যামসুন্দরের সেবারই অনুরূপ ছিল। আত্মীয়গণকে বিপদে আপদে সাহায্য করিতে তিনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। কোন কুটুম্ব বা আত্মীয় তাঁহার বাটীতে গেলে তাঁহার সহজে ফিরিবার উপায় ছিল না, দুই চারিদিন তাঁহার আলয়ে সৎকার গ্রহণ করিয়া তবে তাঁহাকে ফিরিতে হইত। স্নেহের এই প্রকার অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য তাঁহার কুটুম্ব-সজ্জন তাঁহাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু এবিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি এত প্রখর ছিল যে, তাঁহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া সহজ ছিল না। তাঁহার আদর-আপ্যায়নে কুটুম্ব-সজ্জন প্রীত ও মুগ্ধ হইতেন।

যখন তাঁহার স্বগ্রামে ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পাইল, তখন হইতে তিনি কল্পনা করিলেন যে, দেশে একটী চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিবেন। তাঁহার সে আশা ও কল্পনা পূর্ণ করিয়াছেন তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডল মহাশয়। তিনি কৃতী পিতার উপযুক্ত ও আদর্শ সন্তান। তিনি তাঁহার পিতার বাসনা স্মরণ করিয়া স্বীয় গ্রামে জেলা বোর্ডের সাহায্যে দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের ও দশের কৃতজ্ঞতা ও আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। মহানন্দপুর-বাহুড়িয়া রাস্তাটী পূর্ব্বে অতি কদর্য্য ছিল। রাসবিহারী বাবুর উদ্যোগে ও চেষ্টায় ইহা এখন একটী অতি সুন্দর পাকা রাস্তায় পরিণত হইয়াছে। রাসবিহারী বাবুর উদ্যোগে দেশে আরও বহু জন-হিতকর প্রতিষ্ঠানের, বহু

সুন্দর সুন্দর রাস্তার, কূপ ও বাপীর সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। দেশের উন্নতিকল্পে তাঁহার প্রচেষ্টার ও আশার যেন অন্ত নাই।

রাসবিহারীবাবু পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া স্বীয় গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় ও গভীর নলকূপ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

দীননাথ ৫ পুত্র রাখিয়া ১৩১২ সালে স্বীয় সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে রাসবিহারী বাবু ও যতীন্দ্র বাবু বহু জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। এ বিষয়ে তাঁহাদিগের উদ্যোগ সমধিক প্রসিদ্ধ ও প্রশংসনীয়। রাসবিহারী বাবু বারাসত লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। এক্ষণে তিনি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য, দমদম মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান এবং বারাসতের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্। যতীন্দ্রবাবু একজন বিখ্যাত চিত্রকর।

স্বর্গীয় দীননাথ বাবু ও তাঁহার প্রীতিভাজন পুত্রগণের জনহিতার্থে ঐকান্তিক চেষ্টা, অনন্যসাধারণ ও অক্লান্ত অধ্যবসায় ও কৃতকার্য্যতা, পরোপকারিতা, আশ্রিত-বাৎসল্য ও আতিথেয়তা পিতাপুত্রের নাম এদেশে চিরস্মরণীয় ও চিরবরণীয় করিয়া রাখিবে।

কলশুর মণ্ডল-বংশাবলী
গদাধর
যদুনাথ
হরিহর
পঞ্চানন
১ ২ ৩
চৈতন্য রূপনারায়ণ নিতাই (ধান্যকুড়িয়া)
রাঘব
১ ২ ৩
বেচুরাম রাজারাম জয়রাম
১ ২ ৩
দয়ারাম নিমাই শচীরাম
১ ২ ৩ ৪
রামলোচন সিদ্ধিরাম রামসুন্দর রামমোহন
১ ২ ৩ ৪ ৫
কালাচাঁদ রামচাঁদ বংশীধর স্বরূপচন্দ্র বদনদাস
১ ২ ৩ ৪ ৫
যজ্ঞেশ্বর দীননাথ প্রতাপ সূর্য্যকুমার জয়কৃষ্ণ
বিশ্বনাথ বিহারী রাসবিহারী, যতীন্দ্র জ্ঞানেন্দ্র
চারুচন্দ্র, শিতিষ, নগেন দেবেন নরেন রবীন, রথিণ

পয়োদার জমিদার-বংশ

পয়োদার জমিদার-বংশ পাবনা জেলার মধ্যে অতীব প্রাচীন। ইঁহারা বারেন্দ্র কায়স্থ। পূর্ব্বে শৈব ছিলেন, পরে নিরামিষাশী বৈষ্ণব হইয়াছেন। ইঁহারা কাশ্যপ গোত্র, নন্দীবংশ। কান্যকুব্জ প্রদেশান্তর্গত রামায়ণ-বর্ণিত নন্দীগ্রাম-নিবাসী ৺চিত্রগুপ্ত-বংশীয় মহাত্মা ভৃগু নন্দী এই বংশের মূল পুরুষ। রাজা বল্লাল সেনের রাজত্বকালে ভৃগু নন্দী কর্ম্মোপলক্ষে বঙ্গদেশে আসিয়া উক্ত রাজার অন্যতম মন্ত্রী হয়েন। পরে কোন কারণে ঐ কার্য্য ত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ শৈলকুপা, পরে পাবনা জেলার বল্লা বা পোতাজিয়ায় বাস করেন। ইঁহার চতুর্থ পুত্র শঙ্কর নন্দী বেথুরিয়ায় বসতি করেন। তাঁহার বংশধর গঙ্গাভারে, পরে যুগীবাড়ী বাস করেন ও যুগীবাড়ী গণেশপুর, আয়না, ভায়না, মহেশপুর, থাদুলী প্রভৃতি ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করেন। এই বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান। বোধন বিল্ববৃক্ষটী চমৎকার। অন্যান্য বিল্ববৃক্ষের মত এ বৃক্ষের পাতা সব একসঙ্গে ঝরিয়া পড়িয়া "নাড়া" হয় না। মণ্ডপের আসন খুব জাগ্রত। ঐ আসনে বার্ষিক ৺কালীপূজা হইয়া থাকে। শঙ্করের একজন বংশধর সপরিবারে গঙ্গাবাস করিতে বীরভূম জেলার গোকুলপুরে বাড়ী করেন। কয়েক পুরুষ তথায় বাস করিবার পর পুনরায় পাবনা যুগীবাড়ী আসেন। গোকুলপুর হইতে কামদেব নন্দী ৮৮২ সালে বহুতীর্থ ভ্রমণ করেন। পরে ইঁহার বংশধর কেশব রায় যুগীবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া পয়োদা গ্রামে ভদ্রাসন করেন। এই সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, কাঠের কারবার এবং অন্য কার্য্যোপলক্ষে উত্তর হইতে দক্ষিণ অঞ্চলে নৌকাযোগে যাইবার সময় বিলের মধ্যে তাঁহার হুকার উপর হইতে কলিকাটি জলে পড়িয়া

যায়। সংস্কারবশতঃ ইহা বিশেষ দূষণীয় মনে করিয়া ঐ কলিকা উদ্ধারকল্পে বহু যত্ন করেন ; কিন্তু বিফল হওয়ায় অবশেষে শীতকালে জল কমিলে, উহা উদ্ধার-মানসে ঐ স্থানে একটী নৌকার নগি পুঁতিয়া রাখিয়া যান। দৈবক্রমে সেই বর্ষায় ঐ স্থানে বহু বালি জমিয়া চরা পড়ে এবং ক্রমে কয়েক বৎসরে উহা উচ্চভূমিতে পরিণত হয়। এই সময় উক্ত কেশব রায় মহাশয় কৃষ্ণনগর-মহারাজের প্রয়োজনে প্রেরিত হইয়া নাটোর-মহারাজ-দরবারে উপস্থিত হয়েন। রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া পুরস্কারস্বরূপ এই নগি-প্রোথিত স্থান সহ পরগণে নাজিরপুর ইত্যাদি ভূসম্পত্তি এবং তৎসহ দেবসেবাও লাভ করেন। পণ্ডিতগণের ব্যবস্থানুযায়ী ঐ স্থানে ভদ্রাসন ও ঐ নির্দ্দিষ্ট কলিকা-পতিত স্থানে সন ৯৯৮ সালে ৺গোপীনাথ জীউর বর্ত্তমান পঞ্চরত্ন শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করেন। ঐ সনের কার্ত্তিক মাসের ৺রাসপূর্ণিমায় শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ জীউকে শ্রীমন্দিরের রত্নবেদীর উপর সিংহাসনে স্থাপন করেন। ইনি বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কাঠের কারবার ও ভূসম্পত্তির আয় দ্বারা অধিক আড়ম্বরের সহিত দেবসেবাদি কার্য্য চালান। কুচবিহার কারবারের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। জল-পরিবেষ্টিত স্থানে বসতি স্থাপন করেন বলিয়া গ্রামের পয়োদা নামকরণ করেন। কেশব রায়ের পুত্র মহেশ রায় ও তৎপুত্র কৃষ্ণবল্লভ রায় উভয়েই পণ্ডিত ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। বায়ান্ন লাখ তেপান্ন হাজারী নাটোর-রাজের প্রদত্ত প্রায় ২ লক্ষ মুদ্রা আয়ের ভূসম্পত্তির মালিক হইয়া দেবসেবা, অতিথিসেবা, গোসেবা, তীর্থদর্শন এবং অন্যান্য সৎকার্য্যে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বংশপরম্পরায় "দানসাগর" করিবার নিয়ম করিয়াছিলেন। এই নিয়ম চন্দ্রমণি চৌধুরাণীর শ্রাদ্ধের পর হইতে আর প্রতিপালিত হয় নাই ; কিন্তু সেই দেবসেবাদি অদ্যাপি সাধ্যা-

নুসারে যৎকিঞ্চিৎ রক্ষিত হইতেছে। কৃষ্ণবল্লভের পুত্র গোপালবল্লভও কয়েকটী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কার্য্যগতিকে কুচবিহার যাতায়াত করিতেন। একদা কুচবিহার রাজদরবারে, দিল্লীর বাদসাহের দরবার হইতে সমাগত পারস্যভাষায় লিখিত একখানি পরোয়ানার অর্থোদ্ধার লইয়া অমাত্যবৃন্দের মধ্যে আলোচনা চলিতে থাকে। গোপালবল্লভ তৎকালে রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। সুপণ্ডিত বলিয়া তাঁহার খ্যাতি থাকায় রাজমন্ত্রীর আদেশে তিনি ঐ পরোয়ানার অর্থোদ্ধার করেন। ঐ অর্থ রাজার এবং মন্ত্রী প্রভৃতি সভাসদ্বর্গের মতে সমীচীন হওয়ায় রাজাজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে অমাত্যশ্রেণীভুক্ত করা হয় এবং পরে তাঁহাকে রংপুর জেলার কাজির হাট পরগণান্তর্গত সোণাখুলী ও জামিরবাড়ী নামক দুইটী মহাল এবং তৎসহ "জড় খরিদা দেবোত্তর খামার" আখ্যাযুক্ত বহু নিষ্কর ভূমি সন ১০১৩ সালে বা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্র-পশ্চাৎ কুচবিহাররাজ হইতে পুরস্কার দান করা হয়। এই প্রায় ২০ হাজার টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া তিনি রংপুরে চিনাপাড়া নামক স্থানে বাটী নির্ম্মাণ ও বিগ্রহ স্থাপন করেন। তিনি চিনাপাড়া ও পয়োদা উভয় স্থানেই বাস করেন।

গোপালবল্লভের পুত্র রামচন্দ্র পণ্ডিত, সমর-কুশল এবং সুবলিষ্ঠ ছিলেন। কুচবিহার রাজ্যের ইনি সেনাপতি ছিলেন। যুদ্ধকালীন ব্যবহৃত লৌহবর্ম্ম ইঁহার প্রপৌত্রের সময়ও পয়োদার তোষাখানায় ছিল। ইনি ভগিনীর বা কন্যার বিবাহে পয়োদা প্রভৃতির অন্তর্গত মৌজা চক তারাপাশা, চণ্ডীপাশা এবং কেদারপাড়া যৌতুক দেন। রামচন্দ্রের পুত্র শ্যামচন্দ্র কুচবিহারের দেওয়ান ছিলেন। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সেনাপতি এবাদৎ খাঁ রঙ্গপুর আক্রমণ করেন। তৎকালে ইনি কুচবিহার হইতে ফৌজ আনাইয়া, নিজ বাড়ী চিনাপাড়ায়

এবং অন্যান্য নানাস্থানে রাখিয়া মোগল সেনার সহিত বহুকাল ধরিয়া যুদ্ধ করেন। ২৪।২৫ বৎসর যুদ্ধের পর অবশেষে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে এই দেওয়ান শ্যামচাঁদের সহায়তায় রাজা শান্তনারায়ণ মোগলগণকে সন্ধি করিতে বাধ্য করেন। উক্ত রাজা স্বয়ংই এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্যামচাঁদ রায় মহাশয়ের বিষয় গ্লেজিয়ার সাহেবের রঙ্গপুর জেলার গেজেটিয়ারে উল্লিখিত আছে। ইনি স্বাধীন কুচবিহারের অধীন করদ মিত্র বা সামন্ত ভূস্বামী ছিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার দেওয়ানী ফৌজদারী মামলাদির বিচার ও শাসন সংরক্ষণ করিতেন। শুনা যায়, প্রতি বৎসরে ইঁহার দুইজনকে ফাঁসি দিবার ক্ষমতা ছিল। তদতিরিক্ত প্রাণদণ্ড করিতে হইলে কুচবিহারে এত্তালা দিয়া করিতে হইত। পরে ইংরাজ-রাজের সময়ে ইহার বংশধরগণ জমিদাররূপে পরিণত হয়েন। কিন্তু পূর্ব্বতন বিচারের নিয়ম যৎকিঞ্চিৎভাবে এ যাবৎও বর্ত্তমান ছিল। শ্যামচাঁদের মৃত্যুর পর ইহার পুত্রদ্বয়ের নাম জারির বাবদ উর্দ্দু ভাষায় লিখিত সনন্দ আছে। উহা সন ১১৭২ সালে লিখিত। এতদ্ব্যতীত তৎপূর্ব্বের বা পরবর্ত্তীকালের উর্দ্দু ভাষায় লিখিত বহু দলিল আছে। তবে বর্ত্তমানে ঐ সকল দলিল পাঠ করিবার লোকই এদেশে বিরল। বর্ত্তমান বংশধর বহুবার চেষ্টা করিয়া কয়েকটী মৌলভীর সহায়তা গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু ঐ সকলের মর্ম্মোদ্ধার হয় নাই। আরও বহু প্রাচীন দলিল, পাঞ্জা ও সনন্দাদি, এমন কি বংশের পুরুষানুক্রমে হস্তলিখিত ইতিহাসের খাতাখানিও সন ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পে তোষাখানা ভূমিসাৎ হওয়ায় নষ্ট হইয়াছে। এই জমিদারীর বর্ত্তমান মালিক বহু চেষ্টায় যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই মাত্র সম্বল।

বংশের মধ্যে দেওয়ান শ্যামচাঁদই কেবলমাত্র বিশেষ প্রকারে যৎস্বাশী ছিলেন। তাঁহার উর্দ্ধতন বা অধস্তন পুরুষগণ সকলেই নিরা-

মিষাশী। শ্যামচাঁদ আবার এতাদৃশ মৎস্যাশী ছিলেন যে, এক সন্ধ্যাও বিনা মৎস্যে অন্ন গ্রহণ করিতেন না। কোনও স্থানে যাইতে হইলে তাঁহার যান-বাহনের সঙ্গে সঙ্গে ভারে করিয়া মৎস্য যাইত। পরে আবার ঈশ্বর-ইচ্ছায় তিনি যাবজ্জীবন নিরামিষাশী হয়েন। ইঁহার মৎস্য-ত্যাগের বিষয় এইরূপ জানা যায় যে, ইঁহার কুটুম্ব বর্ত্তমান পয়োদা-নিবাসী সাধুখালীর দাস-বংশীয় শ্রীমান্ সুধীরকুমার মজুমদারের পূর্ব্ব পুরুষ নিজ বাটী পয়োদা মোকামে একদিন শ্যামচাঁদকে আহার করিবার নিমন্ত্রণ করেন। তিনি ঐ নিমন্ত্রণরক্ষার্থ কুটুম্ববাড়ী যাইয়া দেখেন যে, বসিবার ঘরের বারান্দায় সাঁড়কের সঙ্গে একটী পাঁঠা চামড়া-ছাড়ানো অবস্থায় টাঙ্গান রহিয়াছে। তাহার পার্শ্বে একটি শকুল মৎস্য ঠিক ঐরূপ ভাবে ছাল-ছাড়ানো অবস্থায় টাঙ্গান রহিয়াছে। শ্যামচাঁদ ইহার তাৎপর্য্য কুটুম্বকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তরে বলেন যে, "তুমি আগে বল কোনটা খাইবে"? শ্যামচাঁদের এই কুটুম্ব বংশানুক্রমে শাক্ত, সুতরাং শ্যামচাঁদ বৈষ্ণব হইয়াও ঘোর মৎস্যাশী, এজন্য রহস্য-মানসে এরূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্যামচাঁদ মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন, আমি বৈষ্ণব বলিয়া পাঁঠা বা অন্য মাংস বিশেষ ঘৃণা করি, অথচ মৎস্য বিনা এক সন্ধ্যাও চলে না। ইহা আমার বড় অন্যায়। আর দেখিতেছি যে, উভয় দ্রব্যই একরূপই রক্তবর্ণ। সুতরাং মৎস্য-মাংসে পার্থক্য কোথায়? অতএব আর মৎস্য খাইব না। এই বিবেচনা করিয়া বলিলেন যে, "এ দুইয়ের কোনটাই খাইব না।" তাঁহার এই কথাই মৎস্য-ত্যাগের কারণ হইল। সেদিন তাঁহার জন্য তাঁহার কুটুম্ব মৎস্যের নানা প্রকার ব্যঞ্জনাদি করিয়াছিলেন, সে সকল শ্যামচাঁদ স্পর্শও করিলেন না। পরে আজীবন মৎস্য গ্রহণ করেন নাই। পয়োদার বাড়ীর দীঘিতে মৎস্যের আস্ফালন দেখিয়া তাঁহার মনে লোভের সঞ্চার হয়। ইহা

বুঝিতে পারিয়া, তিনি সর্ব্বজনসমক্ষে এই দীঘির মাছ সম্বন্ধে দিব্য দিয়া গিয়াছেন যে, "যে হিন্দু এই দীঘির মাছ খাইবে সে গোমাংস খাইবে, মুসলমান খাইলে শূকর খাইবে।" অদ্যাপি সেই দিব্য অনুযায়ী কেহই এই দীঘির মৎস্য ভক্ষণ করেন না। যদি কখনও কোন বড় মৎস্য মরিয়া ভাসিয়া উঠে, তাহা তুলিয়া মাঠে বা জঙ্গলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। যদি কেহ বিশেষ লোভবশতঃ ধর্ম্মহানির ভয় পরিত্যাগ করিয়া কখনও ঐ মৎস্য গোপনে লইয়া গিয়া রন্ধন-ভোজন করে, তাহা হইলে মৎস্য আস্বাদহীন হয়। যাহারা এইভাবে ভক্ষণ করিয়াছে তাহারা সকলেই বলে "মৎস্য স্বাদশূন্য"। এরূপ ঘটনা কয়েকবার হইয়াছে। যদিও শ্যামচাঁদ মৎস্য ত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্রদ্বয়কে বলিয়া যান যে, "যদিও আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া মৎস্য ত্যাগ করিয়াছি বটে, কিন্তু মনের লোভ একেবারে যায় নাই। সুতরাং আবার যাহাতে মৎস্যভোজী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে না হয়, এজন্য আমার শ্রাদ্ধে এবং বার্ষিক একোদ্দিষ্টাদিতে যেন প্রচুর মৎস্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ-ভোজন করান হয়।" অদ্যাপি তাঁহার একোদ্দিষ্ট দিবসে ব্রাহ্মণকে মৎস্য ভোজন করান হয়। শ্যামচাঁদ শেষকালে ৺মঙ্গলচণ্ডী ঘটমূর্ত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার জন্য সন ১১৬৬ সালে বর্ত্তমান "বাঙ্গলা" শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করেন। সন ১১০১ সালে বর্দ্ধনকুটী রাজার আলিহাট পরগণা নিলাম হয়। তাজহাট এষ্টেট হইতে উহা খরিদ করা হয়। কিন্তু বর্দ্ধনকুটীর প্রতাপে দখল করিতে না পারিয়া, ১১১০ সালে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দেওয়ান শ্যামচাঁদের সহায়তা গ্রহণ করেন। শ্যামচাঁদ কুচবিহারের ফৌজ আনিয়া উহা দখল করিয়া দেন। এজন্য তাজহাট হইতে শ্যামচাঁদকে পরগণে আলীহাটের অর্দ্ধাংশ দেওয়া হয়। পূর্ব্বে এজমালি ছিল, পরে ইঁহার পৌত্র চৈতন্যবাবু সন ১২৫২ সালে ছাহাম করিয়া লইয়াছেন। শ্যামচাঁদ ও

ইঁহার পিতা রামচাঁদ এমন উচ্চকণ্ঠে লোককে ধমক দিতেন, যে লোক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িত। এজন্য "শ্যাম তাড়া" ও "রাম তাড়া" প্রবাদ-বাক্যের সৃষ্টি ' হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

শ্যামচাঁদ দুই পুত্র রাখিয়া ১১৭১ সালে পরলোক গমন করেন। ইঁহার মৃত্যুর পর ১১৮৪ সালে কোম্পানী বাহাদুর রঙ্গপুর জিলার ইজারা বন্দোবস্ত করেন। এযাবৎ রঙ্গপুরে কুচবিহারের মুদ্রার প্রচলন ছিল, এই সময় হইতে তাহা রহিত হয়। মুসলমানের আমলের পর কোম্পানীর আমলে বহু স্থানের প্রজা বিদ্রোহী হইয়া কোন কোন জমিদার-বাড়ী লুট করে, কিন্তু ইঁহাদের তখনও প্রবল প্রতাপ থাকায় কোনও অনিষ্ট হয় নাই বা কোম্পানীর ইজারার জন্যও অন্য কেহ ইঁহাদের সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিয়া লইতে সাহস করে নাই এবং দেবীসিংহের জুলুমও সর্ব্বথা বিফল হইয়াছে। শ্যামচাঁদ রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র গোকুলচাঁদ কুচবিহার রাজ্যের ম্যাজিষ্ট্রেট বা বিচারক ছিলেন। ইনি নাকি মাত্র ৩১ বা মতান্তরে ৫১ বৎসর বয়সে এক মাত্র নাবালক পুত্র রাখিয়া মারা যান। ইনি অতি সুপুরুষ ছিলেন,এজন্য ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার বৃদ্ধামাতা আর কার্ত্তিক দর্শন করিতেন না। গোকুলচাঁদ নাটোর-রাজসরকারে দণ্ড জন্য আহূত হয়েন; কিন্তু দণ্ডের পরিবর্ত্তে পুরস্কার লাভ করেন। গৌরাঙ্গচাঁদের কাহিনী মধ্যে তাহা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হইল। গোকুলচাঁদ কুচবিহার-রাজের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। রাজা ইঁহার প্রতিকুলে কোন কথাই শুনিতেন না। বৃদ্ধা রাজমাতাও তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। এজন্য অন্যান্য অমাত্যবর্গের বিশেষ ঈর্ষ্যা হয় এবং সেই ঈর্ষ্যা পরে আক্রোশে পরিণত হয়। ফলে ষড়যন্ত্রমূলে ভৃত্যের সাহায্যে দুগ্ধের মধ্যে বিষপ্রয়োগে ইঁহার মৃত্যু হইলে, ইঁহার মস্তক ছেদনপূর্ব্বক রাজার শয়নমন্দিরে

খাটের নীচে রাখা হয়। এই ভৃত্যের দৌহিত্র-পুত্র বর্ত্তমান রহিমপুর-নিবাসী রজনী দাস। রাজা গোকুলচাঁদের মৃত্যুতে বিশেষ শোক পান এবং ইঁহার নাবালক পুত্রের জন্য কতকগুলি সোনার পাটা পাঠাইয়া দেন। গোকুলচাঁদের এইরূপ মৃত্যুই বিধিলিপি, কিন্তু এই শির একবার নাটোর-রাজসভা হইতে রাজাকে বাঁচাইয়া আনিয়াছিল। তৎকালে সম্ভবতঃ শনির কোপে বৃহস্পতির কৃপাদৃষ্টি ছিল। বিস্তৃত বিবরণ পরে লেখা হইল। গোকুলচাঁদের মুখ দেখিয়া নাটোর-মহারাজ্ঞীর প্রাণে পুত্রস্নেহের সঞ্চারই তাঁহার প্রাণরক্ষার অন্যতম কারণ।

শ্যামচাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র গৌরাঙ্গচাঁদ নিষ্ঠাবান, ধার্ম্মিক, দীর্ঘকলেবর এবং অত্যন্ত বলবান ছিলেন। পিতা ও পিতামহের ন্যায় ইঁহারও গলার আওয়াজ ক্রোধের সময় বহুদূর হইতে শুনা যাইত। তিনি যেমন ধার্ম্মিক তেমনি আবার দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপও ছিলেন। এমন ধার্ম্মিক ছিলেন যে, তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার নামে মানস চলিত এবং এখনও চলে। বিশেষতঃ গাছে যদি ফল না ধরে, তবে "বুড়াকর্ত্তা" গৌরাঙ্গচাঁদের নামে মানস করিলে গাছে ফল অদ্যাপি ধরে। শুনা যায় যে, একটি বন্ধ্যা নারী মানস করায় পুত্রলাভ করিয়াছিল। পরে সে ঐ পুত্র লইয়া গিয়া "বুড়াকর্ত্তা"র দাস্যকার্য্যে তাহাকে নিয়োগ করিয়াছিল। কথিত আছে, ইনি এতদূর বলশালী ছিলেন যে, বৃদ্ধ বয়সেও বড় কাগজী লেবু হাতের তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলীর মধ্যে রাখিয়া কাঁচি দিয়া কাটিলে যেমন হয় তদ্রূপ ভাবে দ্বিখণ্ডিত করিতেন এবং নিজ তর্জ্জনী অঙ্গুলী কলাগাছের মধ্যে খোঁচা দিয়া প্রবেশ করাইয়া দিতেন। হিন্দুস্থানী বলবান ব্যক্তিগণ দ্বারবানের উমেদার হইয়া উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে গৌরাঙ্গচাঁদ নিজ অঙ্গুলী বক্র করিয়া তাহা সোজা করিতে দিতেন। যে পারিত তাহাকে চাকরীতে বাহাল করিতেন। তিনি একাহারী

ছিলেন। ৺গোপীনাথের পায়স অন্নপ্রসাদ (৴১।৹ বা ৴১॥৹ চাউলের, পাকি ওজনের এক পোয়া ঘৃত এবং তৎসঙ্গে এক কড়াই দুধ ১৮ আঠার সের ক্ষীর করিয়া সেই প্রসাদ পাইতেন। কোনও কারণে অন্য খাদ্য গ্রহণ না করিয়া ৭ দিন বা ১৫ দিন কেবলমাত্র ঘৃত ও চিনি খাইতেন এবং তাহাতে স্বাস্থ্যের কোনও বিকৃতি ঘটিত না। ইঁহার একমাত্র কন্যার বিবাহে জামাতাকে পয়োদা দিগরের অন্তর্গত ছিট্ খাড়ুলীদিগর ভূসম্পত্তি যৌতুক দেন। তাঁহার বংশধর পয়োদা-নিবাসী বীরেশ মজুমদার অদ্যাপি ঐ সম্পত্তি পত্তনী দিয়া ভোগ করিতেছেন। গৌরাঙ্গচাঁদের প্রৌঢাবস্থায় ঐ যুবতী কন্যা এবং কিশোরবয়স্ক পুত্রদ্বয় ও তাহার অত্যল্প-কাল মধ্যেই দ্বিতীয়া সহধর্ম্মিণী পরলোক গমন করায় ইনি নিঃসন্তান) হয়েন। ক্রমে সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া, বিষয়-কর্ম্মের ভার দেওয়ানের প্রতি অর্পণ করিয়া, সৎসঙ্গে ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন। জীবনের অবশিষ্ট কাল এইরূপ অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি নামমাত্র বিষয় দেখিতেন। সুতরাং উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে নাজিরপুর পরগণা পথ-করের দায়ে নিলাম হইয়া যায়। এই সম্পত্তি যথারীতি পুনরুদ্ধারের জন্য লোকে অনুরোধ করিলে "লাঠিসে লে লেঙ্গে" বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলেন এবং ডাক ফাজিলের সমুদয় টাকা মাতৃদেবীর দানসাগরশ্রাদ্ধে ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। তিনি দানে চিরদিনই মুক্তহস্ত। বিশেষতঃ বৃদ্ধ বয়সে বিশেষ প্রকারে মুক্তহস্ত হয়েন। তিনি মাথায় তৈল মাখিতেন না; লম্বা চুলের মধ্যে উকুন পরিপূর্ণ থাকিত। যদি হঠাৎ একটি উকুন মাটিতে পড়িত তাহা আবার তৎক্ষণাৎ তুলিয়া মাথায় রাখিতেন। জীবে দয়া, নামে রুচি এবং সাধু সেবা তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ ছিল। জীবিত মৎস্য দেখিলেই জলে ছাড়িয়া দিতেন। ন্যায় আইন-মোতাবেক সম্পত্তি উদ্ধারে তিনি উদাসীন থাকিলেন বটে, কিন্তু ইংরাজের

আমল পড়ায় আর লাঠির জোরে ঐ বিষয় উদ্ধার করিতে পারেন নাই। গৌরাঙ্গচাঁদ একদা নৌকাযোগে রংপুর যাইবার পথে ৺রাজরাজেশ্বর শালগ্রাম বিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন। পরে নাটোর-রাজ হইতে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া এই বিগ্রহের নামে দেবোত্তর করেন। তার পর নাজিরপুর পরগণার সঙ্গে সঙ্গে এই বামন গাঁ ও গয়রহ দেবোত্তরও বেদখল হয়। প্রবাদ আছে যে, নৌকাযোগে রঙ্গপুর যাইবার কালে নিজ চাকরের ত্রুটিতে বাঁটনা বাটিবার নোড়াটী নদীর জলে পড়িয়া যায়। এজন্য নিকটস্থ নালিয়াপাড়া গিয়া জনৈক নালিয়ার নিকট একটী নোড়া চান। কিন্তু উহারা মৎস্যাশী বলিয়া উহাদের ব্যবহৃত নোড়া না লইয়া উহাদের নল ছেঁচিবার পাথরের শিলটী চাহিয়া আনেন। তার পর কার্য্যান্তে উহা না ধুয়াই রাখিয়া দেন। এদিকে গৌরাঙ্গচাঁদ মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইয়া নিদ্রা যাইতে যাইতে এরূপ স্বপ্নাদেশ পান :—"ন'লে বাড়ী ছিলাম ভাল। আমার দ্বারা বেশ ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় নল ছেঁচিত। নলের রসে আমার শরীর বেশ শীতল থাকিত আর নল ছেঁচিবার কালে রাম রাম শব্দ করিয়া আমার নাম করিত। তাহাতেও আনন্দ পাইতাম। কিন্তু তোর চাকর আমাকে আনিয়া লঙ্কা বাঁটিয়া না ধুইয়াই রাখিয়া দিয়াছে। আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইলাম। উঠিয়া আমাকে দেখ্, আর ঐ গোয়ালা বাড়ীর কাঁচা দুধ আনিয়া আমাকে স্নান করাইয়া জ্বালা নিবারণ কর্।" গৌরাঙ্গচাঁদ এই স্বপ্নাদেশে জাগরিত হইয়া চাকরকে ডাকিয়া নোড়া চাহিয়া লইয়া দেখেন যে, শালগ্রাম। তখনই সাত কলসী কাঁচা দুধ দ্বারা স্নান করাইলেন এবং স্বপ্নাদিষ্টমত সব ব্যবস্থা করিলেন। ঐ নালিয়াকে ডাকিয়া সব জানাইলেন। তাহার নল-ছেঁচা পাথর শালগ্রাম জানিয়া সে উহা লইতে রাজী হইল না, গৌরাঙ্গচাঁদকে দান করিল। তিনিও পরমার্থ পাইয়া সামান্য অর্থের আশা ত্যাগ

করিলেন ও রঙ্গপুর না যাইয়া মহানন্দে শালগ্রামসহ বাড়ী ফিরিলেন। তদবধি ৺রাজরাজেশ্বর ৺গোপীনাথের সিংহাসনে বিরাজ মানা বিগ্রহের পূর্ণ লক্ষণও ইঁহাতে আছে। সুতরাং শাস্ত্রানুযায়ী "গৃহীনাঞ্চ সুখপ্রদম্" এবং "সদ্য বৈরাগ্যদো নৃণাম্" এই উভয় প্রকার ফলই ইনি দিতেছেন। ইঁহার সেবাইতগণের মধ্যেও এই উভয় প্রকার ফলই প্রতিফলিত দেখা যায়। এ বংশের স্ত্রীপুরুষ সকলেই সংসার-সুখভোগ করেন অথচ মনে মনে বৈরাগ্যভাব স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। ৺রাজ-রাজেশ্বর বড়ই জাগ্রত ঠাকুর। বহু লোককে বহু স্বপ্নাদেশ করেন। ব্রহ্মচারী হইয়া ইঁহার সেবা করিতে হয়। সেবকের অপরাধানুযায়ী সময় সময় দণ্ডেরও ব্যবস্থা করেন। অনাবৃষ্টি সময়ে ইঁহাকে স্নানজলে ডুবাইয়া রাখিলে সুবৃষ্টি হয়। যে সম্পত্তি ইঁহাকে দেবোত্তর করিয়া দেওয়া হয় তৎসম্বন্ধেও প্রবাদ আছে যে, একদা গৌরাঙ্গচাঁদ পয়োদার দূরবর্ত্তী ইচ্ছামতী নদীতে রাখিয়া খালীরঘাটে স্নান করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেছিলেন। ইঁহার স্নান-আহ্নিকেরও বিশেষত্ব ছিল। একটা বড় দাঁতওয়ালা হাতীকে গলাজলে নামাইয়া তাহার দন্ত-যুগলের উপর জলচৌকী রাখিয়া তদুপরি বসিয়া দুই হাতে দুইটী বড় কলসী লইয়া, সেই কলসী ভরিয়া জল তুলিয়া, মাথায় পর্য্যায়ক্রমে অনবরত ঢালিতেন। আবার এই "কমলে কামিনী"-স্নান-অন্তে ঐ ভাবেই ভিজা কাপড়ে বসিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিক পূর্ব্বক স্তবপাঠ করিতে করিতে ঐ ভাবেই বাড়ী ফিরিতেন। এইরূপে একদিন সন্ধ্যা-আহ্নিক করিবার সময় একখানি নৌকা নদীর স্রোতের বেগে আসিয়া তাঁহার গায়ে লাগে। ঐ ধাক্কায় তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হওয়ায় ক্রোধবশতঃ নৌকাখানি টানিয়া তিনি ডাঙ্গায় তুলিয়া ফেলেন। পরে জানা গেল যে, নাটোর-রাজের কোনও বড় কর্ম্মচারী কোনও রাজকুটুম্বসহকারে ঐ নৌকায় যাইতেছিলেন।

এই কথা নাটোর-রাজের গোচর হওয়ায় রাজকোপের কারণ হয়। এ প্রদেশ নাটোর-রাজ্যভুক্ত থাকায় রাজাজ্ঞায় গোকুলচাঁদ কনিষ্ঠের দোষ মার্জ্জনার জন্য নাটোর রাজদরবারে হাজির হয়েন এবং অনাবৃত মস্তকে রাজসভায় দণ্ডায়মান থাকেন। ইঁহার প্রতি আরও একটি গুরুতর অপরাধ আরোপিত ছিল যে,একদা কোনও কারণে নাটোর-রাজ কুচবিহার রাজদরবারে নীত হয়েন। গোকুলচাঁদ নাকি তখন নাটোর-মহারাজকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করেন নাই। আবার এখন এই অনাবৃত মস্তকে রাজসভায় হওয়া হইল তৃতীয় অপরাধ। এজন্য প্রথমে রাজমন্ত্রী "এই নূতন অপরাধের কারণ ও এই অপরাধের কি দণ্ড তাহা জানেন কি না"—এরূপ প্রশ্ন গোকুলচাঁদকে করেন। গোকুলচাঁদ উত্তর করেন, "আমি জানি যে রাজদরবারে উষ্ণীষ ব্যবহার না করিলে শিরচ্ছেদ হয়। কিন্তু যেদিন আমি কুচবিহার রাজ্যের প্রতিনিধিস্বরূপ নিজ এজলাসে আমার ভূস্বামী নাটোর-মহারাজকে পাইয়াও গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সম্মান প্রদর্শন করি নাই, জানি সেইদিন হইতেই আমার মাথা নাই। অতএব উষ্ণীষ বাঁধিব কোথায়? আর সেদিন নিজ মনিব ও ভূস্বামী কুচবিহার-রাজ্যের সম্মান রক্ষা এবং নিজ ক্ষমতানুযায়ী নিজ ভূস্বামী নাটোর-রাজের প্রাণ ও সম্মানরক্ষা সঙ্গত বিবেচনায় নিজের প্রাণদণ্ড স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বরণ করিয়াছি। তৃতীয় অপরাধ যাহা আমার কনিষ্ঠের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে, সেইজন্যও আমি নিজে দণ্ডগ্রহণার্থ হাজির হইয়াছি। সে এখন যুবক, তাহার বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই। পুরাকালে ধ্যান ভঙ্গ করিলে মুনি-ঋষিগণ ধ্যানভঙ্গকারীকে ভস্ম করিতেন, শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। সে স্থলে আমার কনিষ্ঠ গুরুপাপে অত্যন্ত লঘু দণ্ড, এমন কি যাহা দণ্ড নয় বলিলেই চলে, মাত্র তাহাই করিয়াছে। নিজ দেহে ধ্যানাবস্থায় বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় এক ধাক্কা দিয়া

নৌকাখানি মাত্র ডাঙ্গায় তুলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে। ইহাতে কোনই অন্যায় করে নাই। আর নাটোর-মহারাজেরও বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, তাঁহার একটি প্রজা এরূপ বলশালী যে, প্রকাণ্ড নৌকা একাই তীরে টানিয়া তুলিয়াছে এবং তাহার নিকট নাটোর-রাজের নৌকাস্থ সিপাহীগণও পরাজিত হইয়াছে। এমন প্রজা কোনও দিন মহারাজের বহু কার্য্য সাধন করিবে। সুতরাং আমার প্রতি দণ্ডবিধান হউক এবং আমার কনিষ্ঠ যাহাতে দুধ খাইয়া আরও বলবান হইতে পারে তজ্জন্য রাজাদেশ প্রচার হউক। অতঃপর রাজাদেশে বামনগাঁ ও গয়রহ গৌরাঙ্গ চাঁদকে দুধ খাইবার জন্য বকসিস্ দেওয়া হয়। আর গৌরাঙ্গচাঁদও এই সম্পত্তি ৺রাজরাজেশ্বরের দেবোত্তর করেন। এই বিগ্রহ তাঁহাকে বহু স্বপ্ন দিতেন ও যখন যিনি সেবাইত হয়েন তাঁহাকেই স্বপ্নাদেশ করিয়া থাকেন। গৌরাঙ্গচাঁদ বাদিয়াখালীতে একটী এবং পয়োদার সদর স্থানে একটি হাট ও গোলাগঞ্জ স্থাপন করেন। পয়োদার এইস্থানে খরের জমি ছিল তাহার উপস্বত্ব দ্বারা হনুমানজীর সেবা-পূজা হইত। ইনি ঐ স্থানে হাট স্থাপন করিলেন এবং সেবা-পূজার ব্যয় এষ্টেট হইতে চালাইলেন। এই স্থানের সংলগ্ন ত্রিপথপার্শ্বে গৌরাঙ্গচাঁদের পূর্ব্ব-পুরুষের প্রতিষ্ঠিত বটবৃক্ষের চতুর্দ্দিকের জঙ্গল পরিষ্কার করাইবার সময় নিষ্কর্ম্মাবস্থায় বসিয়া বসিয়া নখের দ্বারা ঐ বৃক্ষে একটি হনুমানের মুখাবয়ব অঙ্কিত করেন। সেই রাত্রেই তাঁহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে, "আমি বহুদিন হইতেই এই বৃক্ষে অধিষ্ঠিত আছি, তুমি আমার অবয়ব অঙ্কিত করাতে আমি ঐ স্থানে প্রকট হইলাম।" পরদিন প্রভাতে দেখা গেল, বৃক্ষের ঐ স্থানের বল্কলাদি উচ্চ হইয়া হনুমানের অবয়ব প্রকট হইয়াছে। তখন মহাসমারোহে পূজা, ভোগ-রাগাদি হয় এবং অদ্যাবধি শনি, মঙ্গলবার ভোগ-পূজাদি হইয়া থাকে। অন্যান্য দ্রব্যের

মধ্যে "মগধের লাড্ডু"-ভোগই ৺হনুমানজীর প্রিয়। ইহা প্রসিদ্ধ স্থান। খুব জাগ্রত ঠাকুর। হিন্দু মুসলমান সকলেই মানসিক দেয়। গৌরাঙ্গচাঁদের মায়ের শ্রাদ্ধের 'ষাড' জোয়ারদহের কোনও অবস্থাপন্ন মুসলমান মুন্সি সাহেব ধরিয়া লইয়া গিয়া হত্যা করিবার মতলব করে। গৌরাঙ্গচাঁদ স্বয়ং 'হাতিয়ারবন্দ' হইয়া বহুলোকজন-সহকারে ঐ গ্রাম লুণ্ঠন পূর্ব্বক ঐ ধর্ম্মের ষাঁড় উদ্ধার-মানসে যাত্রা করিলেন। এদিকে উক্ত মুন্সি সংবাদ পাইয়া প্রাণভয়ে ষাঁড় তাড়াইয়া দেয়। হামিদপুরে ঐ ষাড় পাওয়া যায়। তার পর স্থানীয় লোকের বহু চেষ্টায় লুট না করিয়া ষাঁড় সহ বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপ তাঁহা দ্বারা আরও বহু ফৌজদারী দণ্ডবিধির আমলযোগ্য কার্য্য মধ্যে মধ্যে ঘটিত। এজন্য একবার ভ্রাতুষ্পুত্রের পরামর্শে কিছুদিন বিলসোণা পাতলিয়ার মধ্যে নৌকায় এবং পরে পনরদিন মালাঞ্চিতে ৺শ্যামলাল সরকারের 'বারদুয়ারী' ঘরে গোপনে বাস করেন। তিনি মালাঞ্চিতে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা ও শিব স্থাপন করেন। সেই শিব বহুপরে হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য চুরি করিয়া পাগল হয়েন। নাজিরপুর পরগণা নিলাম হওয়ায় এ প্রদেশের আয় এককালীন খুব কম হইয়া যায় এবং সেই সময় রঙ্গপুর অঞ্চলেও তত্বাবধানের বিশেষ শৈথিল্য হওয়ায় নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র চৈতন্যচন্দ্রকে বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই সুশিক্ষা দিয়া রঙ্গপুরের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাঠান। নিজে দেবসেবা লইয়াই পয়োদায় থাকেন। ভ্রাতুষ্পুত্র স্বেচ্ছা পূর্ব্বক যাহা দিতেন, তদ্দ্বারাই দেবসেবা, অতিথিসেবাদি করিয়া প্রসাদ পাইয়া সৎসঙ্গে জীবন অতিবাহিত করিতেন। অবশেষে ৮৫ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে ৺গোপীনাথজীউকে দর্শন করিতে করিতে সন্ন্যাসসদৃশ ব্যাধি আশ্রয়ে স্বস্থানে প্রয়াণ করেন। সুস্থ শরীরে মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইয়া নিদ্রা গেলেন। দুই ঘণ্টা পর ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন,

"আমার মাথা ঘুরিয়া দেহ অবশ হইতেছে। আমি চলিলাম।" ৺গোপীনাথ জীউকে দর্শন জন্য ইঙ্গিত করায় ৺বিগ্রহ আনিয়া সম্মুখে ধরা হইল। ঠাকুর দর্শন করিয়া চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। সেই সময়ই তিনি অমরধামে গমন করিলেন। আত্রাই ও ইচ্ছামতীর সঙ্গমস্থলে যে প্রাচীন শ্মশান সেখানেই তাঁহার পঞ্চভৌতিক দেহের অবসান হয়।

৺গোকুলচাঁদের পুত্র চৈতন্যচন্দ্র সন ১২৮৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যচন্দ্র মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে সাবা হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। ইতিমধ্যেই তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত, উর্দ্দু ও কিঞ্চিৎ ইংরাজিও শিক্ষা করেন এবং এই বয়সেই বিষয়কর্ম্মশিক্ষা আরম্ভ হয়। ক্রমে তিনি এরূপ সর্ববিষয়ে পরিপক্ক হয়েন যে, তাঁহার জীবনকালে তিনি সমসাময়িক ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পর ঘরে বসিয়াই সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইনি যৌবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত রঙ্গপুরেই বাস করেন। নূতন সম্পত্তি খরিদ করিয়া আয় বহু বৃদ্ধি করেন। পরে পাবনা জেলাতেও সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া পয়োদায় আসিয়া বাস করেন। ইনিও একাধারে ভক্ত এবং অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ ছিলেন। অসমসাহসিক ছিলেন। রাত্রিকালে একাকী অসিহস্তে ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হইয়া ব্যাঘ্রকে বধ করিয়াছিলেন। আরও বহু বীরত্ব-কাহিনীর জন্য ইনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহার নাম শুনিয়া এখনও রঙ্গপুরের প্রাচীন লোকে ভয়সূচক ভাষা প্রয়োগ করে। বর্গীর নাম করিয়া বঙ্গদেশের ছেলেদের ভয় দেখায়, রঙ্গপুরে চৈতন্যবাবুর নাম তেমনি ছিল। ইনি বহুপ্রকার তন্ত্র-মন্ত্র অভ্যাস করিয়াছিলেন। তিনি মন্ত্র-চিকিৎসা করিতেন। এরূপ মন্ত্রকুশল ছিলেন যে, মন্ত্রশক্তিতে অসাধ্য সাধন করিতেন। তাঁহার সংগৃহীত মন্ত্রের খাতা অদ্যাপি তাঁহার পৌত্রের নিকট আছে।

এবং সে সকল কতক কতক প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে মন্ত্রগুলি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। তিনি সর্পদষ্ট বহু ব্যক্তির প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা-প্রয়োগে বলাই দাসকে পুনর্জ্জীবিত করেন। সে ছাদের উপর হইতে পড়িয়া মারা গিয়াছিল। চৈতন্যবাবু বহু পরিশ্রমে এক দিনের চেষ্টায় প্রাণদান করেন। আবার ইনি এতাদৃশ মাতৃভক্ত ছিলেন যে, মাতার জীবিত কাল পর্য্যন্ত তাঁহার চরণোদক পান না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। প্রয়োজনানুযায়ী বিদেশে যাইতে হইলে গোময়ের ভস্ম মাতৃপদোদকে সিঞ্চিত করতঃ তাহাই সঙ্গে লইতেন এবং যথারীতি পান করিতেন। এদিকে যেমন ভক্ত তেমনি আবার দোর্দ্দিণ্ড প্রতাপশালীও ছিলেন। শত্রুদমনে কিছুতেই দ্বিধা বোধ করিতেন না। তাজহাটের রামসুন্দর বাবুর সঙ্গে প্রথম যৌবন হইতে বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। উভয়ে একসঙ্গে বহুদিন শীকার আদি ও গীত-বাদ্যাদি নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ করিতেন। উভয়ের "বন্ধু" পাতান ছিল। পরে কোনও কারণে আবার তেমনি মহাবৈরভাব হয়। উভয়েই উভয়ের ভীষণ শত্রু হয়েন। অবশেষে এই বৈরভাবের ফলে এক দুর্ঘটনা ঘটে; জলঙ্গী ও ছাপঘাটির মধ্যস্থলে পদ্মার চরাতে দ্বিপ্রহরে ঘেরা স্থানের উপর দিয়া "মাড়িয়া"দের নৌকায় গুণ টানিয়া যাইতে বরকন্দাজদের সহিত "মাড়িয়া"দের বচসা হয়। ফলে তিনি ৬ খানি নৌকা আক্রমণ করেন ও ৩।৪ জন বরকন্দাজকে তরবারির আঘাতে কাটিয়া ফেলেন। পরে দলপতির দেহ দ্বিখণ্ডিত করেন। তখন উহারা পলায়ন করে। শীকার-ছলনায় রামসুন্দরবাবু চৈতন্যবাবুর প্রাণনাশের যুক্তি করেন। চৈতন্যবাবু অজ্ঞাতসারে ফাঁদে পা দেন এবং তাঁহার প্রভুভক্ত মাহুতের বুদ্ধিতে রামসুন্দর বাবু এবং চৈতন্যবাবু উভয়েরই প্রাণরক্ষা হয়। এই আক্রোশের ফলে তাজহাট

লুট হয়। শত্রুদমন জন্য তাজহাট, তুষভাণ্ডার, টেপার এক তরফের ধনরত্ন, এমন কি একটা হাতি পর্য্যন্ত লুট করিয়া একেবারে পয়োদার আনিয়াছিলেন। এই তাজহাট লুটের মোকদ্দমায় তাঁহার নিজ জবানবন্দির নকল এযাবৎও ছিল। ইহা এক বিশ্বাসঘাতক বেনামদার কর্ম্মচারী রাজসাহী জিলার বিলকুড়ী "আতাই কুপা" বা তদ্রূপ নামধারী সম্পত্তি ডুবলহাটী রাজাকে কবালা করিয়া দিয়া পলাতক হয়। চৈতন্যবাবু তাহাকে খুঁজিয়া ধরিয়া আনিয়া ফাটকখানায় আবদ্ধ রাখিয়া যথোচিত সাজা দেন। ইনি সপরিবারে গঙ্গা যাত্রা করেন, পথিমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটায় ফিরিয়া আইসেন। পরে আবার স্বপ্নাদেশে মৃত্যু নিশ্চয় জানিতে পারিয়া একসপ্তাহ পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ গিয়া গঙ্গান্তজলে দেহত্যাগ করেন। তিনি ৩ কন্যা ও ১ নাবালক পুত্র রাখিয়া যান।

এই পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র রায় যেমন রূপবান, গুণবান, তেমনি বলবান ছিলেন। তিনি মাত্র ২৪ বৎসর জীবিত ছিলেন। আসন, নেতি, ধৌতি, ত্রাট্, ন্যাস, প্রাণায়ম প্রভৃতি যোগের ক্রিয়া অভ্যাস করিয়া ছিলেন। ৪অঙ্গুলী চওড়া ১৫ হাত লম্বা বস্ত্রখণ্ড উক্ত কার্য্যে ব্যবহার করিতেন এবং প্রাণায়মে ৪অঙ্গুলী পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উঠিতেন। রাত্রি ৪টার সময় গিয়া বাদিয়াখালীর নদীর জলে নামিয়া বস্তি প্রভৃতি ক্রিয়া করিতেন এবং প্রাণায়মে ৩।৪ ঘণ্টা শবের মত নিশ্চেষ্ট অবস্থায় জলের উপর ভাসিতেন। এই সব কাজের বিঘ্ন হওয়ায় ব্যাধিগ্রস্ত হয়েন ও কলিকাতায় বহু চিকিৎসার পর গঙ্গান্তজলে দেহ ত্যাগ করেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে হাসিয়াছিলেন। হৃষীকেশ ঠাকুর কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে বলেন, "এ বড় সুখের সময়। হাসিতে হাসিতে গিয়া দাঁড়াইব।" ইনি বি-এ, এম্-এ, প্রভৃতি ডিগ্রীলাভের জন্য ইংরাজী কলেজে পড়েন নাই। পাবনা জিলা স্কুলেই ইহার পাঠ সমাধা হয়। পরে ঘরে

বসিয়া পড়িয়া সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। বহু শাস্ত্রগ্রন্থ এবং অন্যান্য নানা পুস্তক সংগ্রহ করতঃ লাইব্রেরী স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার হস্তাক্ষর সুন্দর ছিল এবং অনেক গ্রন্থ লিখিয়া দিতেন। ইনি বিদ্যোৎ-সাহী ও মুক্তহস্ত ছিলেন। অন্যান্য বহু সৎকার্য্যের মধ্যে পাবনা সহরেও ইঁহার বহু কীর্ত্তি বর্ত্তমান। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে যখন Sir Rever Thomsom তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর পাবনায় আইসেন, তখন পাবনা সহরে কেবলমাত্র জিলাস্কুল ভিন্ন আর কোন বিদ্যালয় না থাকায় সাধারণের অভাব দূরীকরণ জন্য লাট সাহেবের উপদেশমত বহু অর্থব্যয়ে বিদ্যালয়ের জন্য পাবনা সহরে পাকা বাড়ী করিয়া দিয়াছেন। প্রথম দফার ১০০০৲ এক হাজার টাকার বাবদ লাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী প্রাপ্তিস্বীকারপূর্ব্বক ধন্যবাদপত্র দেন। পরে ৺ যাদব পণ্ডিত মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ২৮০০৲ টাকা ব্যয় করতঃ বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু পরোপকার বা দান করিয়া নাম জাহির করা তাঁহার মত যোগীপুরুষের অভিপ্রেত না হওয়ায়, ঐ দালানে নিজ নাম লিখিতে দেন নাই। বিদ্যাশিক্ষার কার্য্যে ব্যবহার করিবার জন্য সহরের কয়েক জন উপযুক্ত ব্যক্তিকে ট্রাষ্টি নির্ব্বাচন করতঃ ঐ বাড়ী সাধারণের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। প্রথমে ঐ বাড়ীতে ছাত্রবৃত্তি স্কুল হইত, পরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হয়। কিছুদিন জাতীয় বিদ্যালয়ও হয়। বর্ত্তমানে মহাকালী পাঠশালা ও কংগ্রেস কমিটির বয়ন বিদ্যালয় ও অফিস ঐ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত আছে। কয়েকবার সহরের মাতব্বর ভদ্রলোকে দাতার পুত্রকে লইয়া সভা করতঃ যাহাতে এই কীর্ত্তি লোপ না হয় তজ্জন্য একখানি পাথরে "The Krishna Chandra Educational Institute" লিখিয়া উহা ঐ বাড়ীর শিখর দেশে স্থাপন করিতে তাঁহাকে সদুপদেশ দেন, কিন্তু পিতার নীরব দানের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া পুত্র তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য এ যাবৎ করেন নাই।

কৃষ্ণচন্দ্র জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং এতদ্দ্বারাও বহু পরোপকার করিতেন। পিতার মন্ত্রপুস্তক ব্যতীত আরও শাবর তন্ত্র প্রভৃতি কতকগুলি মন্ত্রপুস্তক সংগ্রহ করতঃ পরোপকার করিতেন। কৃষ্ণচন্দ্র সাজ-পোষাক করা দূরের কথা, জুতা পর্য্যন্ত পায়ে দিতেন না। মাজায় বাঁধিয়া কাপড় পরিতেন, কোঁচাও দিতেন না। ইঁহার সঙ্গে আলাপে লোকের অধর্ম্ম দূর হইত। ইঁহারই সঙ্গগুণে তাড়াসের রাজর্ষি রায় বনমালী রায় বাহাদুর প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ বৈষ্ণব হয়েন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রথম পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। পরে উধুনিয়ার ৺ রায় মহাশয়েরা শিক্ষা পান। পয়োদার নিজ বাড়ীতে এলোপ্যাথিক ডাক্তার ও কবিরাজ বেতন দিয়া রাখিয়া দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। নিজেও আয়ুর্ব্বেদে ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং বহু কঠিন রোগীকে ঔষধ দিয়া নিরাময় করিতেন। পার্ব্বত্য প্রদেশ ও নানাস্থান হইতে দুষ্প্রাপ্য ঔষধসকল সংগ্রহ করতঃ ভৈষজ্য উদ্যান করিয়াছিলেন। পয়োদাতে ছাত্রবৃত্তি স্কুল করিয়াছিলেন। ফিল্‌টার, বকযন্ত্র প্রভৃতি আনিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে বিশুদ্ধ ঔষধাদি প্রস্তুত করিয়া পরোপকার করিতেন। কয়েক রকম সুর ও লয় যন্ত্র অভ্যাস করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সেতার ও খোল তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। মৃদঙ্গ বাদ্যে ও কীর্ত্তনে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। জীবে দয়াবশতঃ জীবিত মৎস্য চাহিয়া লইয়া জলে ছাড়িয়া দিতেন। কৃষ্ণচন্দ্র একমাত্র পাঁচ মাস বয়স্ক শিশুপুত্র রাখিয়া ১২৯৫ সালে পরলোক গমন করেন। তখন ইঁহার বৃদ্ধা মাতা রাসমঞ্জরী চৌধুরাণী জীবিতা ছিলেন। তিনিই কৃষ্ণচন্দ্রের নাবালকত্ব সময়ে এবং পরে বৃন্দাবনচন্দ্রের নাবালকত্ব সময়েও এষ্টেটের একজিকিউট্রিকস্ ছিলেন। পুরুষসিংহ স্বামী চৈতন্যচন্দ্রের দেবসেবা ও মানগৌরবাদি রাসমঞ্জরী সাধ্যানুসারে রক্ষা করিয়া

গিয়াছেন। উপযুক্ত জামাতা সাধুখালীর দাস-বংশীয় ঈশানচন্দ্র মজুমদারের সহায়তায় এষ্টেটের কার্য্যাদি পরিচালনা করেন। পয়োদার সদর স্থানে নূতন পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করতঃ পথিক ও সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ করিয়া গিয়াছেন। পুত্রের কৃত স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় ও ভৈষজ্য উদ্যানের উচিত তদ্বিরের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিজেও বহু জটিল রোগে ঔষধ দিয়া আরোগ্য করিতেন।

৺ রাসমঞ্জরী এতাদৃশী অতিথিপরায়ণ ছিলেন যে, প্রত্যহ দেবসেবা-কার্য্যে ও ভজনসাধনে সারাদিন কাটাইয়া রাত্রি এক প্রহর গতে ৺গোপীনাথের বৈকালী ভোগ অন্তে সমস্ত অতিথি সেবা হইয়াছে কি না এবং বাড়ীতে বা গ্রামে কেহ অভুক্ত আছে কি না সংবাদ লইয়া তবে দ্বিপ্রহর সেই শুষ্ক অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন। পুত্রের পরলোকগমনের পর বিরাগবশতঃ সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অন্দরের বাগানের এককোণে খড়ের ঘর প্রস্তুত করিয়া তাহাতেই বাস করিতেন এবং কলার পাতায় প্রসাদ পাইতেন ও নারিকেলের মালাতে জল খাইতেন। দালানে বাস এবং খাটে, চৌকীতে শয়ন ও ভাল বিছানা বাসনপত্র পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতেন না। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে ৺ হনুমানতলাতে জলসত্র দিতেন। ৬৭টা বাগানের আম, কাঁঠাল ও অন্যান্য ফলাদি বৎসরে এক দিন মাত্র দেবসেবার জন্য আনিয়া অবশিষ্ট সব খয়রাতি করিয়া দরিদ্রসাধারণের জন্য ছাড়িয়া দিতেন। এমতাবস্থায় নিজের বাগানের আম নিজের হাটেই নিজের চাকরের দ্বারা খরিদ করিয়া আনিয়া দেবসেবা করিতেন। তাঁহার এই সকল নিয়ম অদ্যাপি বলবৎ আছে। বাল্যকাল হইতে আমরণ প্রাণপণে দেবসেবা করিয়া গিয়াছেন। দেবসেবা সম্বন্ধে এবং অন্যান্য বিষয়ে বহু স্বপ্নাদেশ পাইতেন। স্বপ্নাদ্য ঔষধে বহু জটিল ও মারাত্মক

ব্যাধি আরাম করিয়া লোকের প্রাণরক্ষা করিতেন। প্রয়োজনানুযায়ী বিশেষ প্রতাপেরও পরিচয় দিতেন।

গঙ্গাতীরে বাস করিবার জন্য রাসমঞ্জরী নবদ্বীপধামে গোরাচাঁদের আখড়ার পার্শ্ববর্ত্তী বাগানে খানিকটা স্থান লইয়া একটি ছোট পাকা-বাড়ী করেন এবং সন ১৩০২ সালে সেই বাড়ীতেই গঙ্গালাভ করেন। পরে ইঁহার পৌত্রের নাবালকত্ব সময়ে উহা বেদখল হইয়া যায়। নবদ্বীপের ধনী জমিদার শ্রীযুক্ত কালী বাকচি মহাশয় ঐ স্থানে প্রাসাদোপম অট্টালিকা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ৺রাসমঞ্জরীর সেই ক্ষুদ্র কোঠা অদ্যাপি ফটকের নিকট বর্ত্তমান আছে। রাসমঞ্জরীর পরলোকগমনের পর তদীয় পুত্রবধূ শশিমুখী চৌধুরাণী নাবালক পুত্র বৃন্দাবনের অভিভাবিকা হয়েন। ইঁহার মত ধর্ম্মশীলা আজকাল কমই দেখা যায়। ইনিও শ্বাশুড়ীর মতই নিয়ম ব্রতাদি পালন করেন। শ্বাশুড়ীর শিক্ষায় তাঁহারই মত দেবসেবা করেন ও তদ্রূপই অতিথিপরায়ণা হইয়াছেন। তেমনি রাত্রি এক প্রহর গতে অতিথিসেবাদির সংবাদ লইয়া তবে মধ্যাহ্নের সেই অন্নপ্রসাদ পান। কায়মনোবাক্যে দেবসেবা বাল্যকাল হইতেই করায় ইনিও বহু স্বপ্নাদেশ পাইয়া থাকেন। স্বপ্নাদ্য বহু দুরারোগ্য, উৎকট রোগের ঔষধ দিয়া সহস্র সহস্র রোগীর প্রাণ রক্ষা করেন। মহামারীরও স্বপ্নাদ্য ঔষধ দিয়া এযাবৎ বহু লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। স্বামী কৃষ্ণচন্দ্রের পরলোকগমনের পর হইতেই একমাত্র শিশু পুত্র ও একটী নাবালিকা কন্যা লইয়া শত্রুচক্রে বহু ক্লেশ পান। ভ্রাতা চাকী-বংশীয় চণ্ডীপুরনিবাসী ৺মতিলাল মজুমদারের সহায়তায় নাবালকের প্রাণরক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষার মানসে শ্বাশুড়ীর অনুমতি গ্রহণে কলিকাতায় গিয়া দুইবৎসর বাস করেন। শত্রুগণ চক্রান্ত করিয়া সেখানেও নাবালককে জুয়াচোর দ্বারা চুরি করায়। ভগবৎ কৃপায় সেই জুয়াচোর

নাবালককে প্রাণে না মারিয়া সোনা রূপা যাহা গায়ে ছিল লইয়া পলায়। সেই সংবাদে ৺রাসমঞ্জরী বিশেষ ব্যাকুলাবস্থায় কলিকাতায় গিয়া নাবালক পুত্রবধুকে লইয়া আইনেন এবং পয়োদায় আসিলে পূর্ব্ববৎ নাবালকের প্রাণের আশঙ্কা জন্য পাবনা সহরে বাস করতঃ নাবালকের বাসের ও বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। কয়েক মাস মধ্যেই শশিমুখীর ভ্রাতা ও নাবালকের তৎকালীন অভিভাবক ও একমাত্র আশ্রয়স্থল মাতুলকেও শত্রুগণ গুপ্ত হত্যা করে। পরে ৺রাসমঞ্জরীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই নাবালকসহ শশিমুখী পয়োদায় আসিয়া বাস করেন। এষ্টেটের ভার গ্রহণ করতঃ শত্রুচক্রে শশিমুখী মাত্র ৩।৶০ তিন টাকা সাত আনা তহবিল পান। পরে বহু আয়াসে শত্রুগণকে দমন করেন এবং ভগবৎ কৃপায় অর্থ সংগ্রহ করতঃ সেই বৎসরেই পুত্রের চূড়াকরণ, শাশুড়ীর মহাসমারোহে সাপিণ্ডকরণ এবং কন্যারও সমারোহসহ বিবাহ দেন। পর বৎসর ২টী বড় পুকুর (দীঘি ও মহল পুষ্করিণী) পয়োদায় করেন। পোড়াদহনিবাসী ৺বিশ্বনাথ সিংহকে ম্যানেজার নিযুক্ত করতঃ সুশৃঙ্খলায় এষ্টেট পরিচালনা করিতে থাকেন। পরে পূর্ব্বদেউলার যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় এষ্টেট ম্যানেজ করেন। স্থানীয় জলকষ্ট নিবারণ করতঃ পয়োদা হইতে বাঙ্গিয়াখালী পর্য্যন্ত ১মাইল রাস্তা উচ্চ করিয়া বাঁধেন। শত্রুচক্রে কয়েকটী মহলের প্রজা বিদ্রোহী হইয়া অনেক দিন ধরিয়া বহু মামলাদিতে গোলযোগ করে, পরে তাহারা বশীভূত হয়। নাবালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে বিবাহ দিয়া সংসার-বন্ধনে আবদ্ধকরতঃ তাহার হাতে ১৩১৩ সালে এষ্টেটের কার্য্যভার দিয়া নিজে ধর্ম্মকর্ম্ম ও সংসারের ভার গ্রহণ করতঃ শৃঙ্খলাসহকারে দেবসেবা করিতেছেন। ৺রাসমঞ্জরী চৌধুরাণীর নবদ্বীপস্থ কোঠা বেদখল হইবার পর শশিমুখী ১৩০৭ সালে নবদ্বীপে ১টী বাড়ী খরিদ করতঃ তাহাতে পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক

নিজ মাতাঠাকুরাণীকে ঐ বাড়ীতে রাখিয়া গঙ্গাবাস করান। ২২ বৎসর গঙ্গাবাস করিবার পর তিনি ৺গঙ্গা লাভ করিলে, অধুনা স্বজাতীয় নিরাশ্রয়া বিধবাগণ ঐ বাড়ীতে তীর্থবাস করিতেছেন। নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র বীরেশচন্দ্র মজুমদারকে পয়োদাতে নিজ বাড়ীর পার্শ্বে নিষ্কর ও বহু জোত দিয়া বাড়ী ঘর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন এবং সর্ব্ব প্রকারে প্রতিপালন করিতেছেন। পুত্রবধূর প্রতি সংসারের ভার দিয়া শশিমুখীও নবদ্বীপে গিয়া তীর্থবাস করিতে মানস করেন, কিন্তু পুত্রবধু হঠাৎ পরলোক গমন করায় ইঁহার তীর্থবাস ঘটে নাই। ইনি বাল্যাবধি বহু শোক পাইয়াছেন ও পাইতেছেন। এখন বৃদ্ধাবস্থায় হৃদ্রোগ ও অন্যান্য দুশ্চিকিৎস্য বহু জটিল রোগে জরাজীর্ণ ও স্বাস্থ্যহীনা হওয়ায় চিকিৎসক ও পুত্রাদির বিশেষ উপরোধাদিতে কখনও কখনও দিবা ৩য় প্রহরে অতিথিসেবার সংবাদ লইয়া প্রসাদ পাইয়া থাকেন। প্রতি বৎসরই সপরিবারে তীর্থযাত্রা করিয়া বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিয়াছেন। পৌত্রমুখ দর্শন করিয়াছেন। এখন পৌত্রীকে পাত্রস্থ করিয়া তীর্থবাস করিতে যাইবেন, তাহার উদ্যোগে আছেন। স্বামীর আশ্রিত পূর্ব্বোক্ত হৃষীকেশ অধিকারী (বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য) মহাশয়কে তাঁহার মাতৃবিয়োগের পর সংসারশূন্য অবস্থায় উচ্ছৃঙ্খল হইবার সংবাদ পাইয়া, শশিমুখী বহু অর্থব্যয়ে সন ১৩০৮ সালে ইঁহার বিবাহ দিয়াছেন। পরে উঁহাকে পৌরহিত্যে নিয়োগ করতঃ ও অন্যান্য নানাভাবে সপরিবারে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। তিনি বহু অর্থসাহায্য করতঃ হৃষীকেশের কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। বর্ত্তমান বংশধর বৃন্দাবনের বাল্যকাল শত্রুচক্রে কষ্টে গিয়াছে। কয়েকবার খাদ্যদ্রব্যে বিষপ্রদান এবং কলিকাতায় গুণ্ডা প্রভৃতির দ্বারা ও অন্যান্য নানা প্রকারে প্রাণনাশের চেষ্টা হয়। অবশেষে বয়ঃপ্রাপ্ত

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চন্দ্র রায় চৌধুরী।

হইয়া এষ্টেট হাতে লইয়াছেন। প্রথমা কন্যার বিবাহ দিবার পর তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মিয়াছে। দ্বিতীয়া কন্যাটী অনূঢ়াই আছে। সন ১৩৩২ সালে দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে এক পুত্র জন্মিয়াছে। নাম বিধানচন্দ্র রায়।

বর্ত্তমান বংশধর বৃন্দাবনচন্দ্রের জন্ম সন ১২৯৪ সালের ১০ই অগ্রহায়ণ। ইঁহার জন্মকালীন সেই মুহূর্ত্তের কথা ইঁহার এখনও বেশ মনে আছে। সূতিকা-গৃহে যেখানে যে শিয়রী হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়েন, সেখানে অগ্নিকুণ্ড, যেখানে চৌকী-বিছানাদি ও ঘরে যে ২।৩ জন লোক ছিল এবং ঘরের দরজার সামনে জ্যোৎস্না রাত্রিতে যে যে অবস্থায় বসিয়াছিল বেশ স্মরণ আছে। তার পরই আর স্মরণ নাই। একথা লোকে শুনিলে বিশ্বাস করে না বলিয়া কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না। পরে ৬ বৎসর বয়সে মাতুল অভিভাবক হইয়া ইঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যান। সেখানে হাতে খড়ি হয় ও ৭ বৎসর বয়সে কলিকাতার মহাকালী ইনষ্টিটিউসনে 9th classএ ভর্ত্তি হয়েন। এক বৎসর ঐ স্কুলে অধ্যয়নকালে প্রত্যহ হিন্দু দেবদেবীর স্তোত্রাদি পাঠ ও আবৃত্তি করিতে হইত। প্রশ্নোত্তরমঞ্জরী ও স্তুতিমালা নামক দুইখানি গ্রন্থ যাহাতে ধ্যান-প্রণাম এবং স্তবাদি ছিল উহা দৈনিকই খানিকটা মুখস্থ করিতে হইত। এইরূপে শিশুকালেই বহু দেবতার স্তোত্রাদি অভ্যাস করতঃ মনে দৃঢ়রূপে ধর্ম্মভাব এবং ভক্তিভাব জন্মে এবং ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের অনুকূল শিক্ষা দ্বারা এই ভাবের উৎকর্ষ হইতে থাকে। ৮ বৎসর বয়সে কলিকাতায় জুয়াচোরে ইঁহাকে চুরি করিয়া লইয়া যায়। তাহার কয়েক দিন পর পিতামহী ৺রাসমঞ্জরী চৌধুরাণী গিয়া লইয়া আইসেন এবং পাবনাতে বাসা করিয়া জিলা স্কুলে 8th classএ ভর্ত্তি করিয়া দেন। বাড়ীতে দৈনিক দেবসেবা থাকাতে এবং দৈনিক সঙ্কীর্ত্তনের নিয়ম থাকায় এই বাল্যকালেই কীর্ত্তন ও

মৃদঙ্গবাদ্য অভ্যাস আরম্ভ হয়। পরে ঢাক, ঢোল, টিপায়া বা ডঙ্কা, এমন কি, জয়ঢাক প্রভৃতি যন্ত্রও অভ্যাস হয়। পরে কিশোর বয়সে ডুগি, তবলা ইত্যাদি ও বাঁশী, হারমোনিয়ম, বেহালা, সেতার, এসরাজ প্রভৃতি কয়েক রকম সুরযন্ত্রও অভ্যাস করেন। কণ্ঠসঙ্গীতও অভ্যাস হয়। কিন্তু কীর্ত্তনই বিশেষ প্রকারে শিক্ষা করেন। এজন্য নবদ্বীপধামে গিয়া উচ্চাঙ্গের কীর্ত্তন ও মৃদঙ্গবাদ্য অভ্যাস করেন। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এনট্রান্স পর্য্যন্ত পড়িয়াই বিদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ বাধ্য হইয়া করিতে হয়। বাল্য হইতেই সংস্কৃত সাহিত্যে অনুরাগ থাকায় ঘরে বসিয়া তাহারও কিঞ্চিৎ অনুশীলন করিয়া কথঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মে। পূর্ব্বপুরুষগণের সর্ব্ব প্রকার দোষ ও গুণাদির অস্থিমজ্জাগত সমাবেশ স্পষ্টই ইহাতে দেখা যায়। ১৮ বৎসর বয়সে বিদ্যালয় পরিত্যাগকরতঃ এষ্টেটের কাজ হাতে লইয়াছেন। পৈত্রিক সম্পত্তির আয় বৃদ্ধি করতঃ এবং নূতন সম্পত্তি করতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা সম্পত্তির পরিমাণ অনেকটা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

পয়োদার জমীদার-বংশ

কুলজী

কান্যকুব্জান্তর্গত নন্দীগ্রাম-নিবাসী, কাশ্যপ গোত্র ৺চিত্রগুপ্তজ কায়স্থ

ভৃগুনন্দী

১মা পত্নীর সন্তান — শ্রীকণ্ঠ, কৌতুক, বাল্মীক
২য়া পত্নীর সন্তান — শিব, শঙ্কর
৩য়া পত্নীর সন্তান — কানু, মাধব

ইতিমধ্যে ৪ পুরুষের নাম নাজাই থাকিল।

রুদ্রকান্ত
|
চন্দ্রকান্ত
|
কৃষ্ণপ্রসাদ
|
যদুনন্দন
|
বাসুদেব
|
মুকুন্দ
|
নরসিংহ
|
জনার্দ্দন
|
কামদেব (৮৮২ সাল বীরভূম, গোকুলপুর)
|
কেশব রায় (পত্নী নবীনকিশোরী)

কেশব রায়ের পুত্র — মহেশ রায় পত্নী গৌরসুন্দরী, অমর রায়

মহেশ রায়ের পুত্র — কৃষ্ণবল্লভ রায়

অমর রায়ের পুত্র — কীর্ত্তিচন্দ্র, হরিশচন্দ্র

কীর্ত্তিচন্দ্র
|
নবদ্বীপচন্দ্র

* ভৈরবীর স্বামীর নাম জীবন নারায়ণ রায় ; জীবন নারায়ণের পিতা রামনারায়ণ রায় ও পিতামহ রূপনারায়ণ রায়।

শ্যামচন্দ্র
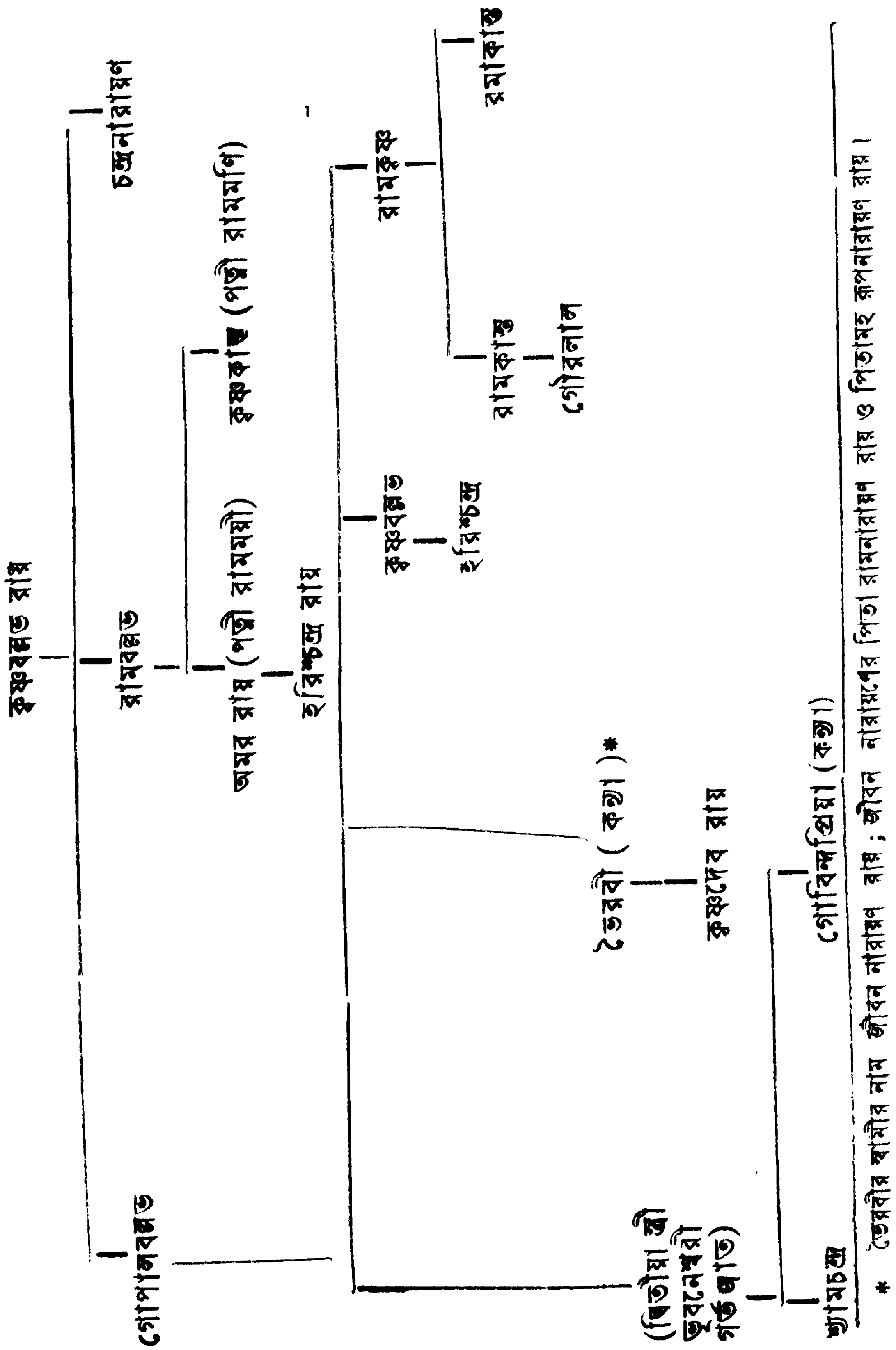
গোকুলচন্দ্র (স্ত্রী গোকুলীসুন্দরী)
ওরফে চন্দ্রমণিচৌধুরাণী)

গৌরাঙ্গচন্দ্র

রাইকিশোরী — নিমাই মজুমদার ভ্রাতুষ্পৌত্র বৈকুণ্ঠমজুমদার (অষ্টমনীশা)
কন্যা পুত্র রমেশ রায়

অদিতিচন্দ্র কুঞ্জকিশোরী

চৈতন্যচন্দ্র ওরফে কৃষ্ণসুন্দর, ওরফে নবদ্বীপ চন্দ্র — রাধাচরণ মজুমদার
(— রাসমঞ্জরী ওরফে রাইকিশোরী ২য়া পত্নী) — ব্রজাঙ্গনা চৌধুরী

শশিরেখা
ঈশান চন্দ্র মজুমদার
ভিম নগর

হরিমঞ্জরী
= বনোয়ারীলাল মজুমদার
চণ্ডিপুর

কৃষ্ণচন্দ্র
শশীমুখী

যুগলকিশোরী ঈশানচন্দ্র
মজুমদার চরভীম নগর

ইন্দুপ্রভা ওরফে যাজ্ঞসেনী,
স্বামী রাধারঞ্জন রায়
(নাটোর)

বৃন্দাবনচন্দ্র

নীহারকুমারী ১মা স্ত্রী
বিভাবতী ২য়া স্ত্রী

অমিয়কুমারী
গিরীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
ডাঙ্গীপাড়া

(শোভা) (সুকুমারী)
আভা

বিধানচন্দ্র

বৃন্দারাণী
ওরফে গুপীল

বারীন্দ্রনারায়ণ

খোকা

মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ

জিলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ভট্টপল্লীর সুপ্রসিদ্ধ গুরুবংশে তর্কভূষণ মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পাণ্ডিত্য ও সদাচারের জন্য এই বাশিষ্ঠ গুরুবংশের প্রতিষ্ঠা বঙ্গদেশে অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণীর অসংখ্য ব্রাহ্মণ-পরিবার এই বংশের শিষ্য বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করেন। এই বংশের আদিপুরুষ গদাধর ঠাকুর কান্যকুব্জের বাশিষ্ঠ গোত্রের ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, তিনি পুরীধামে শ্রীজগন্নাথ-দর্শন-ব্যপদেশে পত্নীর সহিত, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বগড়ী নামক প্রসিদ্ধ স্থানে আগমন করেন। সেই সময় তাঁহার পত্নী আসন্নপ্রসবা হওয়ায় একজন প্রসিদ্ধ সদ্‌ব্রাহ্মণ বন্ধুর গৃহে তাঁহাকে রাখিয়া একাকী তিনি শ্রীপুরুষোত্তম অভিমুখে যাত্রা করিতে বাধ্য হন। পরে যথাকালে শ্রীপুরুষোত্তম হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। গদাধর ঠাকুরের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অলৌকিক তপস্যা ও বিশিষ্ট সদাচার প্রভৃতি গুণাবলী বিলোকন করিয়া, বগড়ী প্রদেশের আস্তিক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে তথায় চিরস্থায়িভাবে বাস করিবার জন্য একান্ত অনুরোধ করেন। বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত লোকের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, তিনি তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। গদাধর ঠাকুরের দুইটি সন্তান জন্মিয়াছিল। প্রথমটীর নাম বিষ্ণু ও দ্বিতীয়টির নাম জনার্দ্দন। জনার্দ্দন বগড়ী পরিত্যাগ করিয়া যশোহর জেলার অন্তর্গত ধূলিপুর পরগণায় ধলবেড়ে নামক গ্রামে কোন কার্য্যোপলক্ষে আগমন করেন। তথায় তৎকালে বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ

বাস করিতেছিলেন এবং বৈদিক সমাজও সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তথায় ধর্ম্মানুষ্ঠান ও গার্হস্থ্যের সুবিধা বুঝিয়া, বহু শিষ্যের অনুরোধে তিনি তথায় স্থায়িভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই জনার্দ্দন ঠাকুরেরই পুত্র মহাপুরুষ নারায়ণ ঠাকুর। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে লক্ষ্মণ বাচস্পতি মহাশয় তদীয় পাশ্চাত্য কুলপঞ্জিকা নামক গ্রন্থবন্ধে পাশ্চাত্য বৈদিকগণের পরিচয়-প্রসঙ্গে, নারায়ণ ঠাকুর সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—

"বশিষ্ঠজোঽভীষ্টবিশিষ্টনিষ্ঠঃ
নরেশ নারায়ণ ঠাকুরাখ্যঃ"।

নারায়ণ ঠাকুর স্বীয় বাসগৃহের প্রাঙ্গণে একটি বিল্ববৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহারই মূলে বসিয়া সাধনা আরম্ভ করেন। প্রবাদ আছে, এই সাধনাতেই তাঁহার সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল। যে বিল্ববৃক্ষের মূলে বেদী নির্ম্মাণপূর্ব্বক মহাপুরুষ সাধনায় রত হইয়াছিলেন, সেই বৃক্ষটি কালে লুপ্ত হইলেও তাহারই মূল হইতে যে দ্বিতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে এখনও তাহা ধলবেড়ে গ্রামে বিদ্যমান আছে এবং তাহারই চতুঃপার্শ্বস্থিত ৩।৪ বিঘা জমী নারায়ণ ঠাকুরের ভিটা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। সেই ভিটাকে এখনও লোকে বেলবাড়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করে। নারায়ণ ঠাকুর মন্ত্রসাধনার ফলে গুটিকাসিদ্ধি প্রভৃতি কয়েকটি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ধলবেড়ে গ্রাম হইতে ৩০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত ভট্টপল্লীর তল-বাহিনী ভাগীরথীতে প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্নান করিতে আসিতেন এবং তথায় সন্ধ্যা-তর্পণাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। গুটিকাসিদ্ধির প্রভাবেই তাঁহার এই গমনাগমন অতি অল্পকাল মধ্যেই সাধিত হইত। ভট্টপল্লীর যে ঘাটে নারায়ণ ঠাকুর প্রত্যহ স্নান করিতেন, সেই ঘাটেরই নিকটে মাধব নামে

এক কুম্ভকার বাস করিত। সে প্রত্যহই প্রত্যুষে সেই তেজঃপুঞ্জ-কলেবর সাক্ষাৎব্রহ্মণ্যদেবস্বরূপ নারায়ণ ঠাকুরকে দেখিত, কিন্তু নিকটে যাইয়া আলাপ করিতে সাহসী হইত না, অথচ চেষ্টা করিয়াও তিনি কোন পথে কোথা হইতে আসেন বা যান তাহাও খুঁজিয়া পাইত না। এই ব্যাপার ক্রমে সে ভট্টপল্লীর জমীদার পরমানন্দ হালদার মহাশয়কে জানাইয়াছিল। এই পরমানন্দ হালদার যশোহর জেলার ভুগীর হাটের সুপ্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পরমানন্দ হালদার নবাব সরকারে চাকুরী করিতেন এবং নবাবের অনুগ্রহে ১০০০ সনে ভাটপাড়া তালুক জমীদারীরূপে প্রাপ্ত হইয়া তথায় গঙ্গাতীরে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি মাধবের মুখে নারায়ণ ঠাকুরের এই প্রকার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, একদিন প্রত্যুষে সেই মহাপুরুষের সম্মুখীন হন এবং তাঁহারই মুখে তাঁহার সম্যক্ পরিচয় অবগত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। হালদার মহাশয় নারায়ণ ঠাকুরকে গঙ্গাতীরে বাস করিতে অনুরোধ করেন। নারায়ণ ঠাকুর কিন্তু গঙ্গাতীরে কোন প্রকার প্রতিগ্রহ-লব্ধ ভূমিতে বাস করিতে অসম্মত হন। হালদার মহাশয় তখন তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণের প্রস্তাব করেন। নারায়ণ ঠাকুরও তাঁহাকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া দীক্ষা দান করেন। এইভাবে হালদার-বংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার পর, তাঁহাদিগেরই অনুরোধবশতঃ নারায়ণ ঠাকুর মধ্যে মধ্যে ভাটপাড়ায় আসিয়া বাস করিতেন। হালদার মহাশয় তাঁহাকে স্থায়িভাবে ভাটপাড়ায় বাস করিতে বহুবার অনুরোধ করার পর শেষে তিনি বলিয়াছিলেন, "না, আমার পৌত্র হইতে এখানে আমার বংশের স্থায়িবাস হইবে"। তাঁহার পৌত্র চন্দ্রশেখর বাচস্পতি স্থায়িভাবে ভাটপাড়ায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। নারায়ণ ঠাকুর যে কেবল অধ্যাত্মবিদ্যাতেই পারদর্শী ছিলেন

তাহা নহে তিনি বেদ ও শাস্ত্রেও অসাধারণ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার প্রণীত "ব্রহ্মসংস্কারমঞ্জরী" নামক উৎকৃষ্ট স্মৃতি-নিবন্ধ গ্রন্থই উহার প্রমাণ। এই গ্রন্থ অনুসারেই ভাটপাড়ার গুরুঠাকুরগণ এখনও তাঁহাদিগের সকল সংস্কারকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন:—

"মুরারিভাষ্যাবট ভাষ্যসারসঙ্কেততঃ শাতপথ শ্রুতীশ্চ।
বিলোক্য পারস্কর গৃহ্যভাষাণ্যশেষ দেশাৎ পরিসঙ্কিতানি
তন্যতে ন্যায়চার্কঙ্গী শ্রীনারায়ণ শর্ম্মণা।
প্রীতয়ে ধর্ম্মভীরূণাং ব্রহ্মসংস্কারমঞ্জরী॥"

নারায়ণ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্রের পুত্র চন্দ্রশেখর বাচস্পতি ভাটপাড়ায় আসিয়া স্থায়িভাবে বাস করিতে আরম্ভ করার পর হইতেই, এই বংশের প্রতি পশ্চিম বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত আস্তিক ব্রাহ্মণগণ বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া এই বংশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ক্রমে অর্দ্ধ বঙ্গের আস্তিক ব্রাহ্মণকুলের গুরুবংশ বলিয়া ভাটপাড়ার ঠাকুরগণ প্রায় ২০০ বৎসর ব্যাপিয়া বঙ্গের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যবস্থাপক ও বিধায়করূপে সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। চন্দ্রশেখর ঠাকুরের পৌত্র রামগোপাল বিদ্যাবাগীশ বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়াচার্য্য গদাধর পণ্ডিতের সমসাময়িক ছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, কুমারহট্টের কোন এক সভায় রামগোপাল ঠাকুরের ন্যায়শাস্ত্রে বিচার-পরিপাটি দেখিয়া, গদাধর ভট্টাচার্য্য অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং সভা-মধ্যে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে, রামগোপাল যথার্থই নৈয়ায়িক হইয়াছেন। রামগোপাল আপনার বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের বলে ২০০০ বিঘা জমী অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং ১০০০ ব্রাহ্মণকে দীক্ষা প্রদান করিয়া-ছিলেন। বাঙ্গালা ১১৬৩ সনে রামগোপাল ঠাকুর রাজা যাদবরাম চৌধুরীর নিকট হইতে ৭০০ বিঘা ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন এবং ঐ সম্পত্তি রামগোপাল

চক্ নামে অভিহিত এবং উহা আজও তাঁহার বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন। রামগোপালের সময় হইতেই ভাটপাড়ায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনার আরম্ভ হয় এবং পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে ক্রমে ভাটপাড়া প্রধান ন্যায়শাস্ত্রসমাজ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই রামগোপালের পৌত্র গোপীনাথ ঠাকুর বিশেষ ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র সীতানাথ বিদ্যাভূষণ ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। সীতানাথ বিদ্যাভূষণের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহামহোপাধ্যায় ৺ রাখালদাস ন্যায়রত্ন। মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্নের ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণপণ্ডিতকুলের মধ্যে কাহারও অবিদিত নহে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ন্যায় ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য তৎকালে তাঁহার সমসাময়িক কোন পণ্ডিতের ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেবল বঙ্গদেশেই নহে, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক-রূপে ন্যায়রত্ন মহাশয় যে বিমল প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা আর কখন কোন বাঙ্গালী নৈয়ায়িকের ভাগ্যে ঘটিবে কি না তাহা ভগবানই জানেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা ৺তারাচরণ তর্করত্ন; ইনিও ন্যায়শাস্ত্রে জ্যেষ্ঠের তুল্যই ছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষায় অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের প্রভাবে, ইনি সমগ্র ভারতের পণ্ডিতসমাজে বিশেষ সম্মান-ভাজন হইয়াছিলেন। ইনি কাশীতে পরমহংস পরিব্রাজক স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর নিকট বেদান্ত ও মীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইঁহার পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ বাগ্মিতায় আকৃষ্ট হইয়া কাশীর মহারাজ ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণ সিংহ ইঁহাকে সর্ব্বপ্রধান সভাপণ্ডিতরূপে নিযুক্ত করেন। তর্করত্ন মহাশয় একাধারে কবি, আলঙ্কারিক ও দার্শনিক ছিলেন। আর্য্যসমাজের স্থাপয়িতা দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত তর্করত্ন মহাশয়ের যে শাস্ত্রীয় বিচার হইয়াছিল তাহাতে দয়ানন্দ সরস্বতী পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,

ইহা এখনও কাশীর প্রাচীন পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া থাকেন। এই বিচারের আমূল বৃত্তান্ত তৎকালে প্রচারিত সত্যব্রত সামশ্রমী-সম্পাদিত প্রত্নকম্রনন্দিনী নামক সংস্কৃত পত্রে বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। কেবল কাশীতেই নহে, বঙ্গদেশে চুঁচুড়ায় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত তর্করত্ন মহাশয়ের, সাকার নিরাকার সম্বন্ধে এক বিচার হইয়াছিল। সে বিচারেও তর্করত্ন মহাশয় জয়ী হইয়াছিলেন। এই বিচারের বিবরণ "সাকার-নিরাকার-বিষয়ক বিচার" নামকস্থ সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের যত্নে ঐ পুস্তক সম্পাদিত হইয়াছিল। তর্করত্ন মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে কতকগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। কাননশতকম্—কাব্য

২। রামজন্মভাণম্—দৃশ্যকাব্য

৩। শৃঙ্গাররত্নাকরঃ—অলঙ্কার

৪। মুক্তিমীমাংসা—দর্শন

৫। বিমলা ভাষ্যম্—ঈশোপনিষদ্‌ভাষ্য

৬। তর্করত্নাকরঃ—ন্যায়দর্শন

৭। খণ্ডনপরিশিষ্টম্—ন্যায়মতখণ্ডন

৮। পরমাণুবাদ খণ্ডনম্—ঐ

৯। নীতিদীপিকা—নীতিশাস্ত্র

১০। কলাতত্ত্বম—দর্শন

১২। বৈদ্যনাথস্তোত্রম

বঙ্গের পণ্ডিতকুলগৌরব এই তারাচরণের কনিষ্ঠ পুত্র মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় পঞ্চদশ বর্ষেই পিতৃহীন হন। যত

দিন তর্করত্ন মহাশয় জীবিত ছিলেন, ততদিন প্রমথনাথের লেখাপড়া বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ ছিল না। পিতার কাশীলাভের পর তিনি অধ্যয়নার্থ ভাটপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যাধ্যাপক ৺জয়রাম ন্যায়ভূষণ ও ৺ তারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের নিকট সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৎপরে ভাটপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় ৺শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট নব্য ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অল্প কালের মধ্যে সাহিত্য, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া, তিনি বেদান্ত ও মীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কাশীতে যাইয়া তর্কভূষণ মহাশয় স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্যের প্রভাবে তাঁহার পিতৃ-গুরু সুপ্রসিদ্ধ বৈদান্তিকশ্রেষ্ঠ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি-আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বামীজি নিজেই যত্ন করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্তশাস্ত্র পড়াইয়াছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের যখন বয়স একবিংশতি বর্ষ সেই সময়েই স্বামীজি তাঁহাকে কাশীর সুপ্রসিদ্ধ দারভাঙ্গা সংস্কৃত কলেজের দর্শন ও অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অল্পদিনে মধ্যেই এই অধ্যাপনাকার্য্যে তিনি মহাযশস্বী হইয়া উঠেন। এই সময়ে তিনি প্রাতঃকালে ছয়টা হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত দারভাঙ্গা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিতেন এবং বেলা দুইটা হইতে চারটা পর্য্যন্ত স্বামীজির নিকট মীমাংসা ও বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। মীমাংসাশাস্ত্রের শাস্ত্রদীপিকা, ন্যায়রত্নমালা, শাবর ভাষ্য প্রভৃতি এবং বেদান্ত শাস্ত্রের অদ্বৈতসিদ্ধি, চিৎসুখী, শারীরক ভাষ্য ও বৃহদারণ্যকভাষ্য প্রভৃতি দুরূহ গ্রন্থনিচয় তিনি স্বামীজির নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বিচার-সভায় কাশীর তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ-শাস্ত্রী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবকুমার শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় গঙ্গাধর পণ্ডিত, নৈয়ায়িকধুরন্ধর সীতারাম শাস্ত্রী প্রমুখ অধ্যাপকগণের সহিত

নানা শাস্ত্রীয় বিষয়ে বিচার হইত। ঐ সকল বিচারে তাঁহার কল্পনাশক্তি, প্রতিভানৈপুণ্য ও বিচারকৌশল দেখিয়া ঐ সকল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তাঁহার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়াছিলেন এবং পিতার উপযুক্ত পুত্র বলিয়া সর্ব্বসাধারণে নিঃসঙ্কোচে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। ন্যায়শাস্ত্রের শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, শক্তিবাদ ব্যুৎপত্তিবাদ ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য প্রভৃতি দুরূহ গ্রন্থগুলি তিনি মহর্ষিকল্প মহামহোপাধ্যায় ৺কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সময়েই তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় কাশীতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই শুভ অবসর লাভ করিয়া তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহার চরণোপান্তে উপবেশনপূর্ব্বক ন্যায় শাস্ত্রের তর্ক, প্রামাণ্যবাদ, অবয়ব ও অনুমিতি প্রভৃতি সুকঠিন গ্রন্থনিচয় বিশেষ যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভাটপাড়ার প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট তিনি স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকার্য্যে নিয়ত ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি কাব্যশাস্ত্রের আলোচনায় ও কবিতাগ্রন্থ নির্ম্মাণে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন। এই সময়েই তিনি কোকিলদূত, বিজয়প্রকাশ (স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী জীবনচরিত), রাসরসোদয় নামে তিনখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কাশীর মহারাজ ৺ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণ সিংহ এবং বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভুনারায়ণসিংহ ঐ কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ তাঁহার মুখে আমূল শ্রবণ করিয়া নিতান্ত প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন, এবং ঐ কয়েকখানি কাব্য গ্রন্থের মুদ্রণভার স্বয়ং সন্তোষপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইভাবে বত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত তর্কভূষণ মহাশয় পরম আনন্দের সহিত শাস্ত্রচর্চায় নিরত থাকিয়া কাশীর বিদ্বন্মান্য পণ্ডিতকুলের মধ্যে অলঙ্কাররূপে পরিগণিত

হইয়াছিলেন। এই সময় কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র মহোদয় অদ্বৈতবেদান্তশাস্ত্রের অনুশীলনের জন্য কিছুকাল কাশীবাস করিতে প্রবৃত্ত হন। তর্কভূষণ মহাশয়ের সর্ব্বশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তার বিষয় অবগত হইয়া, তিনি তাঁহার নিকট শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার শাঙ্কর ভাষ্য অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। স্যর রমেশচন্দ্রের সহিত কবিবর ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান উকীল ৺অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট গীতার শাঙ্কর ভাষ্য অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের সুযোগ্য কনিষ্ঠ পুত্র অধুনা স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহোদয়ও ঐ সময় কাশীতে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও তাঁহার পিতৃদেবের অধ্যয়নকালে তথায় উপস্থিত থাকিয়া বড়ই আনন্দের সহিত বেদান্তের আলোচনায় যোগদান করিতেন। গীতাভাষ্যের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে কলিকাতায় ফিরিবার সময় স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র মহোদয়, তাঁহার অবৈতনিক অধ্যাপক তর্কভূষণ মহাশয়কে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিতের পক্ষে এ সময়ে কাশীতে বিদেশীয় ছাত্রদিগের মধ্যে বিদ্যাপ্রচার অপেক্ষা, স্বদেশে স্বজাতীয় বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যাপ্রদান করাই একান্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। তর্কভূষণ মহাশয় যদি সম্মতি প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহার কলিকাতায় যাইয়া অধ্যাপনার সুবিধার জন্য তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করিতে পারেন। ইহার উত্তরে তর্কভূষণ মহাশয় জানাইয়াছিলেন যে, উপযুক্ত অধ্যাপকের পদ পাইলে, তিনি কিছু কালের জন্য কলিকাতায় যাইয়া অধ্যাপনা করিতে প্রস্তুত আছেন। মিত্র মহাশয়ের কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের কিয়দ্দিনের পরেই কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক অশেষশাস্ত্রপারদর্শী

মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় রাজকীয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে উদ্যত হন। স্যর রমেশচন্দ্রের চেষ্টায় মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সি-আই-ই মহাশয়ের পূর্ণ সম্মতি অনুসারে এবং মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের আগ্রহের আতিশয্যে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পদে তর্কভূষণ মহাশয়কে তৎকালীন ডাইরেক্টর মার্টিন সাহেব নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পদে নিযুক্ত হইয়া তর্কভূষণ মহাশয় স্মৃতি, বেদান্ত, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনায় যে অসামান্য খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা সকলেই বিদিত আছেন। তিনি কেবল অধ্যাপনাকার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিতেন তাহা নহে, ঐ সময়ে তিনি সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় বহু উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিয়াছেন। লোগাক্ষি ভাস্কর-কৃত সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসাগ্রন্থের কমলা নাম্নী যে টীকা তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন ঐ টীকা মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ব্যয়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশে মীমাংসাশাস্ত্রের প্রচার সে সময়ে একপ্রকার ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই নূতন টীকাখানির প্রচারে সে সময়ে তর্কভূষণ মহাশয় বিশেষ যশোলাভ করিয়াছিলেন। বেদান্তশাস্ত্রের গীতাশঙ্করভাষ্যের তাৎপর্য্য সহিত সরল বঙ্গানুবাদ এবং ব্রহ্মসূত্র শাঙ্করভাষ্যের ও তাহার বিখ্যাত টীকা ভামতীর বিশদ ও বিস্তৃত তাৎপর্য্য সহিত বিশদ বঙ্গানুবাদ বাঙ্গালা ভাষায় তর্কভূষণ মহাশয়ের অমূল্যদান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার প্রণীত বৌদ্ধ যুগের দুইখানি উপন্যাস মণিভদ্র ও দুকূলপারিকা তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণা ও উপন্যাস-রচনার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

তর্কভূষণ মহাশয় কেবল গ্রন্থ লিখিয়াই ক্ষান্ত নহেন, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ বক্তা।

কলিকাতা নগরে বিবেকানন্দ সোসাইটী, গীতাসভা, ব্রাহ্মণসমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্ম্ম, সমাজ ও দর্শন বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য লোকে লোকারণ্য হইত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা-কাল হইতে এপর্য্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের গভীর রহস্য ব্যাখ্যা করিয়া তিনি যে কতবার বক্তৃতা দিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐ সকল বক্তৃতা শুনিয়া ভক্ত ভাবুক শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। কুচবিহার, ঢাকা, মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, সিরাজগঞ্জ, বীরভূম, মেদিনীপুর, পুরী, বর্দ্ধমান, হুগলী প্রভৃতি স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে তিনি যে সকল সারগর্ভ ও সুললিত বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তর্কভূষণ মহাশয় মাতৃভাষার চরণাম্বুজে ভাবপুষ্পাঞ্জলি উপহার দিতে একদিনের জন্যও উদাসীন হয়েন নাই। কলিকাতা ইউনিভার্সিটির নব-প্রবর্ত্তিত পোষ্ট গ্রাডুয়েট বিভাগে অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হইয়া তিনি সংস্কৃত দর্শন সম্বন্ধে যে সকল 'লেকচার' দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে হিন্দু দর্শনের কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধে লেকচারগুলি শিক্ষিতসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিল। কলিকাতা ইউনিভার্সিটির কর্ত্তৃপক্ষ এই সকল লেকচার হইতে বাছিয়া তাঁহার মায়াবাদ নামক লেকচারটি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। পুণ্যশ্লোক বঙ্গের শিক্ষিতকুলাগ্রণী স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মায়াবাদ পুস্তক পাঠ করিয়া একান্ত প্রীতি অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন, তর্কভূষণমহাশয়ের মায়াবাদ বাঙ্গালার দার্শনিক সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে, শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রেরই এই গ্রন্থখানি পাঠ করা উচিত। বৌদ্ধসাহিত্যের রত্নভাণ্ডার হইতে নানা সমুজ্জ্বল রত্নরাজি বাছিয়া তাহার অনুপম মালা গাঁথিয়া

মাতৃভাষাকে সাজাইবার জন্য তাঁহার চেষ্টা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তৎকালে নবপ্রচারিত 'সমাজ' নামক মাসিক পত্রিকায় এবং 'শিল্প ও সাহিত্য' নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে তিনি ধারাবাহিকভাবে বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থ অবলম্বনে যে সকল প্রবন্ধ, উপন্যাস ও কবিতা লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, চিরদিন সেগুলি বঙ্গভাষার রত্নভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরাজির শোভা বহন করিবে। তাঁহার 'মণিভদ্র' ও 'দুকুল পারিকা' প্রভৃতি বৌদ্ধ উপন্যাসগুলি মাসিক পত্র হইতে সংগৃহীত হইয়া পুনঃ মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে তাহা পাঠ করিয়া সাহিত্যরসামোদী বঙ্গীয় পাঠকগণ বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন; দৈনিক ও মাসিক পত্রসমূহে ঐগুলি বিশেষ প্রশংসার সহিত আলোচিত হইয়াছিল। তর্কভূষণ মহাশয়ের রচিত শাক্যসিংহ নামক ইতিহাস গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া তৎকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অদ্বিতীয় শক্তিমান নেতা ভাইস্-চান্সেলর স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় অপ্রার্থিত হইয়া উক্ত গ্রন্থখানিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষার বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।

ইহা ব্যতীত উদ্বোধন, সাহিত্য-সংহিতা, জন্মভূমি, ভারতবর্ষ, জগজ্জ্যোতিঃ, বঙ্গবাণী, মাসিক বসুমতী, শিল্প ও সাহিত্য প্রভৃতি মাসিক পত্রসমূহে তিনি ধারবাহিকভাবে দর্শন, অলঙ্কার, ইতিহাস ও ধর্ম্মবিষয়ে কত যে গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক পরিচয় দিবার যোগ্য স্থান এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়-গ্রন্থে অসম্ভব, তাই আমরা আপাততঃ তাহা করিতে পারিলাম না।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে যখন সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ অভিষেকের জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন সেই উপলক্ষে ভারত গভর্মেণ্ট তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি-দানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির

প্রকাশিত বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কতকগুলির নাম দেওয়া যাইতেছে—কালবিবেক (জীমূতবাহন-কৃত), মীমাংসা-ভট্টরহস্য, হেমাদ্রিকৃত চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি, প্রায়শ্চিত্তখণ্ড ইত্যাদি। ইহা ছাড়া অনিরুদ্ধ ভট্টকৃত সাংখ্যসূত্রবৃত্তির একখানি বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করেন, ঐ গ্রন্থ ৺জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেসে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

শুধু বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াই তিনি কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই; এই সময়ে ধর্ম্ম ও সমাজসংক্রান্ত বড় বড় বিশিষ্ট সভায় তাঁহার বাঙ্গালা ভাষায় উদ্দীপনাময়ী অথচ মধুর বক্তৃতা-ধ্বনিতে বঙ্গের একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত মুখরিত হইতেছিল; বাঙ্গালার প্রায় প্রত্যেক জিলায় বড় বড় ধর্ম্মসভায় সাদরে আহূত হইয়া তিনি বক্তৃতা করিতে যাইতেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য তৎকালে শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ ব্যাকুল হইয়া থাকিতেন। ৪।৫ হাজার লোকের-সমক্ষে দুই তিন ঘণ্টা ব্যাপিয়া অনর্গল বক্তৃতা করিয়া স্বদেশবাসীর প্রীতি সাধন করা তাঁহার প্রায়ই প্রাত্যহিক কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা, ব্রাহ্মণমহাসম্মিলন, বিবেকানন্দ সোসাইটি, বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা, গীতাসভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির স্থিতি, উন্নতি ও প্রচারকল্পে তিনি কত বক্তৃতা যে করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নিয়মিত ভাবে কাশীবাস করিতে আরম্ভ করেন। কাশীতে তাঁহাকে পাইয়া হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অবিসম্বাদিত প্রধান নেতা মাননীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয় বড়ই উৎসাহ ও আনন্দসহকারে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা-বিভাগের অধ্যক্ষপদে নিয়োগ করেন। ঐ পদের বেতন

মাসিক ৫০০৲ টাকা হইলেও তর্কভূষণ মহাশয় জীবনের শেষভাগে বেতন লইয়া কার্য্য করিতে অস্বীকার করাতে মালব্য মহাশয় তাঁহাকে হিন্দু-জাতির প্রধান প্রতিষ্ঠানস্বরূপ হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের স্বেচ্ছাসেবকরূপে ঐ পদে তাঁহাকে নিয়োগ করিতে বাধ্য হন। এখনও তর্কভূষণ মহাশয় ঐ সম্মানার্হ পদে অধিরূঢ় হইয়া কায়মনোবাক্যে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের উন্নতির জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগের প্রভূত উন্নতি সাধন হইয়াছে ও হইতেছে। তাঁহারই আমলে সংস্কৃত বিদ্যার্থিগণের পাশ্চাত্য বিদ্যালাভের সৌকর্য্যার্থ প্রাচ্য বিদ্যাবিভাগে সংস্কৃত ও ইংরাজী উভয় ভাষার সুনিপুণ অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। মিথিলা দেশের বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিত বালকৃষ্ণ মিশ্র-প্রমুখ অধ্যাপকগণ প্রাচ্য বিভাগে অধ্যাপনা-কার্য্য করিতেছেন। হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট, সিণ্ডিকেট, কাউন্সিল প্রভৃতি সকল কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া তিনি সকল প্রকার প্রয়োজনীয় কার্য্যে বিশিষ্ট সহায়তা প্রদান করিতেছেন। কেবল গ্রীষ্মকালে দারুণ গ্রীষ্ম সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসর সময়ে প্রায় তিন মাসের জন্য তিনি কলিকাতা ভবানীপুরস্থ স্বীয় ভবনে আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের এই বৃদ্ধ বয়সে কাশীবাস কাশীবাসী পণ্ডিত ও ভক্তবৃন্দের বিশেষ আনন্দের বিষয় হইয়াছে। প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান, শ্রীবিশ্বেশ্বর, শ্রীঅন্নপূর্ণাদি দর্শন পূর্ব্বক আহ্নিক-পূজাদি নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া প্রত্যহ হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করিয়া তিনি অধ্যক্ষের কার্য্য ও বেদান্ত, মীমাংসা প্রভৃতি দুরূহ শাস্ত্রের অধ্যাপনা শেষ করিয়া বেলা ১১টার সময় কাশীতে বাসায় ফিরিয়া আসেন। সায়ংকালে বাস-ভবনে প্রত্যহ ভাগবতশাস্ত্রের

ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। বারাণসীর বহু অধ্যাপক ও ভক্ত বিষয়িবর্গ তাঁহার ভক্তিরসাত্মক দার্শনিকতাপূর্ণ ভাগবতব্যাখ্যা-শ্রবণে অপার আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের বয়স বর্ত্তমান সময়ে ৬৩ বৎসর।

তাঁহার চারিটি পুত্র ও পাঁচটি কন্যা। পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল কলিকাতাস্থ রিপণ কলেজের ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত আছেন এবং তদ্ভিন্ন কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতীও করেন। মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত ফটিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত ভাষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বি-এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া এক্ষণে পিতার চরণোপান্তে বসিয়া বেদান্ত ও মীমাংসা প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেছেন। তিনি পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় ও অনুশীলনে জীবন নিয়োগ করিয়াছেন। ইনি বিবাহ না করিয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের জীবন যাপন করিতেছেন। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ শিশিরকুমার ভট্টাচার্য্য বি-এ পরীক্ষার চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত হরিপদ কাব্যস্মৃতিমীমাংসাতীর্থ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছেন। মধ্যম জামাতা শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ চট্টগ্রাম কলেজের ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক। তৃতীয় জামাতা শ্রীযুক্ত অভয়াপদ চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি-এল কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল। বড়ই দুঃখের বিষয়, অল্প দিন হইল, ইঁহার ধর্ম্মপত্নী তর্কভূষণ মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা লীলাবতী দেবী অকালে অমরধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। ইঁহার অকালবিয়োগজনিত শোকে

তর্কভূষণ মহাশয় ও তাঁহার পরিজনবর্গ যে দারুণ মানসিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তর্কভূষণ মহাশয়ের চতুর্থ জামাতা শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী; ইনি সৈদাবাদের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ধার্ম্মিকপ্রবর শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। পিতার বিপুল সম্পত্তি রক্ষা করিবার ভার ইঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। তর্কভূষণ মহাশয়ের পঞ্চম জামাতা শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ ভটাচার্য্য এম এ, বি-এল আলিপুর কোর্টের একজন উদীয়মান উকীল। কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীমান্ অমরনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এস্ সি, ভাটপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ পরম ধার্ম্মিক অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ জ্যোতিরত্ন মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি বৈকালে নিজবাসগৃহে ভাগবত ব্যাখ্যায় ভক্ত ভাবুক-মণ্ডলীকে প্রায়ই পরিতৃপ্ত করিতেছেন। তাঁহার শেষ জীবনের এই সকল কার্য্য বাঙ্গালীমাত্রেরই গৌরবজনক, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতকুলে প্রমথ নাথের ন্যায় চরিত্রবান্ যশস্বী পণ্ডিতের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে স্বদেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

কলুটোলার স্বনামধন্য

৺বিহারীলাল পাইন

বিহারীলাল পাইন ১২৪৮ সালের ১০ই বৈশাখ কলুটোলার চূণাগলিস্থ প্রসিদ্ধ পাইন-বংশে সুবর্ণবণিক জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ৺হরিনারায়ণ পাইন সামান্য গৃহস্থ লোক ছিলেন। যৎসামান্য পৈত্রিক সম্পত্তি ও নিজের পরিশ্রমে পুত্রকন্যা প্রভৃতি লইয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতেন। ইঁহার চারি কন্যা ও তিন পুত্র, পুত্রদের মধ্যে বিহারীলাল জ্যেষ্ঠ ছিলেন। হরিনারায়ণ ধনী বলিয়া পরিচিত না হইলেও ভগবদ্ধনে ধনী ছিলেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ও ভগবদ্ভজনপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া তাঁহার সংসারে কিছুরই অভাব বোধ হইত না। এই ভগবন্নিষ্ঠার ফলে তিনি সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া নিজ কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া যাইতেন, পুত্রগণকে তিনি বিশেষ স্নেহের ও অবস্থানুসারে যতদূর হইতে পারে সেইভাবে পালন করিয়াছিলেন। পুত্রেরা সৎপথে থাকিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে এই তাঁহার এক মাত্র আশা ছিল।

বিহারীলাল প্রথমে পাঠশালায়, পরে মধ্য ইংরাজী মাইনর স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। পরিশেষে হাড়কাটাগলির প্রসিদ্ধ স্বনামধন্য ৺প্রেমচাঁদ বড়ালের নিকট ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। এই শিক্ষায় তিনি

স্বর্গীয় বিহারী লাল পাইন

সাহেবদের সহিত উত্তম কথাবার্ত্তা কহিতে পারদর্শিতা লাভ করেন। তৎকালে সুবর্ণবণিক জাতির নিকট বি-এ, এম-এ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের তত আদর ছিল না। যে সকল ইউরোপীয় বণিক্ ব্যবসা-ব্যপদেশে এদেশে আসিতেন তৎকালে তাঁহারা বি-এ, এম-এ পাস করা সাধারণ লোককে পছন্দ করিতেন না। কর্ম্মের পরিচালনে সমর্থ বানিয়াদী ঘরের লোকদিগকে নিযুক্ত করিতেন। এই সূত্রে তৎকালে সুবর্ণবণিক জাতির ইংরাজী-অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহাদিগের নিকট সমাদৃত হইয়াছিলেন। এখনও সওদাগর অফিসে ইঁহারাই সমাদৃত হন। সেকারণ বিহারীলালের সময়ে সুবর্ণবণিক জাতির মধ্যে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষার বহুল প্রচলন হয় নাই। বিহারীলালও উচ্চ ইংরাজী শিক্ষালাভের প্রয়াসও করেন নাই এবং তাঁহার পিতাও পুত্রকে দুই চারিটী পাস করাইবার জন্য চেষ্টা করেন নাই।

বিহারীলাল যেরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে উপযুক্ত অর্থ জমা দিতে পারিলে, কোন সওদাগর আফিসে কেশিয়ারের পদ লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার পিতার সেরূপ অর্থও ছিল না এবং তাহা সংগ্রহের নিমিত্ত পিতাকে কোনরূপ অনুরোধও করেন নাই। বিহারীলাল জ্ঞাতিগণের দ্বারস্থ হইতে একেবারে অপছন্দ করিতেন। কাজেই তাঁহার নিজের বিদ্যানুযায়ী একটী ১৬৲ টাকা বেতনের সামান্য চাকুরী খিদিরপুর ডকে সংগ্রহ করেন।

খিদিরপুর কলুটোলা হইতে প্রায় ৬।৭ মাইল দূরে। প্রত্যহ বাড়ী হইতে এই সুদীর্ঘপথ পদব্রজে যাইয়া কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হওয়া বড় সহজসাধ্য নয় বলিয়া, তাঁহার পিতা পাথেয়স্বরূপ তাঁহাকে তিন আনা পয়সা দিতে চাহিলে, বিহারীলাল উত্তর করেন, 'এই সামান্য ১৬৲ টাকা বেতন, তাহা হইতে মাসিক ৬।৭ টাকা পাথেয়রূপে খরচ করিলে কি

থাকিবে? আমি হাঁটিয়া আফিসে যাইব এবং হাঁটিয়াই ঘরে ফিরিব।” পরে পিতার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে কেবল পাঁচ পয়সা গ্রহণে স্বীকৃত হন। ধর্ম্মতলা হইতে সেয়ারের ভাড়ায় খিদিরপুর যাইতেন এবং পদব্রজে বাড়ী ফিরিতেন। তিনি যে কিরূপ পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন, প্রথম বয়স হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

উপার্জ্জনের সমস্ত অর্থ পিতার হস্তে আনিয়া দিতেন। বিহারীলাল যে নিতান্ত মেধাবী বালক ছিলেন না, শিক্ষা করিলে তিনি যে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষালাভ করিতে পারিতেন না, তাহা নহে; তবে তাঁহার পিতাকে সাহায্য করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হওয়ায় যে কোন কর্ম্ম সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত কর্ম্ম করিতে থাকেন এবং অল্পকাল মধ্যে কার্য্যকারিতা আয়ত্ত করিয়া ফেলেন।

বেশী দিন তাঁহাকে এ কর্ম্ম করিতে হয় নাই। ভগবান তাঁহার প্রতি বরাবরই সদয় ছিলেন, এই কর্ম্মকালে তাঁহার কর্ম্মকুশলতার কথা সকলেই অবগত হন। এখানে তুইবৎসর কর্ম্ম করার পর, ঝামাপুকুর-নিবাসী প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী তাঁহার মাতুলপুত্র কানাইলাল চন্দ্র মহাশয় বিহারীলালকে নিজ অধীনে মেসার্স আরজেনটীন সিলজার কোম্পানির গুদামে একটী উচ্চবেতনের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দেন। এখন হইতে তিনি প্রত্যহ খিদিরপুরে হাঁটিয়া যাইবার কষ্ট হইতে মুক্ত হন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেতন লাভ করেন।

এই কার্য্যে বিহারীলাল নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিবার অবকাশ লাভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই উক্ত কোম্পানির সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। এদিকে বিহারীলাল সওদাগরী কার্য্যে বিশেষভাবে উপযুক্ত হইবার নিমিত্ত কানাইলাল চন্দ্রের নিকট শিক্ষা

করিতে থাকেন এবং কানাইবাবুও তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে যথোচিত শিক্ষা দিতে বিরত হয়েন নাই।

যে জন পরিশ্রমী ও ভগবদ্‌বিশ্বাসী দৈব তাঁহার সহায় হন। তাঁহার ভাগ্যচক্র এইবার তাহার অনুকূলে ফিরিল। তিনি সুযোগও পাইলেন। আরজেনটিন সিলজার কোম্পানির শীলার নামক একজন সাহেব উক্ত কোম্পানি হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বারদিউল সীলার কোম্পানি (Bardule Siller & Co.) নাম দিয়া একটি ভিন্ন অফিস বান্ হাউসের (Bonded warehouse) নিকট খোলেন এবং বিহারীলালকে নিজের অফিসে আনিয়া একেবারে মুৎসুদ্দির পদে বসাইয়া দেন। সাহেব বিহারীলালের কার্য্যকুশলতার ও তৎপরতার বিষয় অবগত ছিলেন বলিয়া তাঁহার নিকট বিহারীলালকে আবেদন করিয়া কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয় নাই।

বিহারীলাল অধিক আয়ের কর্ম্ম পাইলেন বটে, কিন্তু একটা অফিসের মুৎসুদ্দির পদ চালাইবার তখন তাহার উপযুক্ত অর্থ ছিল না। এই পদ পাইয়া তিনি সাহেবকে যথোচিত ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, "আপনি আমার প্রতি অযাচিত অনুগ্রহ করিলেন বটে, কিন্তু আমি কিরূপে বিনা অর্থে এ কার্য্য চালাইতে সমর্থ হইব? আমাকে আপনি এ পদে বরণ করিয়া লোকের নিকট কি হাস্যাস্পদ করিবেন?" তাঁহার এই স্পষ্টবাদিতায় শীলার সাহেব বড়ই সন্তুষ্ট হন এবং বিহারীলালকে উৎসাহ দিয়া বলেন, "তোমার প্রয়োজন হইলে কর্ম্ম-পরিচালনার্থ স্বাধীনভাবে আমার ক্যাস হইতে অর্থ লইতে পারিবে।" সাহেবের এইরূপ সাহস-প্রদানে তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত কর্ম্ম চালাইতে থাকেন, তাঁহার অধ্যবসায় ও কৃতিত্বের গুণে উত্তরোত্তর কার্য্যে তাঁহার প্রসারতা হইতে লাগিল। এই

সময়ে এমন একটী কার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইল যাহাতে শীলার সাহেব বিহারীবাবুকে এক রাত্রে আশী হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলেন। সাহেব তখন "Behari Babu, you can easily fight now" বলিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। পুরুষকার দৈবসংযোগে অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে ইহা তাঁহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এখানে আর একটী কথা না বলিয়া থাকা যায় না। যখন কলুটোলা-নিবাসী কালিদাস ধরের কন্যা শ্রীমতী কুসুমকুমারী দাসীকে বিবাহ করেন তখন তিনি শীলার সাহেব কর্ত্তৃক আহুত হইয়া বারদিউন শীলার কোম্পানীর আফিসে আইসেন। তাঁহার স্ত্রী যে লক্ষ্মীস্বরূপিণী ছিলেন তাঁহাতে আর ভুল নাই। এ সময় হইতে তাঁহার ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে উপরের ঘটনা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার স্ত্রী আকৃতি ও প্রকৃতি সকল বিষয়ে সুন্দরী ছিলেন। 'স্ত্রীভাগ্যে ধন' যে প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহা সার্থক হইয়াছিল। কুসুমকুমারীকে বিবাহ করার পর বিহারীলাল যে কার্য্যে হাত দিতেন তাহাতেই জয় লাভ করিতে থাকেন এবং এখন হইতে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন।

তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল পরিশ্রম ও স্পষ্টবাদিতা। ব্যবসাক্ষেত্রে কখন প্রবঞ্চনা করিতেন না। তিনি ভোর পাঁচটা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত প্রতিদিন পরিশ্রম করিতেন এবং সমস্ত কার্য্য নিজ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করিতেন।

কোন সময়ে তিনি কর্ম্মান্তরে ব্যস্ত থাকায় একটা সিপ্‌মেণ্টের মাল তত্ত্বাবধান করিতে পারেন নাই। সেই সুযোগে কর্ম্মচারীরা একটা exportএর মাল সিপ্‌মেণ্ট দেয়। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া উপযুক্ত প্রকারের মাল সিপমেণ্ট দেওয়া হয় নাই সন্দেহ

হওয়ায়, বাড়ী আসিয়া রাত্রে ফিরিয়া গিয়া স্বয়ং জাহাজে উপস্থিত হন এবং সেই সব মাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারেন যে, কর্ম্মচারীরা প্রবঞ্চনা করিয়াছে, তৎক্ষণাৎ সেই সিপ্‌মেণ্ট cancelled করিয়া সমস্ত মাল জাহাজ হইতে নামাইতে আদেশ দেন, এ কার্য্যের জন্য ডেমারেজ ও বহনী খরচা প্রভৃতি তাঁহার স্কন্ধে পতিত হয়। তিনি এ সকল ক্ষতি স্বীকার করিয়া উপযুক্ত প্রকারের মাল পুনশ্চ সিপ্‌মেণ্ট করান। তিনি যে কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন এই ঘটনায় তাহা বিশেষ বুঝা যায়। বিদেশী কোম্পানীর নিকট কোনরূপ অপযশ হইবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবঞ্চনা যে ব্যবসায়ের উন্নতির অন্তরায় তাহা তিনি বিশেষরূপে বুঝিতেন বলিয়া তাই ঐরূপ কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিলেন। সে কারণ তাঁহার এইরূপ উন্নতি হইয়াছিল। সদ্‌গুণ ও কর্ম্মদক্ষতার নিমিত্ত তিনি Messrs. Rhimhold & Co., Shiller Co., Struther and Co., এবং Vaight and Co., চারিটি সওদাগর অফিসের এককালে মুৎসুদ্দি ও বেনিয়নরূপে কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এই সকল কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও সমস্তদিনব্যাপী পরিশ্রমের পর প্রত্যহ তদীয় গুরুদেব পণ্ডিত ৺গোকুলচন্দ্র গোস্বামীর নিকট ভাগবতপাঠ শ্রবণ করিতেন। কখনও তাঁহাকে ক্লান্ত দেখিতে পাওয়া যাইত না।

স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করিবার নিমিত্ত তিনি এদেশে দুইটি কলও করিয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালীদের কর্ত্তৃক স্থাপিত তত কল ছিল না। তিনি একটি চাল ও ধানের কল ও একটি কাচ (Glass) প্রস্তুতের কল স্থাপন করিয়াছিলেন। এদিকে এত কার্য্যের ভার, তাহার উপর কল চালাইবার তত্ত্বাবধান করিয়া উঠা একজন মনুষ্যের পক্ষে

অসম্ভব হওয়ায় কাজেই দুইটি কলই তাঁহাকে উঠাইয়া দিতে হইয়াছিল; এ ব্যবসায়ে তাঁহার লাভের অঙ্ক দেখা দেয় নাই।

ভারতবর্ষে কাচ প্রস্তুত করার চেষ্টায় তিনিই প্রথম ব্যক্তি। টিটাগড়ে Pioneer Glass Factory নাম দিয়া তিনি কাচের কারখানা স্থাপন করেন। বিদেশ হইতে উচ্চ বেতন দিয়া সাহেব কারিকর আনয়ন করান। সাহেব ইঞ্জিনিয়াররা এদেশীয় কারিকরদিগকে প্রস্তুতপ্রণালী, দ্রব্যের ভাগ প্রভৃতি কিছুই শিখাইতে রাজি হইতেন না। তাঁহার এদেশীয় কারিকর প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায় ব্যর্থ হয়, তাহার উপর এদেশীয় লোক অত্যধিক তাপ সহ্য করিতে অপারগ বিধায় অসুস্থ হইয়া পড়ায়, তিনি কল বন্ধ করিয়া দেন। এই কল প্রচলনে তাঁহাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। মনোমত কর্ম্মী জুটিলে কাচ প্রস্তুতকরণের কলটী রাখিতেন। কিন্তু এ কার্য্যে কেহ তাঁহার সহায় না হওয়ায় ক্ষুণ্নমনে একার্য্য হইতে নিরস্ত হন।

প্রথমে উল্লেখ করা গিয়াছে,তাঁহারা তিন ভাই—বিহারীলাল, কুঞ্জলাল ও রসিকলাল। কুঞ্জলাল কিছু ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহিত একযোগে কর্ম্ম না করিয়া ভিন্ন আফিসে কেসিয়ারী চাকুরী করিতেন। ছোট ভাই রসিকলাল বড় ভাইয়ের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠিতেছিলেন। এমন সময় পিতা, মাতা, পত্নী ও আত্মীয়স্বজনকে কাঁদাইয়া কালগ্রাসে পতিত হন। রসিকলালের কোন সন্তানাদি হয় নাই। কুঞ্জলালের পুত্রকন্যা হইয়াছিল। বিহারীলালের পুত্র না হওয়ায়, অনেকে তাঁহাকে ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের মধ্য হইতে একজনকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ও তদীয় পত্নীর পোষ্যপুত্র গ্রহণে আদৌ ইচ্ছা হয় নাই। তাঁহার স্ত্রী

বলিতেন, আমি এমন ছেলে চাই যাহার দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হইবে, নতুবা বিষয় রক্ষার্থ অর্থাৎ অপব্যয়ার্থ পোষ্যপুত্র গ্রহণের প্রয়োজন নাই। পত্নীর হৃদয়ের ভাব জানিয়া ২৪ পরগণা জেলার সুখচর গ্রামে গঙ্গানদীর উপকূলে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এক দেবালয় নির্ম্মাণ করান এবং তাঁহার গুরুদেব পণ্ডিত ৺গোকুলচন্দ্র গোস্বামী দ্বারা সন ১২৯৩ সালের ১৯শে মাঘ তারিখে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ সেবা প্রতিষ্ঠা করান। ঐ দেবসেবা, অতিথিসেবা এবং রাস, দোল, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পর্ব্ব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইবার জন্ম প্রায় ৪ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ও নগদ এক লক্ষ টাকা দেবোত্তর করিয়া যান। দেবসেবার কার্য্যাদি পরিদর্শনের ভার গুরুদেবের উপর বংশানুক্রমে ন্যস্ত করিয়া যান। পুজারী, হেঁসিয়া প্রভৃতি দেবসেবার ব্রাহ্মণদিগের কাহাকেও স্বর্বর্ণের ব্রাহ্মণ হইতে নিযুক্ত করেন নাই। রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণ হইতে পাচক ও পুজারী প্রভৃতি নিযুক্ত করিবার উদ্দেশ্য যে, ঠাকুরবাড়ীতে সকলেই প্রসাদ পাইতে পারিবেন। এটীও তাঁহার দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। গঙ্গানদীর উপর হইতে ঠাকুরবাড়ীর দৃশ্য কিরূপ তাহার চিত্র দেওয়া গেল।

এখানে আর একটী কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিহারীবাবু যখন উন্নতির শিখরে উঠিতেছিলেন, তখন সুবর্ণবণিক জাতির মধ্যে সুবর্ণবণিক জাতি বৈশ্য, শূদ্র নহেন, তাঁহাদের বৈশ্যাচার রক্ষার্থ উপনয়ন সংস্কারের প্রয়োজন বলিয়া এক সামাজিক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি জাতীয় উন্নতির পক্ষপাতী হইলেও উপনয়ন-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি তাঁহার গুরুদেবের নিকট অবগত হইয়াছিলেন, জাতীয় উন্নতি করিতে হইলে স্বর্বর্ণের পুরোহিতগণের উন্নতি হওয়া প্রথমে আবশ্যক। যদি সুবর্ণ-

বণিকের ব্রাহ্মণদিগের সহিত রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা আদান-প্রদানে সংশ্লিষ্ট না হন, এবং তাঁহাদিগকে বর্ণের ব্রাহ্মণ বলিয়া উপেক্ষা না করেন, তবে সুবর্ণবণিকজাতি উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিতে পারেন। ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজের গৌরববৃদ্ধিমানসে সামাজিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করেন নাই। গুরুদেবের নামে ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা, রাঢ়ীশ্রেণীর সদ্‌ব্রাহ্মণ হইতে পূজারী প্রভৃতি নিযুক্তকরণ এবং তাঁহাদের নিয়োগের ভার গুরুদেবের বংশের উপর ন্যস্ত করায় তাঁহার বিচক্ষণতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিহারীলাল আত্মীয়স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেন। এক শ্রেণীর স্বার্থপর লোকের ন্যায় একাকী থাকিতে ভালবাসিতেন না। ভ্রাতা, ভগ্নী ও তাঁহাদিগের সন্তানসন্ততি প্রভৃতিকে লইয়া নিজবাড়ীতে রাখিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাঁহার মধ্যম-ভ্রাতা কুঞ্জলালের পুত্রগণের শিক্ষার সকল ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের বিবাহাদিও বড় বড় ঘরে দিয়া দিয়াছিলেন।

সুখচরে দেবপ্রতিষ্ঠার সমস্ত আয়োজন স্থির হওয়ার পর, শ্রাবণ মাসে বিহারীলালের পিতৃবিয়োগ হয় এবং ঠাকুর প্রতিষ্ঠার একমাস পরে ফাল্গুন মাসে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তৎপর বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে পতিপরায়ণা লক্ষ্মীস্বরূপিণী পত্নী কুসুমকুমারী ইহলোক ত্যাগ করেন। উপর্য্যুপরি এইরূপ শোক প্রাপ্ত হইলেও বিহারীলালের ভগবদ্ভক্তির বা কর্ত্তব্যের কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। তিনি অবশ্য আত্মীয়-স্বজনগণকে লইয়াই শান্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী পীড়াপীড়ি করায় বিহারীলাল পুনশ্চ দারপরিগ্রহ করেন। কালাচাঁদ পাইন মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সর্ব্বসুন্দরী দাসীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ যেন গোবিন্দদেবের অভিপ্রেত ছিল। এই সুদীর্ঘ কাল

শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দ জীউ

তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে কোন সন্তানাদি হয় নাই ; এক্ষণে গোবিন্দদেবের কৃপায় তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে একপুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। গোবিন্দদেবের কৃপায় পাওয়া বলিয়া ইহার গোবিন্দদাস নাম রাখেন। গোবিন্দদাস এক্ষণে পিতা বিহারীলালের পদাঙ্কানুসরণে দেবসেবা ও বিষয়কার্য্যের পরিচালনা করিতেছেন।

গোবিন্দদাস জন্মগ্রহণ করার পর হইতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণের আচরণ বিসদৃশ হইয়া পড়ে। কুচক্রীর পরামর্শে তাহারা বিষয় ভাগের নিমিত্ত জ্যেষ্ঠ তাতের নামে আদালতে অভিযোগ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই। কালের বিচিত্র গতি। বিহারী বাবু আপোষে তাহা মিটাইয়া দেন। বিহারীবাবু বেশ রাসভারি লোক ছিলেন। তাঁহার নিকটে কেহ সহজে অগ্রসর হইতে পারিত না। তিনি গম্ভীরপ্রকৃতি লোক বলিয়া তাঁহার হৃদয় নীরস ছিল না। দাশু রায়ের পাঁচালি শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন। প্রসিদ্ধ পাঁচালী-গায়ক বক্রেশ্বর মুখুয্যে সুখচরের ঠাকুরবাড়ীতে পর্ব্বাদিতে গান করিত। ভৃত্যগণ মধ্যে কেহ তাঁহার আদেশ-পালনে অবহেলা করিলে কিংবা আদেশমত কর্ম্ম করিতে না পারিলে, তিনি বিশেষ ভর্ৎসনা করিতেন এবং সেই তিরস্কারে কেহ মর্ম্মাহত হইলে পুনশ্চ তাঁহাকে ডাকিয়া অর্থাদি দিয়া সন্তুষ্ট করিতেন। গোপনে তাঁহার যথেষ্ট দান ছিল। নিজে চিরদিন কর্ম্মী ছিলেন, সৎকার্য্যের পুরস্কারে তিনি কখন কুণ্ঠিত হইতেন না। কর্ম্ম করিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করিলে কেহ বঞ্চিত হইত না।

বেশভূষায় বিহারীলালের পারিপাট্য ছিল না। তিনি বিলাসী বেশ ভাল বাসিতেন না। সাদাসিদে চালের উপর বস্ত্রাদি পড়িতেন। তাঁহাকে কখন মিহি দেশীধুতি, মূল্যবান শাল ও হীরকাঙ্গুরী প্রভৃতি ব্যবহার করিতে দেখা যায় নাই। উপরের প্রতিকৃতিতে তাঁহার অনাড়ম্বর পরিচ্ছদ

দৃষ্টি করিলে বুঝিতে পারিবেন। সদাই তিনি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকিতেন, তাঁহার নিজ বসত-বাটী হইতে ঠাকুরবাড়ী পর্য্যন্ত কোথায় কোন একটু ধূলা পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইত না। বিশেষ শৃঙ্খলার সহিত নিজে যেমন সকল কর্ম্ম করিতেন, ভৃত্যাদিও সেইরূপ শৃঙ্খলার সহিত কাজকর্ম্ম করিতে শিক্ষা পাইত। আলস্য কি বস্তু, তিনি তাহা জানিতেন না বলিলেও হয়। একারণ তৎকালে তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দ সকলেই কর্ম্মতৎপর ছিল। ইংরাজী কথায় যাহাকে Routine বলে, সেই রুটিন অনুযায়ী কার্য্য এবং যাহাকে Discipline বলে সেই ডিসিপ্লিন রক্ষা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। একারণ কুড়ে ও বিলাসী ব্যক্তি তাঁহার অপ্রিয় হইত বলিয়া লোকে তাঁহাকে সিংহরাশি লোক বলিত। কঠোর কর্ম্মময় জীবন হইতে যখনই অবকাশ পাইতেন, সুখচর নিজ ঠাকুর বাড়ীতে যাইয়া কাটাইতেম। বসতবাড়ীতে যে বন্দোবস্ত ছিল না, ঠাকুরবাড়ীতে তাহা আছে। যাঁহারা ইঁহার ঠাকুরবাড়ীতে কখন গিয়াছেন তাঁহাদের নিশ্চয়ই একবাক্যে বলিবেন যে, এরূপ বন্দোবস্ত বঙ্গের কোন ঠাকুরবাড়ীতে বিরল।

তিনি বারাকপুর ও পাণিহাটী মিউনিসিপালিটীর কমিশনর ও চেয়্যারম্যান হইয়াছিলেন এবং বিশেষ শৃঙ্খলা ও সুখ্যাতির সহিত সে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে গবাদি পশুর জলপানের নিমিত্ত ২৫টী পাথরের জলাধার নিজব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন, সুখচরের বক্র রাস্তা ঘুরিয়া ঠাকুর বাড়ী পৌছিতে বিলম্ব হয় বলিয়া, একটী সরল রাস্তা নিজব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি মনে করিলে এবং চেষ্টা করিলে অনেক সাধারণের কর্ম্মে যোগ দিতে পারিতেন। কিন্তু এতগুলি অফিষের কর্ম্ম পরিচালন তদুপরি তাঁহার রাধাগোবিন্দের পারিপাট্য, অতিথিসেবা প্রভৃতি সকল বিষয়ের

মন্দিরের দৃশ্য ।

তত্ত্বাবধান লইয়া পুনশ্চ কোন অবৈতনিক সাধারণের কর্ম্ম হাতে লইতে একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। এদেশের ধনী লোকেরা বৎসরে একবার পশ্চিম প্রদেশে বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ গিয়া থাকেন, তাঁহাকে কখন এইরূপ বেড়াইতে যাইতে দেখা যাইত না। তাঁহার প্রথমা পত্নীর স্বাস্থ্যরক্ষার্থ দেওঘরে বাড়ী করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার যাওয়া প্রায়ই ঘটে নাই। যে রাধাগোবিন্দ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ও পরে পূজনীয় পিতা, মাতা এবং প্রিয়তমা পত্নীর লোকান্তর-প্রাপ্তি ঘটে, সেই রাধা-গোবিন্দ ঠাকুরই তাঁহার জীবনের একমাত্র আরাধ্য ছিলেন। বড়ই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইবে যে, যিনি ইচ্ছা করিলে প্রথম শ্রেণী রিজার্ভ করিয়া রেলপথে এবং সকলপ্রকার যানবাহনাদির বন্দোবস্ত করিয়া ভারতবর্ষের সকল তীর্থ দর্শন করিয়া আসিতে পারিতেন, তিনি সুখচরের ঠাকুরবাড়ী গমন ব্যতীত অন্য কোনখানেই যান নাই। তিনি বলিতেন, এই সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গাদেবী, তাঁহার তীরে এই সর্ব্বদেবময় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-দেবের মন্দির। আমি যে এখানে আমার হৃদয়ের ধন সর্ব্বসৌন্দর্য্যময় সর্ব্বমাধুর্য্যময় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দবিগ্রহমূর্ত্তি দর্শনলাভ করিতেছি, ইহা ছাড়িয়া আমি কোন্ তীর্থে যাইব? ইহা যে তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তির লক্ষণ তাহাতে আর ভুল নাই। কর্ম্মকঠোর জীবনের মধ্যেও প্রত্যহ রাত্রে গুরুদেবের নিকট ভাগবত শ্রবণ, অবকাশ পাইলে সুখচরে শ্রীরাধাগোবিন্দদেবের মন্দিরে গমন ও অবস্থান করিয়া তিনি সকল তীর্থদর্শনের সাধ মিটাইয়া ছিলেন। 'ভবসিন্ধুতরণী' নামক একখানি সুবৃহৎ ভক্তিগ্রন্থ গুরুদেবের নির্দেশমত প্রকাশিত করিয়াছিলেন এবং ভক্তিমান্ লোককে বিতরণও করিয়াছিলেন। নিজ বাটীতে ভক্তিগ্রন্থের পাঠাগার ছিল। তাঁহার জীবন ভক্তিময় ছিল। অবকাশ পাইলেই ভগবানের নাম লইয়া থাকিতেন। তাঁহার রাধাগোবিন্দের পূজার জন্য

ঠাকুরবাড়ীর উদ্যানে সকল রকম পুষ্পের বৃক্ষ ছিল। গাছে যে সকল ফুল হইত দেবোদ্দেশেই ব্যবহৃত হইত। পূজার শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ফুলে পূজা হইত এবং অন্য সুন্দর বিদেশীয় পুষ্পে দেবমন্দির সাজান হইত। তাঁহার অনেক বন্ধুবান্ধব ও বালক-বালিকারা দেবালয়ে আসিত, কিন্তু কেহই নিজ বিলাসের বা সুগন্ধ ঘ্রাণের নিমিত্ত, ঐ পুষ্পের একটীও যাহাতে ব্যবহার না করেন তজ্জন্য তাঁহার নিষেধ ছিল। "আমার প্রভু বনমালী, বাগানের যত ফুল আছে দিয়া রাধাগোবিন্দকে সাজাও"; পূজারীদিগকে একথা বলিতে প্রায় শোনা যাইত।

বিহারীলাল সামান্য ১৬৲ টাকা বেতনের চাকুরী হইতে যে এরূপ ধনী হইয়াছিলেন, সে বিষয়ের কারণ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, সততা ও স্পষ্টবাদিতা। ধনী বন্ধু-বান্ধবের সম্মুখে তিনি তাঁহার পূর্ব্বের অবস্থা প্রকাশ করিতে কখন সঙ্কোচবোধ করিতেন না। তাঁহার উন্নতির পথপ্রদর্শক বলিয়া প্রকাশ্যে সকলকার সামনে বলিতেন, "কানাইদাদা আমার গুরু।" ধনী হইলে পূর্ব্ব কথা অনেকে প্রকাশ করিতে চান না, কিন্তু বিহারীলাল সেরূপ ছিলেন না।

ধনী হইলে অনেকে আসিয়া জোটে। তাঁহার নিকটেও যে এরূপ লোকের সমাগম হয় নাই তাহা নহে। তবে তিনি কিছু দুর্ম্মুখ ছিলেন, সামান্য অন্যায় দেখিলে দশ কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেন না। সেকারণ এরূপ ধরণের লোক বেশী দিন তাঁহার নিকট থাকিতে পারিত না। আবার এই সকল প্রকৃতির লোক ধনী বন্ধুদের মনোরঞ্জনার্থ লোকের নামে লাগালাগি করিতে ভালবাসে, বিহারী বাবুও তাঁহার একটু কাণপাতলা দোষ থাকায়, তাহাদের কথায় কখন কখন কর্ণপাত করিতেন। ইহার ফলে দুইএক জনের প্রতি তিনি বিরক্ত হইয়া
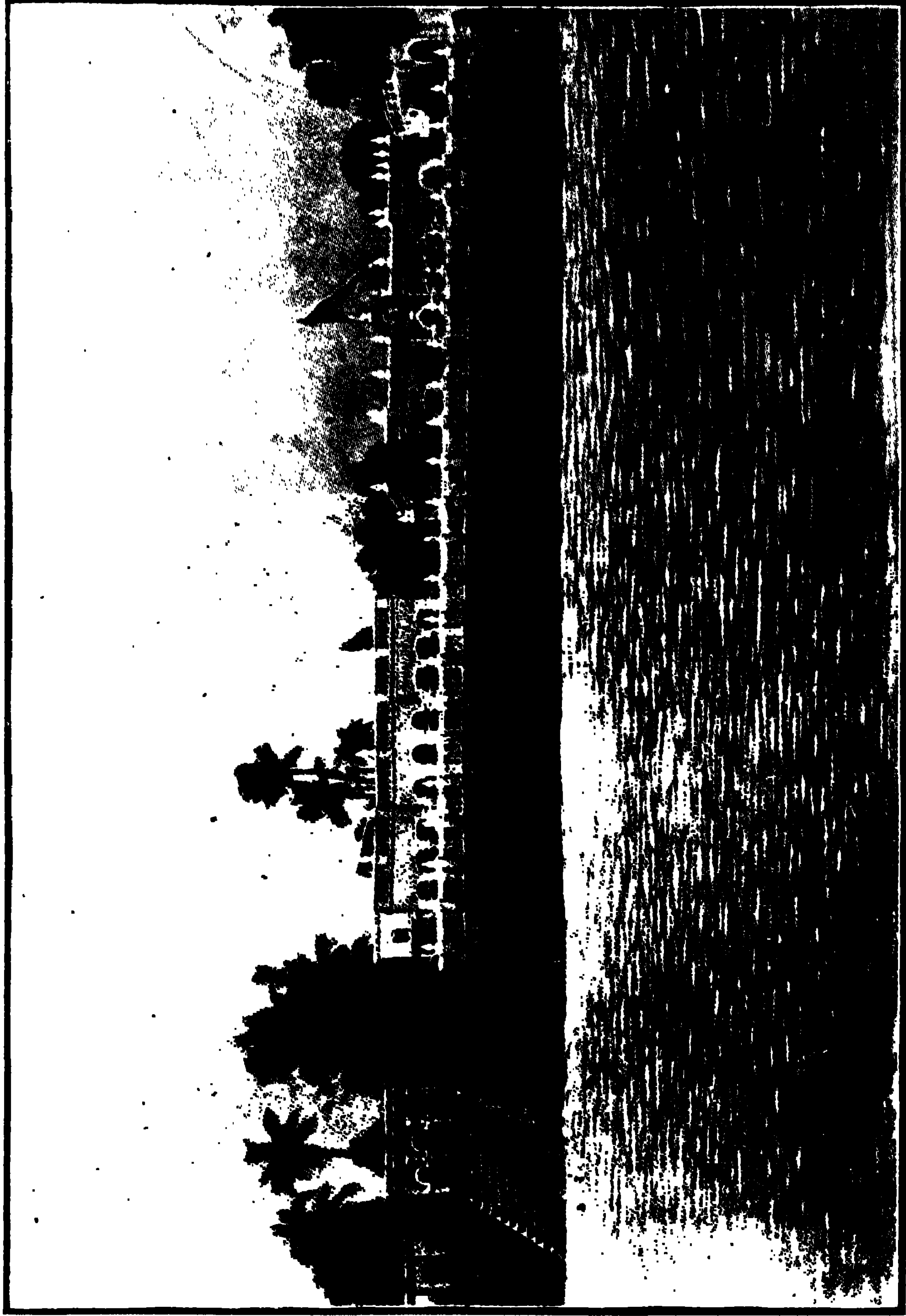
ঠাকুর বাড়ীর বাহিরের দৃশ্য।

পড়িয়াছিলেন। পরে বুঝিতে পারিয়া নিজের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি আত্মীয়স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। বাড়ীতে রাখিয়া অনেককে প্রতিপালন করিয়াছেন, এবং মৃত্যুর পরও যাহাতে প্রতিপালিত হইতে পারে, সেরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দুই ভগিনী ও ভাগিনেয়ের বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ১৩২১ সালের ২১শে কার্ত্তিক ৭৪ চুয়াত্তর বৎসর বয়সে নাবালক একাদশ বৎসরের পুত্র, পত্নী ও আত্মীয়স্বজনকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন।

বংশ-তালিকা
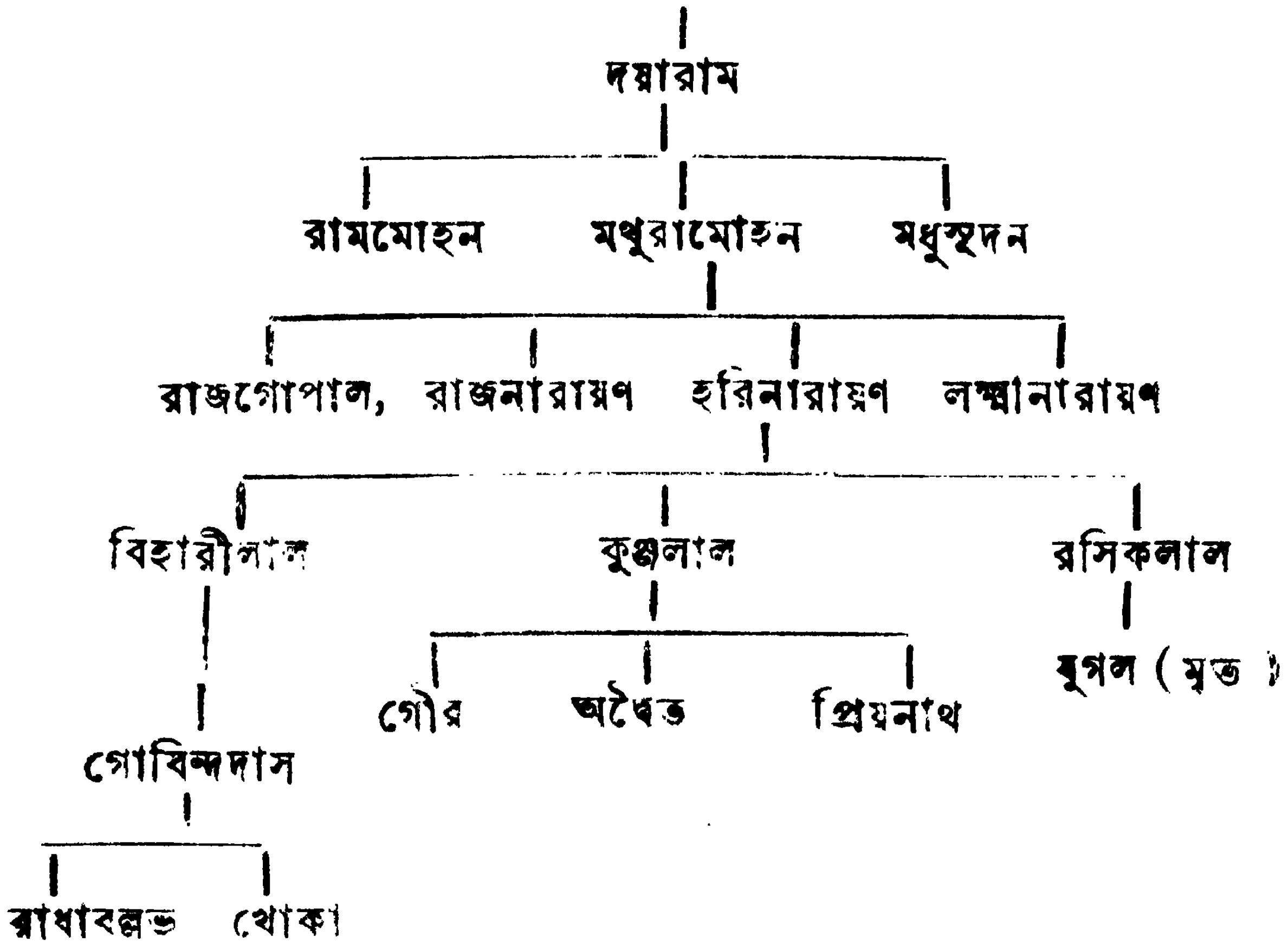
মথুরামোহনের চারিপুত্র, তন্মধ্যে হরিনারায়ণ তৃতীয়। রামমোহনের তিন ও মধুসূদনের দুই পুত্র, তাঁহাদের বংশ চলিতেছে। এখানে কেবল হরিনারায়ণের বংশ দেখান গেল।

বৈষ্ণবাচার্য্য

শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ১২৫৬ সালে বীরভূম একচক্রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ পাটলীর চট্টোপাধ্যায় বংশ-সম্ভূত। ইঁহাদের কৌলিন্যের পরিচয় সর্ব্বানন্দীমেল,—কৃষ্ণের সন্তান। বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সম্বন্ধ-সংশ্রব শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহুপূর্ব্ব হইতেই ছিল। দাক্ষিণাত্য বৈষ্ণবগণের প্রভাব যখন বঙ্গদেশে প্রথমতঃ পরিলক্ষিত হইতেছিল, সেই সময় হইতে সাত্বত, ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সদাচারে ও বিষ্ণু্পাসনায় ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বৈষ্ণবাচারান্বিত হইয়া বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা-করিতেন এবং জগদ্গুরুপদ লাভ করিয়া ব্রাহ্মণদিগের দীক্ষাগুরুরূপে সমাজে পূজনীয় হইতেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতীর্ণ হওয়ার পরে শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু যখন বঙ্গদেশে মহাপ্রভুর প্রেম-অবতাররূপে ভক্তসমাজে পরিচিত ও কীর্ত্তিত হইতেছিলেন, সেই সময়ে ইঁহা হইতে নবম পুরুষ উর্দ্ধতন পরম সদাচারী বহুল শাস্ত্রজ্ঞ জগদ্গুরুবংশ্য চট্টসমাজের সমাজপতি পরমভক্ত পণ্ডিত শ্রীমৎ কুমুদ চট্টোরাজের বিদ্যা-ভক্তি ও সৌন্দর্য্য-বৈভবাদিদর্শনে শ্রীপাদ শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু নিরতিশয় আকৃষ্ট হইয়া এই সৎ-

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ।

কুলোদ্ভব সুযোগ্য পাত্রে তাঁহার কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ-সূত্রে সমর্পণ করেন।

শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ইঁহা হইতে ৯ম পুরুষ অধস্তন। এই বংশে অনেক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও সাধুভক্তগণ জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের হিত সাধন করিয়া-গিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বৃদ্ধ প্রপিতামহ অনন্তরাম চট্টোরাজ চক্রবর্ত্তী সমাজপতি ছিলেন। তাঁহার ভূসম্পত্তি যথেষ্ট ছিল। সমাজস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে নিরতিশয় সম্মান করিতেন এবং রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া অভিহিত করিতেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোরাজ চক্রবর্ত্তী বাল্যকালে পাণিনীর ব্যাকরণের সূত্রাবলী ও অমরকোষ অভিধান কণ্ঠস্থ করেন। উপনয়নের সময়ে যথারীতি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়নের জন্য বারাণসীধামে প্রেরিত হন। বারাণসীর বিদ্যাপীঠে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে বহুদিন বেদবেদান্ত অধ্যয়ন করেন। পরে তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন ও ভজন-সাধনে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার পিতৃদেব বহু ভূসম্পত্তির অধিপতি ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র লক্ষ্মী-নারায়ণ। যৌবনে তাঁহার তীব্র বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া তিনি পুত্রকে আনয়নের জন্য স্বয়ং শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন এবং পুত্রকে গৃহে প্রত্যা-বর্ত্তনের জন্য অনেক অনুরোধ করেন। কিন্তু শ্রীভগবানের প্রিয় সন্তান গার্হস্থ্য সুখ অপেক্ষা ভগবদ্ভজনেই অধিকতর সুখ বলিয়া মনে করিলেন। পিতার চরণে পড়িয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "আপনি জনক, পরম স্নেহময়, আমার জননী পরম স্নেহময়ী, এ দেহ আপনাদের। আমি ঘরে বসিয়া আপনাদের সেবা করিতে পারিলে পরম সুখী হইতাম, কিন্তু শ্রীগোবিন্দ আমার জন্য গার্হস্থ্য সুখের ব্যবস্থা করেন নাই। আমাকে উদাসীন বেশে দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া তাঁহারই কথা প্রচার করিতে হইবে।

আমি পূর্ব্বাচার্য্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শ্রীগোবিন্দের দাস্যে নিযুক্ত হইবার ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি স্নেহময় জনক এবং সাবিত্রীদীক্ষাগুরু ও মন্ত্রদীক্ষাগুরু। আপনার অনুমতি ভিন্ন আমার বাঞ্ছাপূরণের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। কৃপা করিয়া অনুমতি প্রদান করুন।" এই বলিয়া পিতার চরণে প্রণত হইয়া পড়িলেন। স্নেহময় পিতার অশ্রুবিন্দু পুত্রের মস্তকে মণিমুক্তার মোহনমালার ন্যায় গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। পিতা পুত্রকে স্বীয় বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন এবং অশ্রুসিক্তমুখে মৃদুলভাবে নিঃশ্বাসসহকারে বলিলেন, "শ্রীগোবিন্দের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আমি যাহা বুঝিবার বুঝিলাম, কিন্তু তোমার স্নেহময়ী জননীকে কি বলিয়া বুঝাইব তাহাই ভাবিতেছি। কিন্তু আমার একটী অনুরোধ এই রাখিও যে, সন্ন্যাসগ্রহণ করিও না। শ্রীগোবিন্দের ইচ্ছায় এই বংশের প্রবাহক অবশ্যই রক্ষা পাইবে, এই আমার বিশ্বাস। তুমি ব্রহ্মচারীবেশে বিচরণ করিও। অতঃপর শ্রীগোবিন্দের কৃপায় যদি কখনও গৃহস্থ হও, শুনিলে সুখী হইব।" কিন্তু অনন্তরামের ভাগ্যে সে সুখের দিন আর আসিল না। তিনি শূন্যহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, প্রাণাধিক পুত্র আর অধিক দিন বৃন্দাবনে রহিলেন না। তিনি তাঁহার উপাস্য বিগ্রহ শ্রীরাধাগোবিন্দযুগল বক্ষে লইয়া তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, ধনবান্ ভূম্যধিকারী অনন্তরাম ঋষির ন্যায় শিউড়ির বাস-ভবনে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। পুত্র-বিরহে অনন্তরামের সহধর্ম্মিণী দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। এক দিন পতির চরণে মস্তক রাখিয়া হা লক্ষ্মীনারায়ণ! বলিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। ইহার কতিপয় বৎসর পরে ভক্ত মহর্ষি লক্ষ্মীনারায়ণ সম্পত্ত্যাদি দান করিয়া শেষ দিনের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। শাস্ত্র শ্রবণ, ভগবৎস্মরণ, মনন, ধ্যান, নিদিধ্যাসন প্রভৃতিতে তাঁহার অনেক

সময় আবিষ্টভাবে অতিবাহিত হইত। বাহ্য দশায় ভগবন্নাম জপ করিতেন। এইরূপে ৮৫ বৎসর ৭ মাস বয়সে অনন্তরাম অনন্তে বিলীন হইয়া যান। ভৌতিক দেহে পিতাপুত্রের সাক্ষাৎকার হয় নাই।

লক্ষ্মীনারায়ণ মুক্তসঙ্গ ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি ভারতের প্রত্যেক প্রধান প্রধান তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বপাকী ছিলেন। ক্রমাগত ৪।৫ দিবস নিরম্বু উপবাসেও সুদীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিতে পারিতেন। তাঁহার সুদীর্ঘ সমুন্নত সমুজ্জ্বল তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখিবামাত্রেই লোকের মনে ভক্তির উদয় হইত। তিনি কোন সাম্প্রদায়িক ভাবের গোঁড়ামী জানিতেন না। হিন্দুমুসলমান সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিতেন। ভারতবর্ষীয় বহুবিধ তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে কোনও সময়ে তিনি কামাখ্যা-দেবীর দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলার কোনও একটি প্রসিদ্ধ গ্রামের এক মুসলমান জমীদারের বাড়ীর নিকটস্থ মাঠে অশ্বত্থতলে বসিয়া শ্রীবিগ্রহ সেবা করিতেছিলেন, এই সময়ে তত্রত্য মুসলমান ভূম্যধিকারী প্রাণ-সঙ্কট রোগে আক্রান্ত ছিলেন। চিকিৎসকগণ তাঁহার মৃত্যুর সময় নিকটবর্ত্তী বলিয়া প্রকাশ করেন। তাহার পতিপ্রাণা পত্নী প্রাসাদের উপরে উন্মাদিনীর ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে অশ্বত্থমূলস্থ সাধুর নিকট গৃহ-চিকিৎসক বৈদ্যকে প্রেরণ করেন। বৈদ্য সাধুর নিকট সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিলে সাধু দীনভাবে বলিলেন, "আমি এই শ্রীগোবিন্দ-ভজন ভিন্ন আর কিছুই জানি না। আমাকে এজন্য অনুরোধ করা বৃথা।" বৈদ্য বেগম সাহেবকে এই কথা বুঝাইয়া বলিলেন, কিন্তু উন্মাদিনী ভূম্যধিকারী-পত্নী সে কথা গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "খোদা আমায় বলিয়াছেন, ঐ সাধু আমার পতির প্রাণ দিতে পারিবেন। যদি তিনি কৃপা না

করেন, তবে আমি নিজে মাঠে গিয়া সাধুর চরণে মাথা কুটিব।" বৈদ্য আবার সাধুর নিকটে আসিলেন এবং যথাযথভাবে বেগমের অবস্থা বর্ণন করিলেন। তখন সাধু দীর্ঘনিঃশ্বাসসহকারে বলিলেন, "হা গোবিন্দ! তোমার একি মায়া!" বৈদ্যকে বলিলেন, "আমি তো কিছু জানি না, তবে কেবল ইহাই জানি যে, আমার শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণামৃত অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং। তুমি এই চরণামৃত নব মৃৎপাত্রে লইয়া গিয়া তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্রে, নয়নযুগলে এবং মুখে শ্রীগোবিন্দ নাম উচ্চারণ করিয়া স্পর্শ করাইবে। যদি চেতনা হয় এবং নাড়ী মণিবন্ধে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং রোগী কিছু আহার করিতে চাহেন, তবে দুগ্ধ ভিন্ন আর কিছু দিও না। শ্রীগোবিন্দের কৃপায় জীবন পাইলে যেন কোন প্রকার জীব-মাংস আহারার্থ ব্যবহার না করেন।" এই বলিয়া সাধু জপে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীগোবিন্দের মহিমা প্রকাশ পাইতে আর বিলম্ব হইল না। ৫ দণ্ড সময়ের মধ্যে মুমূর্ষুদেহে প্রাণ আসিল, মৃতপ্রায় ভূম্যধিকারী নিদ্রোত্থিতের ন্যায় যেন জাগিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "যে সাধু আমার মস্তকের পার্শ্বে বসিয়া নিজ হাতে আমার প্রাণ দিয়া গেলেন, তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না কেন? তাঁহার খুব সুদীর্ঘ চেহারা, ব্রাহ্মণ, দীর্ঘ শ্মশ্রু, মাথায় জটা, সোণার-বর্ণ তাঁহাকে খুঁজিয়া আন। আমি আর একবার তাঁহাকে দেখিব।" সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বেগম আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সাধুর নিকট দশজন লোক প্রেরিত হইলেন। সাধু প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "ধনীলোকের আঙ্গিনায় যাইতে শ্রীগোবিন্দ আমাকে কোনও অধিকার দেন নাই। আমি যাইতে পারিব না, ক্ষমা করিবেন।" লোকেরা বলিলেন, "আপনি না গেলে হয়ত বেগম উন্মাদিনী হইয়া আসিয়া আপনার চরণে পড়িবেন।" সাধু বলিলেন, "সাবধান! কথনই

নয়, স্ত্রীজাতি আমার মাতৃরূপিণী, আমি ব্রহ্মচারী, তাঁহাদের সহিত কথোপকথন আমার একবারেই বর্জ্জনীয়। শ্রীগোবিন্দ তাঁহার প্রতি কৃপা করিলেন, ইহাই আমার সৌভাগ্য। আমার সেবার কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই, আপনারা গৃহে যান, আমি সেবার কার্য্য শেষ করিয়া সত্বরেই এস্থান হইতে চলিয়া যাইতেছি, শ্রীগোবিন্দ আপনাদের মঙ্গল করিবেন।"

সাধু চলিয়া যাইবেন, এই কথা প্রকাশ পাওয়ায় ভূম্যধিকারীর আত্মীয়গণ আসিয়া সাধুকে অন্ততঃ ৩ দিন এখানে রাখার জন্য নানা প্রকার অনুরোধ করিলেন। বৃক্ষমূলে নববস্ত্রের চন্দ্রাতপ করিয়া দিলেন। নিকটবর্ত্তী গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য দুগ্ধ ও ফলাদি উপস্থিত করাইলেন। রজনীযোগে ভক্তগণ হরি-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সাধু হরিকীর্ত্তনে যোগ দিয়া নিজেও আনন্দ লাভ করিলেন এবং সকলকে আনন্দ দান করিলেন।

পরদিন প্রাতে শ্রীগোবিন্দের পূজার জন্য ব্রাহ্মণগণ ফুল তুলসী, ফল ও দুগ্ধাদি নানাপ্রকার সেবার বস্তু সহ উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে একটি ব্রাহ্মণ আসিয়া সাধুর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আপনার সহিত নির্জ্জনে আমার দুইটী কথা আছে। আপনি রাঢ়দেশীয় জগদগুরুবংশীয় চট্টোপাধ্যায় কুলীন ব্রাহ্মণ।"

সাধু। হাঁ। আপনি কিরূপে জানিলেন?

ব্রাহ্মণ। আপনি কামাখ্যা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ব্রহ্মপুত্রের তটে আপনারই উপাস্যদেবের শ্রীমুখে কোন কথা শুনিয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন কি?

সাধু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং বলিলেন, "তারপর—

ব্রাহ্মণ। তারপর এই যে, ১৫ দিনের মধ্যে আপনার পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আমার কন্যাটীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। দুইমাস হইল আপনার পিতৃদেব মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। আপনার এই শ্রীগোবিন্দ স্বপ্নযোগে আমাকে যাহা জানাইয়াছেন তাহাই আমি নিবেদন করিলাম।

সাধু বজ্রাহতের ন্যায় ভূমিতে পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার চেতনা হইল। তিনি ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "আমার কঠোর বক্ষ এবং শুষ্ক সেবাতে নিকুঞ্জবিহারী ব্রজরস-সুধাস্বাদী শ্রীগোবিন্দের প্রীতি হইল না, আপনার কন্যার সেবাগ্রহণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে। উঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক, কিন্তু আপনার কন্যার গর্ভে একটি পুত্রসন্তান হওয়া মাত্রেই আমি শূন্যহস্তে নিঃসঙ্গ পরিব্রাজকবেশে আপনার গৃহ হইতে চলিয়া যাইব। তজ্জন্য কেহ আমাকে দায়ী করিতে পারিবেন না। আমি মায়ায় আবদ্ধ হইব না। শ্রীগোবিন্দ পিতৃদেবের বাসনা পূর্ণ করিলেন। দুঃখ এই, তাঁহার চিরবাঞ্ছিত গার্হস্থ্য ভাবে গিয়া আমি তাঁহার চরণ দর্শন করিতে পারিলাম না। মাতার মহাপ্রস্থান শ্রীগোবিন্দ আমাকে জানাইয়াছিলেন। যখন আমার কোন বিষয়ে হাত নাই, আমি আর কি করিব? অবশভাবে তাঁহারই বিধান মানিয়া চলিতে হইবে।" এই বলিয়া সাধু নীরব হইলেন এবং নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। সমাগত ব্রাহ্মণ "শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের জয়" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি করা মাত্রই সমুপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলী ও হিন্দুগণ যন্ত্রচালিতের ন্যায় তাহার প্রতিধ্বনি করিলেন। ব্রাহ্মণ যে কেন সহসা এরূপ আনন্দধ্বনি করিলেন, তাহার কারণ কেহ বুঝিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে কেহ কেহ ইঁহাদের গুহ্য কথার মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ সকলকেই তাঁহার স্বপ্নবৃত্তান্ত এবং সাধুর স্বীকারোক্তি সংক্ষিপ্ত

ভাবে প্রকাশ করিলেন। তাহা শুনিয়া উপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলী পরমহর্ষে পুনশ্চ শ্রীরাধাগোবিন্দের নামে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

অতঃপর মুসলমান ভূম্যধিকারীর আত্মীয়বন্ধুবান্ধবগণ এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। শ্রীমৎ হরিপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পঞ্চদশবর্ষীয়া কন্যা মধুমালতীর(লক্ষ্মীপ্রিয়া) সহিত ব্রহ্মচারী লক্ষ্মী-নারায়ণ চট্টোরাজ চক্রবর্তীর শুভবিবাহ অতি সমারোহে সম্পন্ন হইল। এই বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার মুক্ত-সঙ্কল্পিত মুসলমান জমীদার বহন করিয়াছিলেন এবং বিবাহান্তে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দযুগলের সবার জন্য বহুপরিমিত দেবত্র এবং ব্রহ্মত্র ভূমি দান করিয়াছিলেন। বিবাহের দুই বৎসর পরে শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া সসত্ত্বা হইলেন। যথা সময়ে তাঁহার সুলক্ষণসম্পন্ন একটী পুত্র হইল। ষষ্ঠমাসে পুত্রের অন্নপ্রাশনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দচরণে দারাপত্য রাখিয়া রিক্তহস্তে পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা অনুসারে গৃহত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য লক্ষ্মীনারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার স্নেহময় শ্বশুর সুদীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। এই সময় মধ্যে তিনি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থে বহুবার জামাতার অন্বেষণ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু নিজে তাঁহার সাক্ষাৎ দেখা পান নাই; তবে সাধুদের মুখে সংবাদ পাইতেন যে, তিনি তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতেছেন।

দৌহিত্রের প্রতিপালনের জন্য যদিও তাঁহার কোনও প্রকার অর্থচিন্তা রহিল না, কিন্তু গুরুতর দায়িত্ব তাঁহার উপরে সংন্যস্ত হইল। যুবতী কন্যা ও দৌহিত্রের লালনপালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া তিনি একনিষ্ঠভাবে শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবায় নিযুক্ত হইলেন। শিশু জীবনকৃষ্ণ মাতামহ-মাতামহীর আদরে যত্নে লালিত-পালিত হইলেও শৈশব হইতে অতি সুধীর ও গম্ভীরভাবে সময় যাপন করিতেন। সমবয়স্কদের সহিত মিশিতেন না,খেলাতেও প্রবৃত্তি ছিল না। মাতা ধ্যান

মগ্না তপস্বিনীর ন্যায় শ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দিরে বসিয়া শ্রীবিগ্রহের চরণ চিন্তা করিতেন। শিশুটি শ্রীমন্দিরের বারান্দায় বসিয়া নীরবে মায়ের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। ৫ বৎসরে হাতে খড়ি হয়, কিন্তু তাহার বহুপূর্ব্বে তিনি মাতামহ ও মাতামহীর ক্রোড়ে বসিয়া ঠাকুরদের স্তবস্তুতি অনেক প্রকার শিক্ষা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের বহু সূত্র মাতামহের মুখে শুনিয়া শুনিয়া মুখস্থ করিয়াছিলেন।

অতঃপর রামেশ্বর তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে কলাপ ব্যাকরণ, অমরকোষ অভিধান, ভাষা পরিচ্ছেদ ও উহার মুক্তাবলী টীকা, সটীক ব্যাপ্তিপঞ্চক, সিদ্ধান্তলক্ষণা, পক্ষতা, হেত্বাভাষ প্রভৃতি ন্যায়শাস্ত্রের কঠিন কঠিন গ্রন্থগুলি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে অধ্যয়ন করিয়া কাব্যপ্রকাশ ও সাহিত্য-দর্পণাদি গ্রন্থ, শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য গোস্বামিকৃত ষট্‌ সন্দর্ভাদি ভক্তিগ্রন্থপাঠ সমাপন করেন; তখনও তাঁহার মাতামহ মাতামহী জীবিত ছিলেন। একবিংশ বর্ষ বয়সে পিতার উদ্দেশে ব্যাকুলভাবে গৃহ হইতে বহির্গত হন। প্রথমতঃ পিতার জন্মস্থান বীরভূম সিউড়িতে উপস্থিত হইয়া স্থানীয় প্রাচীন লোকগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া পিতামহের বাটীর উদ্দেশ প্রাপ্ত হন। সেখানে জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অনন্তরাম চতুষ্পাঠী নাম দিয়া এক চতুষ্পাঠী সংস্থাপক পূর্ব্বক তাঁহার পিতামহ-প্রদত্ত ভূসম্পত্তি ও গৃহাদি ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহাদের নিকট ইনি ইঁহার পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রথমত তাঁহারা লক্ষ্মীনারায়ণের কথা তুলিয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করেন পরে যখন ইনি লক্ষ্মীনারায়ণের যথাশ্রুত পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক ইনিই তাঁহার একমাত্র পুত্র বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন, তখন টোলের পণ্ডিত একবারেই সুর বদলাইয়া ফেলিলেন। তিনি মনে মনে সন্দেহ করিলেন, পৌত্রটী সম্ভবতঃ পিতামহের সম্পত্তি অধিকার করিতে

আসিয়াছে। সুচতুর গম্ভীরচরিত্র জীবনকৃষ্ণ বিনীতভাবে বলিলেন, “আমি এখানে পিতামহের সম্পত্তির জন্য আসি নাই, পিতার জন্য আসিয়াছি। তিনি এখন কোন্ তীর্থে আছেন, আপনারা বলিতে পারেন কি?” তিনি বলিলেন, “আমরা তাহার কিছুই জানি না। লাভপুরের নিকট থিবা গ্রামে এবং একচক্র গ্রামে তোমাদের জ্ঞাতিবর্গ আছেন, তাহাদের নিকটে যাইতে পার। এই বাড়ী তোমার পিতামহ আমাকে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য ভূসম্পত্তিও স্থানীয় অনেক ব্রাহ্মণকে মৃত্যুর পূর্ব্বে দান করিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মীনারায়ণের সংবাদ না পাইয়া সূচ্যগ্র ভূমিও তিনি অদত্তভাবে রাখিয়া যান নাই। সুতরাং তোমার এখানে কিছুই নাই।” জীবনকৃষ্ণ বলিলেন, “আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি সে উদ্দেশ্যে এখানে আসি নাই।” এই বলিয়া তিনি একচক্রা ও থিবা গ্রামের জ্ঞাতিদের সহিত দেখা করিলেন। তাঁহাদের পরিচয় পাইলেন। কিন্তু পিতার কোন সন্ধান পাইলেন না।

তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন এবং প্রত্যাগমনকালে প্রয়াগ, কাশী প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া প্রায় দেড়বৎসর পরে গৃহে ফিরিলেন। মাতা, মাতামহী ও মাতামহ এই দেড়বৎসরকাল তাঁহার বিরহে অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় কালযাপন করিতেছিলেন। কেবল শ্রীরাধা-গোবিন্দচরণই তাঁহাদের একমাত্র ভরসা ছিল। জাগ্রতদেব শ্রীগোবিন্দ মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে স্বপ্নে জানাইতেন, জীবনকৃষ্ণ ভাল আছে, সুস্থ শরীরে বাড়ী ফিরিবে, কোন চিন্তার কারণ নাই। প্রকৃতই সুস্থ শরীরে জীবনকৃষ্ণ বাড়ীতে ফিরিলেন। ইহার দুই বর্ষ পরে তিনি নিজবাটীতে চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনাকার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সদাচার, বিদ্যা-বৈভব ও ভজননিষ্ঠা দেখিয়া দূরস্থ লোকেরা তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিলেন। মুসলমান জমীদারের উত্তরাধিকারিগণ তাঁহাকে অতিশয়

শ্রদ্ধা করিতেন। সুতরাং তাঁহার অবস্থা অতীব স্বচ্ছল ছিল। মাতামহ মাতামহী কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বিবাহের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন কিন্তু জীবনকৃষ্ণ কিছুতেই সম্মত হন নাই। তিনিও বা পাছে পিতার পথ অনুসরণ করেন, ইহাই ভাবিয়া তাঁহাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু তিনি বলিতেন, "শ্রীগোবিন্দের যখন আদেশ হইবে তখন বিবাহ করিব।" ৩২ বৎসর বয়সে তিনি সে আদেশ প্রাপ্ত হন। হৈমবতী দেবী নাম্নী একটী কন্যার সহিত তাহার শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। তাঁহার বিবাহের ৪ বৎসর পরে প্রথমতঃ মাতামহীর মৃত্যু হয়। তাহার পর বৎসরে মাতামহও মানবলীলা সম্বরণ করেন। সম্ভবতঃ ৩৭ বৎসর বয়সে জীবনকৃষ্ণের প্রথম পুত্র কৃষ্ণমোহনের জন্ম হয়। ইহার কতিপয় বর্ষ পরে অতি শুভক্ষণে সুলগ্নে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র গৌরমোহন চট্টোরাজ চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। ইহার ৩ বৎসর পরে তাঁহার মাতৃদেবী শ্রীগোবিন্দের চরণ চিন্তা করিতে করিতে ধরাধাম হইতে অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন। গৌরমোহনের জন্মের কয়েক বৎসর পরে জীবনকৃষ্ণের দুইটী কন্যাসন্তান ক্রমশঃ জন্মিয়াছিল। গৌরমোহন তাঁহার পিতামহের ন্যায় সুদীর্ঘ সুঠাম সমুজ্জ্বল গৌরকান্তিবিশিষ্ট সুপুরুষ ছিলেন। তিনিও সংস্কৃতশাস্ত্রে এবং জমীদারী কার্য্যে অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বিবিধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণ সর্ব্বদাই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

পিতৃপৈতামহ-বৈভবে সংসারে কোন প্রকার অস্বচ্ছলতা ছিল না। অতিরিক্ত ধনোপার্জ্জনের বাসনাও তাঁহার ছিল না। শৈশব হইতেই তাঁহার চরিত্র গম্ভীর, সুশীল, সত্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা, দোল দুর্গোৎসব পর্ব্ব প্রভৃতিতে অকাতরে অর্থব্যয় এবং সর্ব্বসাধারণের প্রীতিজনক ব্যবহারে তিনি সর্ব্বসাধারণের

ভক্তির আস্পদ ছিলেন। উক্ত অঞ্চলে তিনি যেমন অতিথিসেবার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, আর কাহারও নাম তেমন শুনা যায় না। ধনে মানে, রূপে গুণে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে, দেহের শক্তি-সামর্থ্যে তিনি মহাপুরুষ-রূপে জনসমাজে ভক্তিভাজন হইয়াছিলেন। সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে সুধী সজ্জনগণ সমুপস্থিত থাকিতেন। সরকারী ধর্ম্মাধিকরণ হইতে শালিসী-বিচারের ভার সততই তাঁহার উপরে ন্যস্ত হইত। তাঁহারই প্রভাবে উক্ত অঞ্চলের অধিবাসিগণ সুখ শান্তিতে বাস করিত। তিনি রাজা মহারাজা না হইলেও জনসাধারণের নিকট তিনি সেইরূপ সম্মান-ভাজন ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধি প্রতিভা সত্যনিষ্ঠা লোকানুরাগ-সম্পন্ন ও ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ প্রভৃতি গুণশীল ব্যক্তি উক্ত অঞ্চলে অতি বিরল ছিল। তিনি সর্ব্বদাই উক্ত অঞ্চলের স্বাস্থ্যোন্নতি, বিদ্যোন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য বহুলকার্য্যে নিরত থাকিতেন।

উক্ত অঞ্চলে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি অতি বিরল ছিল। তাঁহার অগ্রজ কৃষ্ণমোহনও প্রচুর ক্ষমতাশালী ছিলেন। এই দুই সহোদরের প্রভাবে জনসাধারণের যেরূপ উন্নতি ও সুখশান্তি হইয়াছিল, এখনও তাহার অনেক নিদর্শন আছে। দুই ভ্রাতা একান্নভুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণমোহনের তিন পুত্র সুদীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইয়া সম্পত্তি ও পূর্ব্বাচরিত দেবপিতৃকার্য্যকলাপ বজায় রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্য বিদ্যাবুদ্ধিপ্রভাবসম্পন্ন ঠাকুর গৌরমোহন তিন পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার মধ্যমপুত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়া কালকবলে পতিত হন। এখন জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র বর্ত্তমান।

জ্যেষ্ঠ শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ বাল্য হইতেই নানাদেশ পর্যটন করিয়া জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হন। বাল্যে পিতৃদেবের নিকটেই সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করেন। অতঃপর ঢাকা ও কলিকাতায় থাকিয়া ইংরাজী

ও সংস্কৃতশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজেও তিনি Casual studentরূপে ৫ বৎসর চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। তৎকালীয় সার্জ্জন Dr. Ray তাঁহার আকারপ্রকার, বিদ্যাবুদ্ধি, বিনীত ভাব ও চিকিৎসা-প্রতিভা দেখিয়া তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিতেন এবং ইংলণ্ডে নিজব্যয়ে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহাদের প্রাতিবাসী বাঙ্গালী সিবিল সার্জ্জন বি গুপ্তের পরামর্শে সামাজিক মর্য্যাদা সংরক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সে প্রস্তাব হইতে বিরত হন। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজেও ঐ সময়ে ৭ বৎসর কাল প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের সাহায্যে নানাবিধ শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নের সময় হইতেই সুবিখ্যাত ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহাকে দেখিয়া স্নেহবশে তদীয় Science Association বা বিজ্ঞান-সমিতিতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ও নিজের নিকট রাখিয়া হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। অধ্যয়ন-সমাপনের পর ইনি কলিকাতাতেই কিছুদিন চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। জ্ঞানতৃষ্ণা অত্যন্ত বলবতী হওয়ায় কলিকাতার প্রধান প্রধান শিক্ষিত লোকদিগের নিকট যাতায়াত করেন। ডাফ কলেজের দর্শনের অধ্যাপক ষ্টিফেন্ সাহেবের নিকট যাতায়াত করিয়া পাশ্চত্য দর্শনশাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করেন। মেডিকেল কলেজে ফিজিওলজী অতীব মনোযোগের সহিত পড়িয়াছিলেন। ইহাতে ষ্টিফেন সাহেব বড় প্রীতিলাভ করিয়া ইঁহাকে সাইকোলজী, মেটাফিজিক্স ও ফিজিওলজি সম্বন্ধে উত্তম উত্তম পাশ্চাত্য গ্রন্থপাঠে সাহায্য করিয়াছিলেন। বাল্য হইতেই জ্ঞানার্জ্জনের ইঁহার বলবতী তৃষ্ণা ছিল। কলিকাতা, কাশী ও নবদ্বীপে চিকিৎসা ব্যবসা উপলক্ষে বাস করায় সেই বাসনা অনেক

পরিমাণে সাফল্যলাভ করে। ইনি সুবর্ণখালি, সিরাজগঞ্জ, নবদ্বীপ, রঙ্গপুর প্রভৃতি বহুস্থানে থাকিয়া খ্যাতি-প্রতিপত্তির সহিত চিকিৎসা ব্যবসায় করেন। অর্থ উপার্জ্জনের তৃষ্ণা না থাকায় সেবিষয়ে তিনি বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই। যখনই যেখানে থাকিতেন, সেইখানেই স্থানীয় লোকের নৈতিক উন্নতি, বিদ্যোন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য সভাসমিতি ও বিদ্যালয়াদি স্থাপন কারতেন এবং সাময়িক পত্রিকাদি প্রকাশ ও প্রচারে সবিশেষ উদ্যোগী হইতেন।

যৌবনের প্রারম্ভ হইতে মাতৃভাষার উন্নতিসাধনে ইঁহার সবিশেষ যত্ন ছিল। বহুবিধ সাময়িক পত্রিকাতে ইনি অনেক প্রকার প্রবন্ধ লিখিতেন। রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ নামক সাপ্তাহিক পত্রে ধারাবাহিক-রূপে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া নিজেই সরস্বতী নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। সেই পত্রের নিজেই সম্পাদক ছিলেন। রঙ্গপুরের সুপ্রসিদ্ধ সুপণ্ডিত জমীদার নীলকমল লাহিড়ী মহোদয় ও তৎপুত্র সুপণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহোদয়, মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ সুবিখ্যাত সাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রবন্ধ প্রদান করিতেন, কিন্তু সরস্বতী পত্রিকার মুদ্রণাদি সুচারু না হওয়ায় রঙ্গপুর ধর্ম্মসভার ব্যয়ে স্থানীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের পরামর্শ ও প্রযত্নে পারিজাত নামক একখানি অতি উত্তম মাসিকপত্র কলিকাতা হইতেই মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করা হয়। এই পত্রও ইঁহা দ্বারা সম্পাদিত হইত। ইনি গদ্য-পদ্যে অনেক প্রবন্ধ লিখিতেন, ইহাতে অনেক সুবিখ্যাত সাহিত্যিক প্রবন্ধ লিখিতেন, কলিকাতার সাহিত্যিকগণও পারিজাতের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন।

প্রলয়ঙ্কর ভূকম্পে রঙ্গপুর যখন বিধ্বস্ত হয় এবং প্রতিদিনই যখন

কম্পন অনুভূত হয় সেই সময়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চিকিৎসা ব্যবসায়ের ঔষধ ও আলমারী প্রভৃতি বাসগৃহের সঙ্গে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। তিনি একরূপ রিক্তহস্তে রঙ্গপুর হইতে আবার কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করেন। এই সময়ে কলিকাতা হাটখোলায় তাঁহার ডিস্পেন্সারী ছিল। হাটখোলার যুবকগণ 'বিকাশ" নামক একখানি অতি সুন্দর মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই উহার সম্পাদক ছিলেন। আহিরীটোলার কতিপয় যুবক "শিল্পসখা" নাম দিয়া শিল্পবিজ্ঞানবিষয়ক আর একখানি পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের অনুরোধে তাহার সম্পাদনভারও ইনিই গ্রহণ করেন। ইনি কখনও পরিশ্রমে ভয় করিতেন না। ইঁহার অনবচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ে, অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অদম্য উৎসাহে নানা প্রকার সভা সমিতি এবং বিদ্যোন্নতির প্রচার দেখিয়া অমৃতবাজার পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ইঁহাকে হাটখোলা হইতে বাগবাজারে আনয়ন করিয়া আনন্দবাজার বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার সম্পাদনভার প্রদান করেন।

অতঃপর কর্ম্মবীর ও ভক্তবীর মহাত্মা শিশিরকুমার বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে গৌরাঙ্গ-সমাজ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহার সম্পাদকতা-ভারও ইঁহার উপরে অর্পিত হয়। এই দুই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় চিকিৎসা ব্যবসায়ের প্রতি ইঁহার আর তাদৃশ মনোযোগ থাকে না। কিন্তু কলিকাতায় যখন ভীষণ প্লেগ রোগ আরম্ভ হয়, তখন বুদ্ধিমান অধিকাংশ ডাক্তারই প্লেগরোগী দেখিতেন না, কিন্তু ডাক্তার রসিকমোহন গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত প্লেগরোগের ভিজিলেণ্ট কমিটির মেম্বর হইয়াছিলেন। তিনি নির্ভীকভাবে প্লেগরোগের ক্ষীত গ্রন্থিতে অস্ত্রোপচার করিতেন, কিন্তু অর্থ গ্রহণ করিতেন না। আনন্দবাজার বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা সম্পাদন ও গৌরাঙ্গ

সমাজ সম্পাদন দ্বারা বৈষ্ণবাচার্য্য রসিকমোহন বৈষ্ণবজগতের যে কার্য্য করিয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত নহে। এই সময় হইতে তিনি স্বরূপ দামোদরদাস গোস্বামী, আনন্দমীমাংসা, রায় রামানন্দ, গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া, নীলাচলে ব্রজমাধুরী, শ্রীচরণতুলসী, শ্রীকৃষ্ণমাধুরী এবং শ্রীপাদ শ্রীজীব-কৃত অতি কঠিন সংস্কৃত দার্শনিক গ্রন্থ সর্ব্বসম্বাদনী গ্রন্থের সম্পাদনায়, সংস্কৃত চূর্ণিকা-বিরচনে এবং উহার সটীক বঙ্গানুবাদে যে শ্রম, যত্ন ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, শিক্ষিত লোক মাত্রেই তাহা সুবিদিত। উক্ত গ্রন্থখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ব্যয়ে এবং তাঁহাদের প্রেরণায় ইনি অতীব বিপদের সময় এই কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ একবিংশবর্ষ বয়সে যখন বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই সময়ে জীবনসঙ্কট রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হয়। ইহার পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এই গুরু কার্য্যভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করেন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সম্পাদক দুঃসহ পুত্র বিরহের পরদিন হইতে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সাহিত্য পরিষদের সংন্যস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। পাছে বা এই গুরুতর শোকে তাঁহার দেহ ও মস্তিষ্কের অবস্থা বিকৃত হয় এবং এই গুরুতর কার্য্যে বাধা পড়ে, এই ভয়ে ভীত হইয়া এই ঘোর বিপদের সময়েও স্বীয় কর্ত্তব্যব্রত কোন প্রকারে উদযাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি ঐ গ্রন্থে তাঁহার যে শ্রম, শাস্ত্রানুসন্ধান-নিপুণতা ও অশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় উহা প্রকৃতই বিস্ময়জনক। আনন্দ-বাজার বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা সম্পাদনের সময়ে ইনি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীমৎ নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়ের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া বিশ্বকোষ বেদ বেদান্ত প্রভৃতি বহুল গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া 'বিশ্বকোষে' প্রদান করেন এবং তখন রায় পশুপতি

বসু মহাশয়ের দ্বারা তাঁহার ডাক্তারখানার রেসিডেণ্ট ফিজিসিয়ান্ ও সার্জ্জনরূপে নিযুক্ত হইয়া চিকিৎসা দ্বারা বহুলোকের উপকার সাধন করেন। ইহাও তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের অঙ্গরূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে নানাবিধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে রাজা কৃষ্ণদাস লাহা মহোদয়ের অনুরোধে তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত প্রভৃতির ব্যাখ্যা শুনাইতেন এবং কলিকাতা ও ভবানীপুরের বহুস্থানে শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা করিতেন। স্থানীয় রাজা-মহারাজগণ সকলেই তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। এই সময়ে ২৫ নং বাগবাজার ষ্ট্রীটের মালিক তাঁহার বাটী বিক্রয় করার প্রস্তাবে ইনি স্বোপার্জ্জিত অর্থে এই বাড়ী ক্রয় করেন এবং ক্রমশঃ ইহার উন্নতিসাধন করেন। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর উপার্জ্জনের সমস্ত উপায় পরিত্যাগ করেন। পুত্রের মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে সুপাত্রে সমর্পণ করেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের একজন Assistant Surgeon এবং ভবানীপুরের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার—নাম নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-বি। জামাতাটীও বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী, অতীব চরিত্রবান্ সুচিকিৎসক। পুত্রের মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী সুপ্রসিদ্ধ গ্রাজুয়েটের সহিত কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয়। কনিষ্ঠ জামাতার নাম হেমেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল। পঠদ্দশায় কলেজে ইঁহার অত্যন্ত প্রতিপত্তি ছিল। প্রত্যেক পরীক্ষায় অতীব যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হন এবং প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইনি কিছুদিন কলেজের অধ্যাপকতা করিয়া এখন হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন। ইনিও অতি চরিত্রবান্ ও বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় সম্প্রতি আর একখানি বৃহদাকার গ্রন্থ

দুই খণ্ডে শেষ করিয়াছেন। গ্রন্থের নাম শ্রীমৎ রূপসনাতন শিক্ষামৃত। ইহা দ্বারা বৈষ্ণবসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন হইবে আশা করা যায়। এই বৃদ্ধকালেও ভজন-সাধনের অবস্থায় লোক-শিক্ষার জন্য তাঁহার অদম্য উদ্যম, অনবচ্ছিন্ন অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রমক্ষমতা এবং অনাহতসাধনানুরাগ দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে যখন স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গতুফান উঠিয়াছিল, তখন প্রায় এমন দিন ছিল না, যেদিন তিনি প্রধান প্রধান সভায় প্রধান প্রধান বক্তা-দের সহিত বক্তৃতামঞ্চে বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান না হইতেন। নানাবিধ কার্য্যে তাঁহার কর্ম্মঠতা এখনও বিদ্যমান, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির ধর্ম্মানুষ্ঠানই তাঁহার জীবন-ব্রত। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনবৃত্ত লিখিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত শ্রীমৎ মথুরামোহন ভক্তিরত্ন আটীয়ার অন্তর্গত বন্দাকাওয়ালখানি গ্রামে তদীয় প্রপিতামহ লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোরাজ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের হৃদয়ের ধন শ্রীরাধাগোবিন্দের নিষ্ঠাবান্ সেবক। তিনি তদঞ্চলের লোকদিগের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মের সদুপদেশ প্রচার করিতে-ছেন এবং শ্রীরাধাগোবিন্দের নিষ্ঠাময়ী আনন্দময়ী সেবায় দিনাতিপাত করিতেছেন। কতিপয় বৎসর হইল, তিনি শ্রীরাধাগোবিন্দ-মন্দিরে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগলবিগ্রহ স্থাপনা করিয়া ভক্তগণের চিত্তে আনন্দ প্রদান করিয়াছেন। ইঁহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে মহাপ্রভুর শাখান্তর্গত হরি ভক্তিবিলাস-সঙ্কলনকারী শ্রীমৎ গোপাল ভট্ট পরিবার এবং শ্রীবাস আচার্য্য প্রভুর মধ্যমা কন্যা-জাত শাখা-বংশোদ্ভব। ইঁহাদের বংশ শাস্ত্রীয় সদাচার-পালন, ভক্তিশাস্ত্র-অধ্যয়ন-অধ্যাপন ও সুনির্ম্মল-চরিত্রতার জন্য প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ জগদ্গুরু বলিয়া অভিহিত হইতেন। এখনও বীরভূম লাভপুর অঞ্চলে এই চট্টোরাজের

বংশের জ্ঞাতিগণ বর্ত্তমান আছেন, কিন্তু বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই এখন এই বংশের প্রাচীনতম পণ্ডিত। তাঁহার জীবন বহু সদনুষ্ঠান ও সদ্গুণময়।

বাগবাজারের মিত্রবংশ

কান্যকুব্জ হইতে আদিশূর কর্তৃক বঙ্গে আনীত পঞ্চজন ব্রাহ্মণের সহিত যে পঞ্চজন কায়স্থ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন কালী মিত্র তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ইনিই বাঙ্গলায় মিত্রবংশীয়গণের আদিপুরুষ।

কান্যকুব্জের প্রেম মিত্রের তিন পুত্র—শক্তি, নাগভট্ট ও কালী। এই কালী মিত্রই রাজা আদিশূরের সহিত বঙ্গে আসিয়াছিলেন।

কালী মিত্র
|
শ্রীধর মিত্র
|
শুক্তি মিত্র
|
সৌভেরি মিত্র
|
হরি মিত্র
|
সোম মিত্র
|
কেশব মিত্র
|
মৃত্যুঞ্জয় মিত্র

মৃত্যুঞ্জয় মিত্রের পুত্র ধুঁই মিত্র গৌড় ত্যাগ করিয়া বড়িশায় আসিয়া বসবাস এবং তথায় একটি সমাজ স্থাপন করেন। বড়িশার মিত্রগণই ইঁহার বংশধর।

৺ধুঁই মিত্র
|
নিশাপতি মিত্র
|
লম্বোদর মিত্র

লম্বোদরের পুত্র পরমেশ্বর মিত্র বড়িশা ত্যাগ করিয়া বালীতে আসিয়া বাস করেন। কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ বালীর মিত্র বলিয়া কথিত হইলেন না, বড়িশার মিত্র পরিচয়েই পরিচিত রহিলেন।

সাধু গোকুল মিত্র

সীতারামের পৌত্র সাধু গোকুল মিত্র ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া বন কাটিয়া বাস করেন। এইজন্য এখনও বাগবাজার অঞ্চলে ইঁহারা "বনকাটা বাস মিত্র" নামে কথিত হইয়া আসিতেছেন। সাধু গোকুল মিত্র লবণের ব্যবসা করিয়া এরূপ বিপুল অর্থ অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, তাহাতে তাঁহার পিতামহের নাম ঢাকা পড়িয়া যায় কেবল অর্থে নহে, সদনুষ্ঠানের দ্বারাও গোকুল মিত্রের খ্যাতি-প্রতিপত্তি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের নাম-যশকে অতিক্রম করিয়াছিল। কেন না, লোকে বাগবাজারের মিত্র-বংশকে সীতারামের বংশধর বলে না, গোকুল মিত্রের বংশধরই বলিয়া থাকে।

গোকুল মিত্রের বুদ্ধিব্যবসায় অত্যন্ত প্রখর ছিল। তিনি লবণের ব্যবসাকে একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ফলে অগাধ অর্থের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এই বিপুল অর্থের সদ্ব্যয় তিনি এমনভাবে করিয়া গিয়াছেন যে, আজ পর্য্যন্ত প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন,—এক হিসাবে বংশে উপযুক্ত পুত্র জন্মিলে মহাপাপ হয়। কেন না, তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তিতে পূর্ব্বপুরুষগণের অস্তিত্ব লোপ পায়; তাঁহাদের যশোভাতি নিষ্প্রভ হয়। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, সেই বংশের ঊর্দ্ধতন সাত পুরুষ এবং অধস্তন সাত পুরুষ উদ্ধার হয়।

"বংশে যত মুটে জন্মায় ততই পূর্ব্ব প্রকৃতির ডাল-পালা বাহির হইয়া পূর্ব্ব প্রকৃতিটা কল্পতরু হয়; আর সাফ করা মুটে জন্মিলে পূর্ব্ব প্রকৃতিটিকে পর্য্যন্ত সাফ করিয়া ফেলে। প্রকৃতির ইচ্ছা যে পুত্রের দ্বারা আমার নাম থাকে এবং আমার নাম না কোন প্রকারে লোপ পায়।

"বংশধরদিগের ভিতর দুইপ্রকার মুটে জন্মগ্রহণ করে, ইহা যেন বরাবর মনে থাকে। একপ্রকার মুটে ডাল-পালা দিয়া পূর্ব্বপ্রকৃতিটিকে বাড়াইয়া কল্পতরু করে, অপর আর একপ্রকার মুটে গুঁড়ি পর্য্যন্ত সাফ করিয়া দেয়, কিন্তু স্বনাম পুত্র পূর্ব্বপ্রকৃতিটিকে বাড়াইবে না বা কমাইবে না, কেন না উপযুক্ত পুত্র স্বয়ং সিদ্ধপুরুষ হয়।

"সাধু গোকুল মিত্র স্বয়ং সিদ্ধপুরুষ—যদিও জগৎ প্রকৃতি এবং গোকুল বিকৃতি; তথাপি বিকৃতি গোকুল পুরুষকারের দ্বারা প্রকৃতি বনিল। সাধু গোকুল লবণের ব্যবসাটিকে একচেটে করিয়া ফেলিল—যাহাতে গোকুল প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বাগবাজারকে গোকুল বানাইল।" *

---

* প্রকৃতিরহস্য, ৮৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা

সত্যই সাধু গোকুল মিত্র বাগবাজারকে গোকুলে—সদনুষ্ঠানের পুণ্য-তীর্থে—করুণার নৈমিষারণ্যে—ভক্তির বৃন্দাবনে পরিণত করিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমান জেলার খেপাড়ার এক ব্রাহ্মণ সাধু গোকুল মিত্রের গুরু ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ এক্ষণে গোস্বামী বলিয়া খ্যাত। গোকুল মিত্র মহাশয়ের গুরুর প্রতি অবিচলিত ভক্তি ছিল। সেই জন্য তিনি গুরুকে যে ঠাকুর-বাটী তৈয়ারী করিয়া দিয়া গিয়াছেন এবং সেই কীর্ত্তি-রক্ষা ও গুরুর ভরণ-পোষণের জন্য যে বিপুল ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন তাহা বঙ্গে অতুলনীয়। এপর্য্যন্ত কোনও বাঙ্গালী গুরুবংশের ভরণ-পোষণের জন্য এরূপ বিরাট দান করিতে পারেন নাই। তাঁহার গুরুর বংশধরগণ এক্ষণে চল্লিশ অংশীদার হইলেও পায়ের উপর পা দিয়া সেই সম্পত্তি উপভোগ করিতেছেন।

গোকুল মিত্র মহাশয় তিন লক্ষ টাকা দিয়া বিষ্ণুপুরের মহারাজা গোপাল সিংহের নিকট হইতে ৺মদনমোহন বিগ্রহকে লইয়াছিলেন এবং বহু অর্থব্যয় করিয়া মদনমোহন জীউর জন্য ঠাকুর-বাটী তৈয়ারী করিয়া যান। কলিকাতায় এরূপ সুবৃহৎ ঠাকুরবাটী নাই বলিলেই হয়। কলিকাতা সহরে ৺মদনমোহনের ঠাকুরবাটী গোকুল মিত্রের কীর্ত্তিস্তম্ভ। ঠাকুরবাটী নির্ম্মাণে ও ঠাকুরের পূজা-ভোগাদির ব্যবস্থার জন্য সাধু গোকুল বিপুল অর্থব্যয় করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের পূজারী, সেবাইত, সূপকার মালাকর ও পাঠকগণের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা সাধু গোকুল এরূপ ভাবে করিয়া গিয়াছেন যে, আজ পর্য্যন্ত তাহাদের বংশধরগণ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতেছে। তবে সাধু গোকুলের ব্যাপারটি উঠিয়া গিয়াছে—হাজার এক তুলসীর মালা রোজ জপ করিতে হইত, যে ব্যক্তি ইহা করিত সে প্রত্যহ প্রসাদ ও মাসে পাঁচটি করিয়া টাকা পাইত। এই কর্ম্মটী এখন আর হয় না—লোক

নাই। গানহারীদের ভজন, নহবৎ এবং অতিথিসেবাও লোপ পাইয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলার জোগ্রাম—কুলীনগ্রামে এবং কাশী ও বৃন্দাবনে সাধু গোকুলের কীর্ত্তি বিরাজমান।

সাধু গোকুল আপনার বাটির ভদ্রাসন পুরোহিত ঠাকুরকে দিয়া গিয়াছেন। চাঁদনীর বাজার হইতে প্রত্যহ যে তোলা উঠিত, তাহাও পুরোহিত পাইতেন। ইহা ব্যতীত আরও একটি করিয়া টাকা পুরোহিতের নিত্য প্রাপ্য ছিল। পুরোহিতকে প্রত্যহ বালী হইতে বাগবাজারে আসিতে হইত। বালীর বাগানটী আজ পর্য্যন্ত মিত্রডাঙ্গা বলিয়া কথিত আছে।

সাধু গোকুল তাঁহার মধ্যমপুত্রের বিবাহ জোড়াসাঁকো-নিবাসী শান্তিরাম সিংহের কন্যা সূর্য্যমুখীর সহিত দিয়াছিলেন। এই বিবাহে মিত্র মহাশয় দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। সেকালের কবির ছড়ায় ইহার উল্লেখ আছে।—

"ওরে গোকুল করলি কি!
নবগুণকে উড়িয়ে দিয়ে
সিদ্ধি হলি জোড়াতে!"

কলিকাতায় প্রথম ভাগবত পাঠের প্রবর্ত্তক সাধু গোকুল। তিনি চৈতন্য শিরোমণি দ্বারা প্রথম ভাগবত পাঠ করাইয়াছিলেন। শিরোমণি মহাশয়ের বংশধরগণ অদ্যাপি ৺মদনমোহন জীউর বাড়ীতে ভাগবত পাঠ করিয়া থাকেন।

দেশীয় সমাজে গোকুল মিত্রই প্রথম Law of Primogeniture অর্থাৎ জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকার প্রাপ্তির বিধি-ব্যবস্থা যে উত্তম তাহা বুঝিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ তাঁহার উইল। এই উইল সুপ্রিম কোর্টের রেকর্ডে আছে। Nobokissen Mitra *vs.* Haris

Chander Mitra's নথি দেখিলেই ইহা দেখিতে পাইবেন ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এই উইল খানি রদ হইয়া গিয়াছে।

গোকুল মিত্র
|
জগন্মোহন মিত্র
|
রসিক মিত্র
|
বিহারী মিত্র
|
অনিরুদ্ধ মিত্র

রায় বিহারী মিত্র বাহাদুর

ইনি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়স হইতেই ইঁহার সাহিত্যানুরাগ ফুটিয়া উঠে। সাহিত্য-চর্চ্চায় ইনি পরম তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। ইনি সুলেখক। মাতৃভাষায় ইনি বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত বাঙ্গালা পুস্তকগুলির নাম:—"চিন্তা-রহস্য," "প্রেম রহস্য," "কথোপকথন-রহস্য," "সংসার রহস্য," "নিয়ম-রহস্য", "ভ্রমণ-রহস্য," "বিদেশী-রহস্য," "প্রকৃতি-রহস্য," "শান্তি-রহস্য," "সংজ্ঞা-রহস্য," "নূতন জন্ম-রহস্য" "এবং ভাবুক-রহস্য"। ইনি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত "Sedition or Progress," "Obstruction or Progress" এবং "How to protect the Young Men of Bengal" নামক তিনখানি ইংরাজী গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছেন। এই সকল পুস্তকে তাঁহার বিপুল অভিজ্ঞতা, মৌলিক চিন্তাশীলতা ও অপূর্ব্ব লিখন-ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষা সরল এবং ক্ষমতাশালী। ইহা একেবারে পাঠকের মর্ম্মস্থানে গিয়া পৌঁছায়। তাঁহার পুস্তকগুলি মোটেই গতানুগতিক নহে। বিহারীবাবু থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া বড়ি-থোড় লিখেন না। যাহা

রায় শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মিত্র বাহাদুর

কিছু লিখিয়াছেন তাহাই নূতন। তাঁহার গবেষণার পদ্ধতি এবং আলোচনার প্রকৃতিও নূতনত্বে মণ্ডিত এবং উহা তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব ও মৌলিক।

বিহারী বাবু তেজস্বী, নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী। উপরোধে অনুরোধে, ভয়ে ভক্তিতে, তিনি বিবেককে কখনও বিসর্জ্জন দেন না। একবার বাঙ্গালা দেশের দুইজন মহারাজা ভোটের জন্য তাঁহার নিকটে গিয়া বলেন,—আপনি অমুককে ভোট দিন। বিহারী বাবু বলেন,—কাহারও অনুরোধে অমি ভোট দিই না। আমি যাহাকে যোগ্য মনে করিব তাহাকেই ভোট দিব। তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া মহারাজা দুইজন চলিয়া যান।

ইনি কাহারও অন্যায় অনুরোধ রক্ষা করেন না। অন্যায় ও অসত্যের উপর ইনি বড়ই বীতশ্রদ্ধ।

প্রকৃত সদনুষ্ঠানের উপর আন্তরিক অনুরাগ ও সহানুভূতি আছে। কলিকাতা বহুবাজারে "The Refuge" বা অনাথ আশ্রম ইঁহার একটি প্রমাণ। ইহা যে বাটীতে অবস্থিত সেই বাটী কলমের এক আঁচড়ে বিহারী মিত্র মহাশয় অনাথ আশ্রমকে দান করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, আশ্রম পরিচালনা ও পরিরক্ষণের জন্যও তিনি বিপুল অর্থ প্রদান করিয়াছেন।

আমরা জানি,—তাঁহার এমন অনেক দান আছে যেগুলি প্রায় কেহ জানিতে পারে না। ঢাক বাজাইয়া দান করা অথবা কোনও কার্য্য করিবার প্রকৃতি বা অভ্যাস তাঁহার একেবারেই নাই।

জনসাধারণের কল্যাণের জন্য রায় বিহারী লাল মিত্র বাহাদুর বিপুল অর্থদান করিয়াছেন। নিম্নলিখিত তালিকায় উহার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়:—

১৯০৭-০৮

ছোটলাট বাহাদুরের মারফতে	১০,০০০৲
ভূমিকম্পে বিপন্ন ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ	১০০০৲
লেডি মিণ্টো নার্সিং ফণ্ড	১০,০০০৲

১৯০৮-০৯

ভাগলপুরের বিভিন্ন সদনুষ্ঠান	৯,৪৬৪৲

১৯০৯-১০

'দি রিফিউজ' বা অনাথ আশ্রম	২৫,০০০৲
কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ফণ্ড—	৫০০৲

১৯১০-১১

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সিংহাসন আরোহণ উৎসব	২০০০৲
সম্রাট-দম্পতীর অভ্যর্থনা-ভাণ্ডার	১০০০৲
'দি রিফিউজ' (২য় দফা)	২৫,০০০৲
সম্রাটের সিংহাসনারোহণ উপলক্ষে কাঙ্গালী ভোজন	৫০০৲

১৯১১-১২

পুরী কুষ্ঠ আশ্রম	১০০০৲
পুরীর যাত্রী হাঁসপাতাল	৫০০৲
ওয়ালটেয়ার দরিদ্র ভাণ্ডার	১০০৲

১৯১২-১৩

বর্দ্ধমানের বন্যা-বিপন্ন নরনারীর সাহায্যকল্পে	৫৩০০৲
'দি রিফিউজ' (৩য় দফা)	২৫,০০০৲

১৯১৩-১৪

গবর্ণরের মারফতে ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ান রিলিফ ফণ্ড	১,০০০৲

শ্রীমান অনিরুদ্ধ মিত্র

ডাক্তার এস-কে মল্লিকের মারফতে কিংস হাসপাতালে	১০০০৲
১৯১৪-১৫	
ডাক্তার এস-কে মল্লিকের মারফতে কিংস হাসপাতালের গৃহনির্ম্মাণভাণ্ডারে	১৫০০৲
১৯১৫-১৬	
পটুয়াখালির ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের মারফতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতগণের সাহায্যার্থে	৫০৲
১৯১৬-১৭	
শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল	১০০০৲
১৯১৮-১৯	
কিং জর্জ্জ হাসপাতাল	১০০৲
গভর্ণরস্ সিলভার ওয়েডিং ফণ্ড	১০০৲
প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনরের মারফতে ডফরিণ হাসপাতাল ফণ্ড	১০০৲
১৯১৯-২০	
শান্তি উৎসব (ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলের মারফতে)	৫০৲
লর্ড সিংহের সম্বর্দ্ধনা-উপলক্ষে	৫৲
১৯২০-২১	
মিঃ কামিংয়ের মারফতে লস্কর স্মৃতিভাণ্ডার	১০০৲
বাখরগঞ্জ কৃষি প্রদর্শনী	৫০৲
১৯২২-২৩	
যুবরাজের সম্বর্দ্ধনা-ভাণ্ডার	১০০০৲

১৯২৩-২৪

লেডি রেডিংস্ উইমেন অফ ইণ্ডিয়া ক০ ৫০০৲

১৯২৪-২৫

বড়লাটের মারফতে জাপানের প্রাকৃতিক বিপ্লবে
বিপন্ন নরনারীর সাহায্যার্থ ১০০০৲

১৯২৫

'দি রিফিউজ' ৫০৲
সালভেশন আর্ম্মি ১৫৲

১৯২৬

সালভেশন আর্ম্মি ১৫৲
মাধিপুর মহকুমায় সিদ্ধেশ্বর মেলায়
১০।১২ বৎসর দান ১২০০৲
ভাণ্ডারিয়া (বরিশালে) ডাকঘরের বাটী নির্ম্মাণ ২৪০০৲

কলিকাতা সহরে এবং বরিশাল, ভাগলপুর, সিংহভূমে রায় বাহাদুর বিহারী লাল মিত্রের বিস্তর জমীদারী আছে। সেইজন্য তাঁহাকে প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টকে নিম্নরূপ রাজস্ব দিতে হয়—

১।	বরিশালে	২৪,৩৬৮৲
২।	ভাগলপুরে	১৪,১৩৮।৶০
৩।	তৌজী নং ৫০২৮	৭।৶০
		৩৮,৫১৪।৵০

কলিকাতা

৪।	চাঁদনীচকের জন্য মিউনিসিপাল ট্যাক্স	৮৪২৮৵০	
৫।	ঐ ঐ লাইসেন্স	১০০৲	
৬।	বাড়ীর জন্য ট্যাক্স	২২৬৭।০	
৭।	গাড়ী ঘোড়ার জন্য ট্যাক্স	১৬৮৪৲	
৮।	মোটর গাড়ীর ঐ ঐ	৬০৲	১১,০১৯।৵
৯।	ইনকাম ট্যাক্স—৬১৮৪।০		
১০।	সুপার ট্যাক্স—৯৯৭৸৴০		৭১৮২৴০
		মোট	৫৬,৭১৬৴০

স্বর্গীয় নন্দলাল মিত্র

অর্থাৎ রাজস্ব, মিউনিসিপাল ট্যাক্স ও লাইসেন্স এবং ইনকম ট্যাক্স ও সুপার ট্যাক্স লইয়া রায় বাহাদুর বিহারীলালকে সর্ব্বসমেত ছাপ্পান্ন হাজার সাত শত ষোল টাকা এক আনা দিতে হয়।

বরিশাল জেলার ভাণ্ডারিয়া গ্রামে একটি উচ্চ ইংরাজী স্কুল এবং ভাগলপুর জমিদারীর এলেকাভুক্ত বিহারীগঞ্জে একটি পাঠশালা রায় বাহাদুর বিহারী মিত্র মহাশয় প্রধানতঃ স্বীয় অর্থে পরিচালনা করিতে-ছেন। এই দুইটী স্কুলে সরকারী সাহায্যও আছে। অন্নকষ্টের সময়ে তিনি রায়তগণকে প্রভূত অর্থসাহায্য করিয়াছেন এবং এখনও করিয়া থাকেন।

বাগবাজারের শ্রীশ্রী মদনমোহনের তিনি একজন প্রধান সেবায়েত। এই বিগ্রহের পূজা ও ভোগের জন্য তদীয় প্রপিতামহ পরম বৈষ্ণব সাধু গোকুল মিত্র বাৎসরিক ৫০।৬০ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী দান করিয়া গিয়াছেন। এই টাকার সমস্তই বিগ্রহের সেবায় ও দরিদ্রগণের দুঃখমোচনে ব্যয়িত হইয়া থাকে।

রায় বিহারীলাল মিত্র বাহাদুর সুপণ্ডিত ও সুলেখক, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতির প্রতি দেশবাসীর যাহাতে অনুরাগ হয় এই উদ্দেশ্যে তিনি অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

ইনি ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে ইঁহার বয়স ৬৮ বৎসর। এখনও ইনি জ্ঞানানুশীলনে ও লোক-হিতসাধনে ব্রতী রহিয়াছেন।

রায় বাহাদুর বিহারী মিত্রেরা পাঁচ ভাই। জ্যেষ্ঠ কানাইলাল; মধ্যম গোপাললাল; তৃতীয় নন্দলাল; চতুর্থ আনন্দলাল এবং কনিষ্ঠ বিহারীলাল।

বিহারীলালের তৃতীয় অগ্রজ নন্দলাল পরম ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। বর্দ্ধমান জেলায় তাঁহাদের জমিদারীর এলেকা মধ্যে বামসো গ্রামে

অতীব প্রাচীন শ্রীশ্রীবাণেশ্বর বিগ্রহের জন্য তিনি একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। শুনা যায়, এই বিগ্রহ বিক্রমাদিত্যের সময়েও বিদ্যমান ছিলেন। বহুকাল হইতে চৈত্র মাসে এই শ্রীশ্রীবাণেশ্বর দেবের গাজন হইয়া আসিতেছে। নন্দলাল মিত্র মহাশয় এই গাজন উৎসবকে বিস্তৃত ও বিপুল করিয়া তুলেন। তিনি বিগ্রহের পূজা ও ভোগরাগের জন্য স্থানীয় ব্রাহ্মণগণকে ভূমি দান করেন। বামসোগ্রামে তিনি একটি অতিথিশালা তৈয়ারী করাইয়া দেন।

নন্দলাল মিত্র মহাশয় পূর্ব্ব-পুরুষের কীর্ত্তিকলাপ অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় কতিপয় ব্রাহ্মণ ও গোস্বামী পরিবারকে ভূমিও অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার গুপ্তদানও অনেক ছিল; বহু বিধবা ও দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার নিকট মাসিক বৃত্তি পাইত।

সাধারণ হিতকর কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি বর্দ্ধমান জেলায় পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি সদালাপী, মিষ্টভাষী, বিদ্যোৎসাহী এবং নিরভিমান ছিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারে কোনও বাধা-বিপত্তি ছিল না। সকলেই সর্ব্বদা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন। তিনিও শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর অন্যতম সেবায়েত। তিনিও বংশের ধারা অনুযায়ী পরম বৈষ্ণবপ্রকৃতি এবং শান্তিপ্রিয় ছিলেন। তিনি পারিবারিক বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করিয়া এই বৃহৎ পরিবারে শান্তি-স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই উদ্যোগে সাধু গোকুল মিত্রের প্রাচীন সুবৃহৎ বাটী নব-সংস্কৃত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, এই পূতস্বভাব ধর্ম্ম-প্রবণ ব্যক্তি অকালে মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

নন্দলাল মিত্র মহাশয়ের একমাত্র পুত্রের নাম শ্রীযুত সুধীন্দ্রলাল মিত্র। ইনিও পিতৃ-পদাঙ্কের অনুসরণ করিয় বংশের ধারা অক্ষুন্ন রাখিতেছেন।

সম্পূর্ণ।

শ্রীসুধীন্দ্র লাল মিত্র।